বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির
বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা ২০২৪-২৫:
উন্নত বাংলাদেশ অভিমুখী বাজেট

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
ও
অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির
২২ মে ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ১ম সভায় অনুমোদিত

ই-মেইল: bea.dhaka@gmail.com

প্রেস কনফারেন্সে উত্থাপিত "বিকল্প বাজেট ২০২৪-২৫"
(বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী কর্তৃক ২০২৪-২৫ অর্থবছরের খসড়া বাজেট পেশ করার প্রাক্কালে)

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

ঢাকা: ৩ জুন ২০২৪

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির
বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা ২০২৪-২৫:
উন্নত বাংলাদেশ অভিমুখী বাজেট

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
ও
অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

(বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির ২২ মে ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ১ম সভায় অনুমোদিত)

ই-মেইল: bea.dhaka@gmail.com

প্রেস কনফারেন্সে উত্থাপিত "বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা ২০২৪-২৫"
(বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী কর্তৃক ২০২৪-২৫ অর্থবছরের খসড়া বাজেট পেশ করার প্রাক্কালে)

অনলাইনে সংযুক্ত:

জেলা (৬৪টি): কক্সবাজার, কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, খাগড়াছড়ি, খুলনা, গাজীপুর, গাইবান্ধা, গোপালগঞ্জ, চট্টগ্রাম, চুয়াডাঙ্গা, চাঁদপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, জামালপুর, ঝালকাঠি, ঝিনাইদহ, টাঙ্গাইল, ঠাকুরগাঁও, ঢাকা, দিনাজপুর, নওগাঁ, নরসিংদী, নড়াইল, নারায়ণগঞ্জ, নাটোর, নেত্রকোনা, নীলফামারী, নোয়াখালী, পঞ্চগড়, পটুয়াখালী, পাবনা, পিরোজপুর, ফরিদপুর, ফেনী, বগুড়া, বরগুনা, বরিশাল, বান্দরবান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাগেরহাট, ভোলা, ময়মনসিংহ, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, মাগুরা, মুন্সিগঞ্জ, মেহেরপুর, মৌলভীবাজার, যশোর, রংপুর, রাঙ্গামাটি, রাজবাড়ী, রাজশাহী, লক্ষ্মীপুর, লালমনিরহাট, শরীয়তপুর, শেরপুর, সাতক্ষীরা, সিরাজগঞ্জ, সিলেট, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ।

উপজেলা (১৩৫টি): ইটনা, কটিয়াদী, করিমগঞ্জ, তাড়াইল, পাকুন্দিয়া, মিঠামইন, হোসেনপুর (কিশোরগঞ্জ জেলা, ৭টি); উলিপুর, চিলমারী, ফুলবাড়ী ও কুড়িগ্রাম সদর (কুড়িগ্রাম জেলা, ৪টি); কুষ্টিয়া সদর, মিরপুর, খোকশা কুমারখালী, ভেড়ামারা (কুষ্টিয়া জেলা, ৬টি); মেহেরপুর সদর, গাংনী (মেহেরপুর জেলা, ২টি); চুয়াডাঙ্গা সদর, আলমডাঙ্গা (চুয়াডাঙ্গা জেলা, ২টি); কয়রা, দাকোপ, ডুমুরিয়া, পাইকগাছা, বটিয়াঘাটা, রূপসা ও ফুলতলা (খুলনা জেলা, ৭টি); ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ, বকশীগঞ্জ, মাদারগঞ্জ, মেলান্দহ ও সরিষাবাড়ী (জামালপুর জেলা, ৬টি); কাঁঠালিয়া, নলছিটি, রাজাপুর, ঝালকাঠি সদর (ঝালকাঠি জেলা, ৪টি); পীরগঞ্জ (ঠাকুরগাঁও জেলা, ১টি); কাহারোল, পাবর্তীপুর, ফুলবাড়ী, বিরামপুর, বীরগঞ্জ (দিনাজপুর জেলা, ৫টি); লোহাগড়া (নড়াইল জেলা, ১টি); কিশোরগঞ্জ, জলঢাকা, ডিমলা, ডোমার, সৈয়দপুর (নীলফামারী জেলা, ৫টি); আটপাড়া, কলমাকান্দা, কেন্দুয়া, বারহাট্টা, মদন, মোহনগঞ্জ (নেত্রকোনা জেলা, ৬টি); আটোয়ারী, তেঁতুলিয়া, দেবীগঞ্জ ও বোদা (পঞ্চগড় জেলা, ৪টি); কলাপাড়া, পটুয়াখালী সদর, বাউফল, মির্জাগঞ্জ, দুমকি (পটুয়াখালী জেলা, ৫টি); বেড়া, সাথিয়া, সুজানগর পাবনা সদর (পাবনা জেলা, ৪টি); পিরোজপুর সদর, নাজিরপুর, নেছারাবাদ, ভান্ডারিয়া, মঠবাড়িয়া (পিরোজপুর জেলা, ৫টি); আমতলী, তালতলী, পাথরঘাটা, বরগুনা সদর (বরগুনা জেলা, ৪টি); আগৈলঝাড়া, উজিরপুর, গৌরনদী, বরিশাল সদর, বাকেরগঞ্জ, বানারীপাড়া, বাবুগঞ্জ, মেহেন্দিগঞ্জ, মুলাদী, হিজলা (বরিশাল জেলা, ১০টি); ফকিরহাট, মোড়েলগঞ্জ ও মোংলা (বাগেরহাট জেলা, ৩টি); চরফ্যাশন, তজুমদ্দিন, বোরহানুদ্দিন, ভোলা সদর, মনপুরা, লালমোহন (ভোলা জেলা, ৬টি); গফরগাঁও, গৌরীপুর, তারাকান্দা, ত্রিশাল, ফুলপুর, ময়মনসিংহ সদর, মুক্তাগাছা, হালুয়াঘাট (ময়মনসিংহ জেলা, ৮টি); শ্রীপুর (মাগুরা জেলা, ১টি); অভয়নগর, কেশবপুর, শার্শা, মনিরামপুর ও ঝিকরগাছা, বাঘারপাড়া (যশোর জেলা, ৬টি); রংপুর সদর, কাউনিয়া, গংগাচড়া, পীরগাছা, পীরগঞ্জ, মিঠাপুকুর (রংপুর জেলা, ৬টি); আদিতমারী, কালীগঞ্জ, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট সদর, হাতীবান্ধা (লালমনিরহাট জেলা, ৫টি); গাইবান্ধা সদর, সাদুল্ল্যাপুর (গাইবান্ধা জেলা, ২টি) ঝিনাইগাতি, নকলা, নালিতাবাড়ী, শ্রীবরদি (শেরপুর জেলা, ৪টি); কলারোয়া, কালীগঞ্জ, তালা ও শ্যামনগর (সাতক্ষীরা জেলা, ৪টি), চান্দিনা, বড়ুড়া, দেবিদ্দার ও লালমাই (কুমিল্লা জেলা, ৪টি); নাগরপুর (টাঙ্গাইল, ১টি)।

ইউনিয়ন (৪৫টি): নাওডাঙ্গা, চন্দ্রখানা ও বড়লই (কুড়িগ্রাম); দামোদর, ফুলতলা, কৌলাসগঞ্জ, জামিরা, ধামালিয়া ও রংপুর (খুলনা); কুলঘঠি, বিনয়কাঠি, সিদ্ধকাঠি (ঝালকাঠী); চলিশিয়া, সুন্দলী ও সিদ্দিপাশা, প্রেমবাগ (যশোর); শ্রীপুর (মাগুরা); কালিগুরী ও লালুয়া; হরিপুর, জিয়ারোখী, মনোহরদী, ঝাউদিয়া, আব্দালপুর (কুষ্টিয়া); বামুন্দী, কাথুলী, তেতুলবাড়ীয়া, কাজীপুর (মেহেরপুর); বেলগাছি, হারদি, ওসমানপুর (চুয়াডাঙ্গা); (পটুয়াখালী); মিরুখালী (পিরোজপুর); কলসকাঠি, কাশীপুর, চরবাড়িয়া, পাদ্রিশিবপুর ও নাজিরপুর (বরিশাল); মাগুরা, চন্দনপুর ও খলিশাখালী (সাতক্ষীরা); গয়েসপুর (পাবনা), বিজয়পুর (কুমিল্লা), তুষভান্ডার, সিন্দুর্না, (লালমনিরহাট) বন্দর খড়িবাড়ী (নীলফামারী)। এবং

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রিয়া, ইতালি, অস্ট্রেলিয়া ও **ভারত**।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
ঢাকা: ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/৩ জুন, ২০২৪

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির
বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা ২০২৪-২৫:
উন্নত বাংলাদেশ অভিমুখী বাজেট

স্বত্ব ২০২৪ © বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪/সি, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন ও ফ্যাক্স: ৮৮০-২২২২২৫৯৯৬; মোবাইল: ০১৭১৬৪১৮৫০০
ই-মেইল: bea.dhaka@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.bea-bd.org

মূল্য: ৩০০ টাকা, ইউএস ২০ ডলার, ইউরো ৩০, ব্রিটিশ পাউন্ড ২৫
(বিক্রয়লব্ধ সম্পূর্ণ অর্থ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হবে)

প্রচ্ছদ
সৈয়দ এসরারুল হক

মুদ্রণ
আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং
২৭ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা ১২০৫
ফোন: ০১৯৭ ১১১৮২৪৩
ই-মেইল: agami.printers@gmail.com

ISBN: 978-984-97735-1-1

উদ্ধৃতি সুপারিশ: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি (২০২৪), বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির
বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা ২০২৪-২৫: উন্নত বাংলাদেশ অভিমুখী বাজেট, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।
ঢাকা: ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/৩ জুন, ২০২৪

কৃতজ্ঞতা

একবিংশ শতকের বৈশ্বিক জীবনে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন, নব্য-ফ্যাসিস্ট আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ, অসভ্য পুঁজিবাদ, তথাকথিত নব্য উদারবাদ ও রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র, যুদ্ধ, সভ্যতার সংকট, মৌলবাদ এবং অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ মানুষের যাবতীয় সব মৌলিক অধিকারের বাণিজ্যিকীকরণ আর ক্রমবর্ধমান বৈষম্যসহ মানবজীবনের সব ক্ষেত্রে চরম অসংগতি এমনিতেই আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশকে দীর্ঘদিন ধরে দুর্ভাবনায় রেখেছে; তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কভিড-১৯ মহামারিসৃষ্ট বিপর্যয়কর অভিঘাত, ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক মন্দা-উদ্ভূত অনিশ্চিত এক প্রেক্ষাপট। নৈরাজ্যে ভরা অনিশ্চিত এই অবস্থা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদদের একমাত্র পেশাজীবী সংগঠন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রায় চার হাজার সদস্যের নির্বাচিত প্রতিনিধি 'কার্যনির্বাহক কমিটি'কে প্রতিনিয়তই তাড়িত করে। কিন্তু শ্রেণিবিভক্ত ও অবক্ষয়ক্লিষ্ট বর্তমান সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র ব্যবস্থায় "জনগণের স্বার্থ সবার ঊর্ধ্বে" তুলে ধরার উৎকৃষ্টতম কোনো পথের অনুসন্ধান সত্যিকার অর্থেই অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। তবুও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী অর্থনীতিবিদদের সংগঠন হিসেবে সেই বন্ধুর-বিপৎসংকুল পথেই অগ্রসর হওয়াকেই বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি পবিত্র দায়িত্ব মনে করে।

আর সে কারণেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বহুমাত্রিক জ্ঞান, পারদর্শিতা এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটি—সমিতির সদ্যবিদায়ী সভাপতি অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত ও বর্তমান সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির 'বিকল্প বাজেট' প্রণয়নের গুরুদায়িত্বটি প্রদান করে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিকল্প বাজেটের খসড়া কার্যনির্বাহক কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়। কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যগণ আলোচনা করে খসড়া বাজেটটি চূড়ান্ত করার পর ২২ মে ২০২৪ তারিখে (কার্যনির্বাহক কমিটির ১ম সভায়) সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

এখানে বলে রাখা ভালো, রাষ্ট্রের আর্থিক কর্মকাণ্ডকে সব শ্রেণিপেশার মানুষের উপযোগী করতে বিকল্প বাজেট প্রণয়ন করা জরুরি হলেও সতত প্রতিক্রিয়াশীল আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রের বিপরীতে ব্যাপকভিত্তিক সমান্তরাল একটি বাজেট প্রণয়ন করা প্রকৃত অর্থেই দুঃসাধ্য একটি কাজ। আর এ কারণেই বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অর্থ-বিত্তে সর্বোন্নত হাতে গোনা কয়েকটি দেশে রাষ্ট্র অথবা বড় রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় শুধু বিভিন্ন খাতভিত্তিক বিকল্প বা অলটারনেটিভ বাজেট প্রণয়নের প্রচলন দেখা যায়। অথচ বাংলাদেশে জাতীয় বাজেটের সমান্তরালে ব্যাপকভিত্তিক বিকল্প বাজেট ঘোষণা শুরু হয় বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির উদ্যোগে ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে। আর এই উদ্যোগের মূল কারিগর ও স্বপ্নদ্রষ্টা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ এবং জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির চারবারের নির্বাচিত সভাপতি অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত। যেখানে বার্ষিক জাতীয় বাজেট প্রণয়নে সরকারের অসংখ্য বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের কয়েক সহস্রাধিক ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট থাকেন এবং সেই বাজেট নিয়ে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই উদ্বিগ্ন থাকেন—সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে 'বিকল্প বাজেট' প্রণয়ন করার মতো দুঃসাহসী ও দুঃসাধ্য কাজটি একদশক ধরেই গভীর মেধা, শ্রম ও দার্শনিক চিন্তাশক্তি দিয়ে সুচারুভাবে পালন করে আসছেন অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত। এরই ধারাবাহিকতায় 'বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি' ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য দশম 'বিকল্প বাজেট' উপস্থাপন করতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির 'কার্যনির্বাহক কমিটি' সমিতির সদ্যবিদায়ী

সভাপতি গণমানুষের অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত-এর কাছে এ জন্য গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। কার্যনির্বাহক কমিটি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সদ্যনির্বাচিত সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর কাছেও আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ—বিকল্প বাজেট উপস্থাপনের সুমহান ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রেখে প্রক্রিয়াটিকে আরও ঋদ্ধ করার জন্য।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির "বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা ২০২৪-২৫: উন্নত বাংলাদেশ অভিমুখী বাজেট" প্রণয়ণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন কার্যনির্বাহক কমিটির সহ-সভাপতি ড. জামালউদ্দিন আহমেদ এফসিএ ও সদস্য ড. নাজমুল ইসলাম এবং হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)-এর অজয় কুমার সাহা ও সেলিম রেজা—আমরা তাদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। সর্বশেষ পাণ্ডুলিপির বাংলা বানান রীতি নিষ্ঠার সাথে দেখে দিয়েছেন অর্থনীতি সমিতির গবেষণা সহযোগী এস এম তারিকুল ইসলাম মুন্না, সময়মতো বিভিন্ন সহায়তা দিয়েছেন প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ আনিছুর রহমান ও রাজু আহমেদ—তাদের ধন্যবাদ। গ্রন্থের প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অলঙ্করণে মেধা-সময় দিয়েছেন সৈয়দ এসরারুল হক সোপেন, ছাপার কাজটি নিখুঁত করার চেষ্টা করেছেন শাহীন আহমেদ—এদের কাছে আমরা সবিশেষ কৃতজ্ঞ। ছাপাখানায় যারা নিভৃতে দিন-রাত শ্রম দিয়ে এই গ্রন্থকে আলোর মুখ দেখিয়েছেন—নিত্য চন্দ্র বর্মণ, আরিফ রাব্বানী, আল-ইমরান, আবদুল লতিফ, গিয়াস উদ্দিন, ইমরান—সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির পক্ষে)

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা		iii
অধ্যায় ১:	ভূমিকা—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাজেট হতে হবে বৈষম্য নিরসন-উদ্দিষ্ট জনকল্যাণকামী	১
অধ্যায় ২:	বাজেট প্রণয়নে ভিত্তি-নীতির ভিত্তিকথা	৪
অধ্যায় ৩:	বিকল্প বাজেট ২০২৪-২৫: বৈষম্য নিরসনমুখী বাজেটের ভাবনা-ভিত্তি	১০
অধ্যায় ৪:	বিকল্প বাজেট ২০২৪-২৫: উন্নত বাংলাদেশ অভিমুখী বাজেটে বৃহৎ বর্গভিত্তিক সুপারিশ	১৬
৪.১	ভূমিকা	১৬
৪.২	বৈষম্য-অসমতা-দারিদ্র্য: অশোভন সমাজের গোড়ার কথা	১৮
৪.৩	সামাজিক সুরক্ষা-নিরাপত্তাবেষ্টনি-মানবকল্যাণ	২০
৪.৪	মূল্যস্ফীতি ও মূল্যসংকোচনসংশ্লিষ্ট	২৩
৪.৫	বিনিয়োগ-সঞ্চয়: সরকারি ও বেসরকারি	২৪
৪.৬	রেমিটেন্স প্রবাহ: বৃদ্ধি ও উৎপাদনশীল ব্যবহার	২৬
৪.৭	পুঁজিবাজার	২৬
৪.৮	ব্যাংক	২৭
৪.৯	বৈদেশিক খাত: আমদানি ও রপ্তানি, রিজার্ভ	২৮
৪.১০	বৈদেশিক ঋণ	২৯
৪.১১	কৃষি-ভূমি-জলা ও সংশ্লিষ্ট মেহনতি মানুষ	৩০
৪.১২	ভূমি মামলা: পারিবারিক ও জাতীয় অপচয়	৪১
৪.১৩	ভূমি আইন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, নীতিমালা	৪৩
৪.১৪	শিক্ষা—শোভন মানুষ সৃষ্টির সূতিকাগার	৪৪
৪.১৫	স্বাস্থ্যখাত: শোভন সমাজ বিনির্মাণে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ খাত	৪৯
৪.১৬	শিল্পখাত	৫৩
৪.১৭	নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশুর বিকাশ	৫৭
৪.১৮	প্রতিবন্ধী মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি	৬৪
৪.১৯	প্রকৃতি-জলবায়ু-পরিবেশ ভাবনা	৬৬
৪.২০	গবেষণা ও বিজ্ঞান চর্চা: ব্যয় নয় বিনিয়োগ	৬৯
৪.২১	দেশরক্ষা-আত্মরক্ষা-প্রতিরক্ষা ধারণা	৭০

৪.২২ সরকার টাকা পাবে কোথায়? ৭১

৪.২৩ মন্ত্রণালয়সমূহের ভৌগোলিক বিকেন্দ্রীকরণ (স্থানান্তরকরণ) এবং মন্ত্রণালয়, বিভাগ, স্থানীয় সরকার, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান, সাধারণ প্রশাসন, দাপ্তরিক বিকেন্দ্রীকরণ (স্থানান্তরকরণ) ৮৪

৪.২৪ বাজেট বাস্তবায়নসংশ্লিষ্ট বিষয় ৮৭

৪.২৫ শোভন সমাজ বিনির্মাণ-উদ্দিষ্ট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ৮৮

অধ্যায় ৫: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য বিকল্প বাজেট: উন্নত বাংলাদেশ অভিমুখী বাজেট ৮৯

৫.১ প্রাক্-কথন ৮৯

৫.২ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির "উন্নত বাংলাদেশ অভিমুখী" বিকল্প বাজেট: লক্ষ্য অভীষ্ট ও কয়েকটি পদ্ধতিগত দিক ৯০

৫.৩ বিকল্প বাজেটে কাঠামোগত মৌলিক পরিবর্তন কোথায়? ৯৪

৫.৪ বিকল্প বাজেট নিয়ে সম্ভাব্য সংশয়বাদী ও বিরোধীদের উদ্দেশ্যে ৯৬

৫.৫ বিকল্প বাজেটে ব্যয়-বরাদ্দ হবে কোথায়? ১০৪

৫.৫.১ তিনটি বড় মাপের বরাদ্দ-সংস্কার প্রস্তাব ১০৪

৫.৫.২ খাতওয়ারি বরাদ্দ প্রস্তাব ১০৫

৫.৬ বিকল্প বাজেটের আয় আসবে কোথা থেকে? ১৩২

৫.৬.১ আয়ের নতুন উৎস ১৩২

৫.৬.২ রাজস্ব প্রাপ্তি ১৩২

অধ্যায় ৬: উন্নত বাংলাদেশ অভিমুখী বিকল্প বাজেট—উপসংহার ১৪৩

সারণি

সারণি ১: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে বৃহৎ বর্গের বিষয়াদি ও সংশ্লিষ্ট সুপারিশ সংখ্যা ১৭

সারণি ২: বাংলাদেশে কালোটাকার আনুমানিক পরিমাণ: অর্থবছর ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১৮-১৯ ৮০

সারণি ৩: কেন্দ্রীভূত (ঢাকাকেন্দ্রিক) মন্ত্রণালয়সমূহের ভৌগোলিক বিকেন্দ্রীকরণ প্রস্তাব ৮৫

সারণি ৪: ব্যয়ের বাজেট ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট ও সরকারের চলতি অর্থবছরের (২০২৩-২৪) বাজেট ১০৮

সারণি ৫: বাজেট ব্যয়ের (বরাদ্দে) খাতওয়ারি অগ্রাধিকারের তুলনামূলক চিত্র—সরকারি বাজেট (২০২৩-২৪) বনাম বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব (২০২৪-২৫) ১৩০

সারণি ৬: বাজেটে সম্পদ ব্যবহারের তুলনামূলক চিত্র: সরকারের চলতি অর্থবছরের (২০২৩-২৪) বাজেট ও অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট ২০২৪-২৫ ১৩১

সারণি ৭: আয়ের বাজেট ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিকল্প বাজেট ও সরকারের চলতি অর্থবছরের (২০২৩-২৪) বাজেট ১৩৩

সারণি ৮: বাজেট আয়ের রাজস্বপ্রাপ্তির উৎসসমূহের অগ্রাধিকারের তুলনামূলক চিত্র—সরকারি বাজেট (২০২৩-২৪) বনাম বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব (২০২৪-২৫) ১৪০

সারণি ৯: অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট ২০২৪-২৫ এবং তার সাথে সরকারের চলতি অর্থবছর ২০২৩-২৪ বাজেটের তুলনা ১৪৫

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট প্রণয়নের ভিত্তিনীতি: মাননীয় অর্থমন্ত্রী-এর সাথে প্রাক্-বাজেট মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবনা ১৪৯

পরিশিষ্ট ২: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট প্রণয়নের ভিত্তিনীতি: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান-এর সাথে প্রাক্-বাজেট আলোচনা সভায় বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবনা ১৬৩

অধ্যায় ১

ভূমিকা—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাজেট হতে হবে বৈষম্য নিরসন-উদ্দিষ্ট জনকল্যাণকামী

যেহেতু ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগে প্রতিষ্ঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানমতে ***"প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ"*** [সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭ (১)] যেহেতু ***"প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র,*** *যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে"* (অনুচ্ছেদ ১১) এবং যেহেতু বৈষম্য—সম্পদ বৈষম্য, আয় বৈষম্য, স্বাস্থ্য বৈষম্য, শিক্ষা বৈষম্য, আবাসন বৈষম্য—ক্রমবর্ধমান, সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের **বাজেট হতে হবে বৈষম্য নিরসন-উদ্দিষ্ট জনকল্যাণকামী**। এ নিয়ে কোনো ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়-সন্দেহ হবে অসাংবিধানিক।

আগামী ৬ জুন ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় বাজেটের খসড়া বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে উত্থাপন করবেন। এর দিনকয়েক আগে, অর্থাৎ আজ ৩ জুন ২০২৪ তারিখে আমরা বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পক্ষে "বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা ২০২৪-২৫" এই প্রেস কনফারেন্সে উত্থাপন করছি।

জেলা (৬৪টি): কক্সবাজার, কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, খাগড়াছড়ি, খুলনা, গাজীপুর, গাইবান্ধা, গোপালগঞ্জ, চট্টগ্রাম, চুয়াডাঙ্গা, চাঁদপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, জামালপুর, ঝালকাঠি, ঝিনাইদহ, টাঙ্গাইল, ঠাকুরগাঁও, ঢাকা, দিনাজপুর, নওগাঁ, নরসিংদী, নড়াইল, নারায়ণগঞ্জ, নাটোর, নেত্রকোনা, নীলফামারী, নোয়াখালী, পঞ্চগড়, পটুয়াখালী, পাবনা, পিরোজপুর, ফরিদপুর, ফেনী, বগুড়া, বরগুনা, বরিশাল, বান্দরবান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাগেরহাট, ভোলা, ময়মনসিংহ, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, মাগুরা, মুন্সিগঞ্জ, মেহেরপুর, মৌলভীবাজার, যশোর, রংপুর, রাঙ্গামাটি, রাজবাড়ী, রাজশাহী, লক্ষ্মীপুর, লালমনিরহাট, শরীয়তপুর, শেরপুর, সাতক্ষীরা, সিরাজগঞ্জ, সিলেট, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ।

উপজেলা (১৩৬টি): ইটনা, কটিয়াদী, করিমগঞ্জ, তাড়াইল, পাকুন্দিয়া, মিঠামইন, হোসেনপুর (কিশোরগঞ্জ জেলা, ৭টি); উলিপুর, চিলমারী, ফুলবাড়ী ও কুড়িগ্রাম সদর (কুড়িগ্রাম জেলা, ৪টি); কুষ্টিয়া সদর, মিরপুর, খোকশা কুমারখালী, ভেড়ামারা (কুষ্টিয়া জেলা, ৬টি); মেহেরপুর সদর, গাংনী (মেহেরপুর জেলা, ২টি); চুয়াডাঙ্গা সদর, আলমডাঙ্গা (চুয়াডাঙ্গা জেলা, ২টি); কয়রা, দাকোপ, ডুমুরিয়া, পাইকগাছা, বটিয়াঘাটা, রূপসা ও ফুলতলা (খুলনা জেলা, ৭টি); ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ, বকশীগঞ্জ, মাদারগঞ্জ, মেলান্দহ ও সরিষাবাড়ী (জামালপুর জেলা, ৬টি); কাঁঠালিয়া, নলছিটি, রাজাপুর, ঝালকাঠি সদর (ঝালকাঠি জেলা, ৪টি); পীরগঞ্জ (ঠাকুরগাঁও জেলা, ১টি); কাহারোল, পাবর্তীপুর, ফুলবাড়ী, বিরামপুর, বীরগঞ্জ (দিনাজপুর জেলা, ৫টি); লোহাগড়া (নড়াইল জেলা, ১টি); কিশোরগঞ্জ, জলঢাকা, ডিমলা, ডোমার, সৈয়দপুর (নীলফামারী জেলা, ৫টি); আটপাড়া, কলমাকান্দা, কেন্দুয়া, বারহাট্টা, মদন, মোহনগঞ্জ (নেত্রকোনা জেলা, ৬টি); আটোয়ারী, তেঁতুলিয়া, দেবীগঞ্জ ও বোদা (পঞ্চগড় জেলা, ৪টি); কলাপাড়া, পটুয়াখালী সদর, বাউফল, মির্জাগঞ্জ, দুমকি (পটুয়াখালী জেলা, ৫টি); বেড়া, সাথিয়া, সুজানগর পাবনা সদর (পাবনা জেলা, ৪টি); পিরোজপুর সদর, নাজিরপুর,

নেছারাবাদ, ভান্ডারিয়া, মঠবাড়িয়া (পিরোজপুর জেলা, ৫টি); আমতলী, তালতলী, পাথরঘাটা, বরগুনা সদর (বরগুনা জেলা, ৪টি); আগৈলঝাড়া, উজিরপুর, গৌরনদী, বরিশাল সদর, বাকেরগঞ্জ, বানারীপাড়া, বাবুগঞ্জ, মেহেন্দিগঞ্জ, মুলাদী, হিজলা (বরিশাল জেলা, ১০টি); ফকিরহাট, মোড়েলগঞ্জ ও মোংলা (বাগেরহাট জেলা, ৩টি); চরফ্যাশন, তজুমদ্দিন, বোরহানুদ্দিন, ভোলা সদর, মনপুরা, লালমোহন (ভোলা জেলা, ৬টি); গফরগাঁও, গৌরীপুর, তারাকান্দা, ত্রিশাল, ফুলপুর, ময়মনসিংহ সদর, মুক্তাগাছা, হালুয়াঘাট (ময়মনসিংহ জেলা, ৮টি); শ্রীপুর (মাগুরা জেলা, ১টি); অভয়নগর, কেশবপুর, শার্শা, মনিরামপুর ও ঝিকরগাছা, বাঘারপাড়া (যশোর জেলা, ৬টি); রংপুর সদর, কাউনিয়া, গংগাচড়া, পীরগাছা, পীরগঞ্জ, মিঠাপুকুর (রংপুর জেলা, ৬টি); আদিতমারী, কালীগঞ্জ, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট সদর, হাতীবান্ধা (লালমনিরহাট জেলা, ৫টি); গাইবান্ধা সদর, সাদুল্যাপুর (গাইবান্ধা জেলা, ২টি) ঝিনাইগাতি, নকলা, নালিতাবাড়ী, শ্রীবরদি (শেরপুর জেলা, ৪টি); কলারোয়া, কালীগঞ্জ, তালা ও শ্যামনগর (সাতক্ষীরা জেলা, ৪টি), চান্দিনা, বড়ুড়া, দেবিদ্দার ও লালমাই (কুমিল্লা জেলা, ৪টি); নাগরপুর (টাঙ্গাইল, ১টি)।

ইউনিয়ন (৪৫টি): নাওডাঙ্গা, চন্দ্রখানা ও বড়লই (কুড়িগ্রাম); দামোদর, ফুলতলা, কৌলাসগঞ্জ, জামিরা, ধামালিয়া ও রংপুর (খুলনা); কুলঘঠি, বিনয়কাঠি, সিদ্ধকাঠি (ঝালকাঠী); চলিশিয়া, সুন্দলী ও সিদ্দিপাশা, প্রেমবাগ (যশোর); শ্রীপুর (মাগুরা); কালিশুরী ও লালূয়া; হরিপুর, জিয়ারোখী, মনোহরদী, ঝাউদিয়া, আব্দালপুর (কুষ্টিয়া); বামুন্দী, কাথুলী, তেতুলবাড়ীয়া, কাজীপুর (মেহেরপুর); বেলগাছি, হারদি, ওসমানপুর (চুয়াডাঙ্গা); (পটুয়াখালী); মিরুখালী (পিরোজপুর); কলসকাঠি, কাশীপুর, চরবাড়িয়া, পাদ্রিশিবপুর ও নাজিরপুর (বরিশাল); মাগুরা, চন্দনপুর ও খলিশাখালী (সাতক্ষীরা); গয়েসপুর (পাবনা), বিজয়পুর (কুমিল্লা), তুষভান্ডার, সিন্দুর্না, (লালমনিরহাট) বন্দর খড়িবাড়ী (নীলফামারী)। এবং

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রিয়া, ইতালি, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি এই দেশে একমাত্র পেশাজীবী সংগঠন, যারা ধারাবাহিকভাবে গত ১০ বছর জাতির উদ্দেশ্যে 'বার্ষিক বিকল্প বাজেট' লিখিতভাবে উত্থাপন করে আসছে। বিকল্প বাজেট প্রণয়ন ও উত্থাপন সংস্কৃতির শুরুটা হয়েছিল ২০১৫-১৬ অর্থবছরে "মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিকল্প বাজেট"[১] শিরোনাম দিয়ে। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির দেশপ্রেমিক গণমুখী মতাদর্শিক অবস্থান স্পষ্ট হয় গত ২০২০-২১ অর্থবছর বিকল্প বাজেটে সমিতির নিম্নলিখিত ঘোষণামূলক বক্তব্য থেকে: *"এ দেশের অর্থনীতিবিদদের একমাত্র পেশাজীবী সংগঠন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্দেশিত 'দেশজ উন্নয়নদর্শন'-এর অন্তর্নিহিত ন্যায়বোধ, নীতিবোধ, মূল্যবোধ ও শ্রেয়বোধে সিক্ত সংগঠন। এসব কারণেই যেকোনো অবস্থাতেই আমাদের কাছে দেশ ও জনগণের স্বার্থ সবার ঊর্ধ্বে। সবার ঊর্ধ্বে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষনির্বিশেষে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থ। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি এ দেশের মানুষের দীর্ঘ মুক্তিসংগ্রাম ও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে, এবং দেশের উন্নয়ন-প্রগতির সবকিছু ওই চেতনার নিরিখে বিচার-বিশ্লেষণ করে। আমাদের সমিতির জন্য এ এক ঐতিহাসিক সত্য। এ সত্যকে আমরা করোনাভাইরাস (কভিড-১৯)-উদ্ভূত এই মহাবিপর্যয়ের সময়ে আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে প্রতিফলিত করতে সংকল্পবদ্ধ"*[২]।

---

[১] দেখুন, বারকাত, আবুল., চৌধুরী, আশরাফ উদ্দিন., এবং আহমেদ, জামালউদ্দিন (২০১৫), মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বাজেট প্রস্তাবনা ২০১৫-১৬।

[২] দেখুন, বারকাত, আবুল ও আহমেদ, জামালউদ্দিন (২০২১), বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, বিকল্প বাজেট ২০২০-২১, পৃ. ১৩।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটি তার প্রায় চার হাজার সদস্যের পক্ষে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে শোভন সমাজ-শোভন অর্থনীতি-শোভন জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত পরপর মোট নয়টি অর্থবছরে জাতির সামনে বিকল্প বাজেট (Alternative Budget) পেশ করেছে। কোভিড-১৯ মহামারিতে বিপর্যস্ত, ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা-উদ্ভূত অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে এ বছরেও আমরা ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পক্ষে জাতীয় বিকল্প বাজেট উত্থাপন করছি।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি এ দেশে অর্থনীতিবিদদের একমাত্র পেশাজীবী সংগঠন। নারী-পুরুষ-জাতি-ধর্ম-বর্ণ-দলমতনির্বিশেষে অর্থনীতিশাস্ত্রের প্রায় চার হাজার সদস্যের সংগঠন—বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি। সংগঠনগতভাবে আমরা কয়েকটি মৌলিক বিষয় বিশ্বাস করি:

(১) ১৯৭১-এ "স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র", যা ঘোষণা করেছিল, "*জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা*",

(২) ১৯৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধে জন-আকাঙ্ক্ষা—*বৈষম্যহীন ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা*, এবং

(৩) ১৯৭২-এর সংবিধানের মূল বিধান, "*জনগণই হইবেন প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক*।"

যেহেতু আমরা আমাদের পরিচয়, অস্তিত্ব ও বিকাশ-উদ্দিষ্ট এসব মৌলিক বিষয় বিশ্বাস করি, চর্চা করি এবং তা সমুন্নত রাখতে দায়বদ্ধ—সেহেতু প্রকৃত বিচারে আমাদের সমিতি—বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কোনো মতাদর্শনিরপেক্ষ (ideology neutral) এবং রাজনীতিনিরপেক্ষ (politics neutral) সংগঠন নয়। আমাদের মতাদর্শ ও রাজনীতির (অবশ্য এসব প্রপঞ্চের সংজ্ঞায়ন গুরুত্বপূর্ণ) মূল কথা হলো—"জনগণের স্বার্থ সবার ঊর্ধ্বে"। কারণ জনগণ এবং একমাত্র জনগণই সার্বভৌম। সুতরাং আমাদের সবধরনের কর্মযজ্ঞে তা প্রতিফলিত হবে—এটাই যুক্তিসংগত এবং স্বাভাবিক। এ নিরিখে আমরা যে বিকল্প বাজেট ২০২৪-২৫ উত্থাপন করতে যাচ্ছি তা উল্লিখিত "তিন মৌল চেতনার ভিত্তিতে—জনগণের স্বার্থ সবার ঊর্ধ্বে"—এ ধারণা-বিবেচনায় প্রণীত দলিল।

ভূমিকাতেই বলে রাখা জরুরি যে বিকল্প বাজেট প্রণয়নে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতিতে আমরা যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করে থাকি, গত বছর থেকে তার সাথে একটি নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। আর তা হলো: **সরকারের কাছে বাজেট প্রণয়নের ভিত্তিনীতি লিখিতভাবে উপস্থাপন:** গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪/ ৫ ফাল্গুন ১৪৩১ তারিখে আমরা সরকারের কাছে "২০২৪-২৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট প্রণয়নের ভিত্তিনীতি: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর সাথে মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবনা" শিরোনামে আমাদের লিখিত দলিল উপস্থাপন করেছি। আর ১০ মার্চ ২০২৪/ ২৬ ফাল্গুন ১৪৩০ তারিখে একই বিষয় মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সাথে মতবিনিময় সভায় পেশ করি। ওই দলিলে বাজেট প্রণয়নের ভিত্তিনীতি হিসেবে আমরা যেসব বক্তব্য পেশ করেছি, তার মধ্যে অন্যতম হলো নিম্নরূপ:

> (ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানই হবে বাজেট প্রণয়নের ভিত্তি, (খ) বাজেট হতে হবে বৈষম্যহীন আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণ-উদ্দিষ্ট, (গ) বাজেটে সম্পদ-আয়-স্বাস্থ্য-শিক্ষা বৈষম্য হ্রাস হবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের বিষয় (বিস্তারিত দেখুন, পরিশিষ্ট-১ ও ২)।

অধ্যায় ২

বাজেট প্রণয়নে ভিত্তি-নীতির ভিত্তিকথা

বিশ্ব এখন একই সঙ্গে তিন মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন। প্রথম মহাবিপর্যয় হলে—বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দা। দ্বিতীয় মহাবিপর্যয় হলো—কভিড-১৯-উদ্ভূত মহামারি। আর তৃতীয় মহাবিপর্যয় হলো—ইউরোপে (যেখান থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল) রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ। এ ধরনের অবস্থায় সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন হলো—একই সঙ্গে সংঘটিত **অর্থনীতির কাঠামোগত বিপর্যয়—মহামন্দা, প্রকৃতি-উদ্ভূত কভিড-১৯-এর মহাবিপর্যয় এবং মনুষ্যসৃষ্ট রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের মহাবিপর্যয়**—এই ত্রিমাত্রিক বিপর্যয় থেকে মুক্ত হয়ে আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ বৈষম্যহীন 'শোভন সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র' বিনির্মাণে একটি ধারণাত্মক তত্ত্বকাঠামো (conceptual theoretical construct) কেমন হবে এবং তার ভিত্তিতে তা বিনির্মাণে জাতীয় বাজেট কেমন হবে/ হওয়া উচিত? উত্থাপিত এ প্রশ্নের উত্তরে যুক্তিক্রমানুসারে অপেক্ষাকৃত বড় মাপের যেসব সংশ্লিষ্ট বিষয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেই হবে, তা হলো: (১) পুঁজিবাদী শোষণভিত্তিক কাঠামোতে অনিবার্য বৈশ্বিক মহামন্দাসহ কভিড-১৯ অতিমারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ-উদ্ভূত পরিবর্তন বিশ্লেষণসহ উত্তরণের পথনির্দেশে প্রচলিত অর্থনীতিশাস্ত্রের পারগতা/ অপারগতা এবং 'নতুন একীভূত অর্থনীতিশাস্ত্রের' যৌক্তিকতা; (২) ভাইরাস মহামারি প্রকৃতি-উদ্ভূত হলেও কি তা হতে পারে না প্রকৃতিকে অতিশোষণমূলক ব্যবস্থা পুঁজিবাদী সিস্টেম-উদ্ভূত; হতে কি পারে না যে ভাইরাস-মহামারি আসলে প্রকৃতিকে নির্বিচার অত্যাচার-উদ্ভূত, পুঁজিবাদী অন্যায্য-অন্যায় বিশ্বায়ন-উদ্ভূত? (৩) ইউরোপে মনুষ্যসৃষ্ট রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব-অভিঘাত। এসব নিয়ে আমাদের মূলকথা পরস্পরসম্পর্কিত পঞ্চমাত্রিক। বাজেট প্রণয়নে আমাদের গৃহিত পঞ্চমাত্রিক ভিত্তি-নীতি নিম্নরূপ:

বাজেট প্রণয়নের পঞ্চমাত্রিক ভিত্তি-নীতি
১. বাজেট হবে বৈষম্যহীন আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে
২. সম্পদ-আয়-স্বাস্থ্য-শিক্ষার বিপজ্জনক বৈষম্য হ্রাসে যত পথ-পদ্ধতি আছে, তার সবই দ্রুত প্রয়োগ
৩. ব্যাপকভিত্তিক শোভন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি
৪. মূল্যহ্রাস ও মূল্যসংকোচনের গূঢ় বিষয়াদি বিবেচনায় দূরদর্শিতা
৫. অর্থ-সম্পদ ধনীদের কাছ থেকে প্রবাহিত করতে হবে দরিদ্র, প্রান্তিক, বিত্তহীন, নিম্নবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের হাতে।

বাজেট প্রণয়নে ভিত্তি-নীতির প্রথম মাত্রা: সব দোষ কভিড-১৯ ভাইরাসের—এটাই বলা হচ্ছে। আসলে এটা সত্য নয়, আসল কথাও নয়। মূল কথা হলো এ রকম: রেন্টসিকার-পরজীবী-লুটেরা-জোম্বি করপোরেশন-স্বজনতুষ্টিবাদী মুক্তবাজার পুঁজিবাদ এমনই এক সিস্টেম, যেখানে দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্যচক্রের (long term business cycle) বিধান অনুযায়ী প্রতি ৩০-৪০ বছর পরপর পুঁজিবাদী অর্থনীতি সিস্টেমে **মহামন্দা** (great depression; great slowdown; crisis)—অবশ্যম্ভাবী। আর এ

সূত্রানুয়ায়ী সেটা ঘটার কথা ২০১৯-২০ সালের দিকে। এবং তাই-ই ঘটেছে—বিশ্বব্যপী। কিন্তু যে ঘটনা ইতিহাসে কখনো একই সঙ্গে ঘটেনি, তা ঘটেছে এবার। আর তা হলো—একদিকে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দা; আর অন্যদিকে একই সময়ে বিশ্বব্যাপী কভিড-১৯ সংক্রমণজনিত মহামারি (যার শেষ জানা নেই; যার শেষ অভিঘাতও কারও জানা নেই)। আর এ সময়েই শুরু হলো ইউরোপে যুদ্ধ—রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, যার পরিণতি ও অভিঘাত অনিশ্চিত। অর্থাৎ বিশ্বের দেশনির্বিশেষে সব দেশই এখন 'অর্থনৈতিক-সামাজিক-শিক্ষাগত-স্বাস্থ্যগত-রাজনৈতিক'—এই বহুমুখী মহাবিপর্যয়কর অবস্থায়—"মহামন্দা রোগে" (disease of great depression/ horror disease) আক্রান্ত, যা পৃথিবীর ইতিহাসে এই-ই প্রথম। রোগী এখন ICU-তে (যেখানে স্থান সংকুলান হচ্ছে না—কোথাও না, কোনো দেশেই না)। সুতরাং এ রোগীকে বাঁচাতে হলে প্রথমে তাকে সুস্থ করতে হবে। অর্থাৎ দেশের কথা বললে বলতে হয়—দেশের অর্থনীতি-সমাজ-সংস্কৃতি-রাষ্ট্র-সরকার সবকিছুই সর্বপ্রথম প্রাক্-অসুস্থ অবস্থায় অর্থাৎ অসুস্থ হওয়ার আগের অবস্থায় নিতে হবে। এক্ষেত্রে বাজেটপ্রণেতাদের প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হবে যে, ২০২৪ সালের এই জুন মাসে আমরা ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চের কভিড-১৯ এর আগের অবস্থায় নেই। যথেষ্ট মাত্রায় পরিবর্তন হয়েছে—অর্থনীতিতে, সমাজে, মানুষের সাহস-হতাশায়, রাষ্ট্রে, সরকারে—সর্বত্র। অবশ্য এ স্বীকৃতিতেও যে খুব বেশি কিছু যায়-আসে, তা নয়। তবে এটা হবে নির্মোহ **সত্য স্বীকার করা**—'denial syndrome' থেকে মুক্তি। এ স্বীকৃতিতেও খুব যায়-আসে না। কারণ, কভিড-১৯-এর পূর্বাবস্থাও সুখকর ছিল না—তা ছিল রেন্টসিকার-দুর্বৃত্ত-লুটেরা-পরজীবীনিয়ন্ত্রিত মুক্তবাজার পুঁজিবাদের অর্থনীতি—যা মুক্তও নয়, দরিদ্রবান্ধবও নয়; যেখানে ধনসম্পদ বৈষম্য-আয় বৈষম্য-শিক্ষা বৈষম্য ও স্বাস্থ্য বৈষম্য ছিল ক্রমবর্ধমান। **সুতরাং আমরা 'মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর অতিক্রান্তকালীন বাজেট' বৈষম্যহীন আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে করব, না-কি বাজেটসহ সবকিছুই আমরা নব্য উদারবাদী মতাদর্শের মুক্তবাজার আর করপোরেট-স্বার্থীয় সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রকদের বিশ্বায়নের হাতে ছেড়ে দেব—এ সিদ্ধান্তটি নিতে হবে। অন্যথায় আমরা গতানুগতিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যাব—জিডিপি বাড়লেও বাড়তে পারে; মাথাপিছু আয় বাড়লেও বাড়তে পারে—কিন্তু বৈষম্য-অসমতা নিরসন হবে না—হবে না মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বা অভীষ্ট বাস্তবায়ন।**

বাজেট প্রণয়নে ভিত্তি-নীতির দ্বিতীয় মাত্রা: আমাদের দ্বিতীয় কথা এ দেশে ধনী-দরিদ্রের প্রবণতা নিয়ে—বিত্তের গতিপ্রকৃতির পরিবর্তন নিয়ে। আর একই সঙ্গে এই প্রবণতায় করোনাকালীন এবং ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অভিঘাত, অনিশ্চয়তা এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ নিয়ে। সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এ রকম:

(১) দেশের অধিকাংশ মানুষই বহুমাত্রিক দরিদ্র। আর ধনী (অথবা সুপার ধনী) হলেন জনসংখ্যার সর্বোচ্চ ১ শতাংশ। এ কথা অনস্বীকার্য এবং গবেষণায় প্রমাণিত যে কভিড-১৯ লকডাউনের প্রভাবে 'নিরঙ্কুশ দরিদ্র' (absolute poor) মানুষ 'হতদরিদ্র-চরমদরিদ্র' (ultra poor) হয়েছেন; আর নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের ব্যাপকাংশ দরিদ্র হয়েছেন এবং মধ্য-মধ্যবিত্তদের একাংশ বিত্তের মানদণ্ডে নিম্নগামী হয়েছেন। ফলে এখন একদিকে দরিদ্র মানুষের মোট সংখ্যা কভিড-১৯ সময়ের আগের তুলনায় কমপক্ষে দ্বিগুণ বেড়েছে; আর অন্যদিকে সৃষ্টি হয়েছে নতুন এক দরিদ্র গোষ্ঠী, যারা আগে দরিদ্র ছিল না, যাদের বলা যায় 'নবদরিদ্র' (New Poor)। ব্যাপক জনগোষ্ঠীর বিত্তের এই অধোগতি—আগে কখনো হয়নি—এ এক নতুন প্রবণতা। দারিদ্র্যের আরও একটি বিষয় এর আগে কখনো ঘটেনি, তা হলো—দরিদ্র, নিম্নবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের ব্যাপক হারে শহর থেকে গ্রামমুখী হওয়া (urban to rural

migration)। গত দুই বছরে কমপক্ষে ১ কোটি মানুষ শহর ছেড়ে গ্রামমুখী হয়েছেন—এসব মানুষের অধিকাংশই দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, এসব মানুষের অনেকেই গ্রামে স্থায়ীভাবে থেকে যেতে বাধ্য হবেন।

(২) কভিড-১৯ উদ্ভূত লকডাউনের কারণেই স্বাভাবিক বা Off-line-এর ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকারখানা, সেবাখাতে অধোগতি হয়েছে—হয়েছে তা নিম্নগামী। আর ফুলেফেঁপে উঠেছে On-line ব্যবসা-বাণিজ্য (এটা বিশ্বব্যাপী ঘটনা—তা না-হলে আমাজনের জেফ বোজোস কী করে মাত্র একদিনে তার সম্পদে ১২ বিলিয়ন ডলার যোগ করতে পারলেন?)। On-line-এর রেন্টসিকার-দুর্বৃত্ত-লুটেরা-পরজীবীরা মুক্তবাজারে মুক্তবিহঙ্গ হয়ে তাদের আয়-সম্পদ-সম্পত্তি বিপুল বাড়িয়েছেন। এসবের ফলে আয় বৈষম্য (income inequality)-সম্পদ বৈষম্য (wealth inequality)-স্বাস্থ্য বৈষম্য (health inequality)-শিক্ষা বৈষম্যসহ (education inequality) বৈষম্যের সব ধরনই বেড়েছে। আর গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ইউরোপের রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বিভিন্নভাবে বৈষম্য-দারিদ্র্য বাড়িয়েছে। আমাদের হিসাবে বাংলাদেশে আয় বৈষম্যের মাপকাঠি **গিনি সহগের** মান লকডাউনের আগে ছিল ০ দশমিক ৪৮২, যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ০ দশমিক ৬৫৫-এ[৩]; আর **পালমা অনুপাত** (যা দেখায় একটি দেশের সর্বোচ্চ আয়ের মালিক ১০ শতাংশ মানুষের মোট আয় সর্বনিম্ন আয়ের মালিক ৪০ শতাংশ মানুষের মোট আয়ের কত গুণ বেশি)—একই সময়ে ২ দশমিক ৯২ থেকে বেড়ে হয়েছে ৭ দশমিক ৮৩ (যা বিপৎসীমার দ্বিগুণেরও বেশি)। সুতরাং এমনিতেই লুটেরা পুঁজি শাসিত বৈষম্য-দারিদ্র্যপীড়িত দেশ, আর তার সাথে অর্থনৈতিক মন্দা, কভিড-১৯ এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ—এসবই বাংলাদেশকে উচ্চ আয় বৈষম্যের দেশ এবং 'বিপজ্জনক আয় বৈষম্যের' দেশে রূপান্তরিত করে ছেড়েছে। **এমতাবস্থায় বাজেটপ্রণেতাদের উদ্দেশ্যে সুস্পষ্ট প্রস্তাব হলো—আয়-সম্পদ-স্বাস্থ্য-শিক্ষা বৈষম্য হ্রাসের যত পথ-পদ্ধতি আছে, তার সবই যত দ্রুত সম্ভব প্রয়োগের চেষ্টা করা।**

বাজেট প্রণয়নে ভিত্তি-নীতির তৃতীয় মাত্রা: মানুষের ক্ষুধা-পুষ্টির দারিদ্র্যসহ বহুমাত্রিক দারিদ্র্য বেড়েছে। ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে যেসব বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের গতি ঊর্ধ্বমুখী, তার মধ্যে আছে—আয়ের দারিদ্র্য, ক্ষুধার দারিদ্র্য, কর্মহীনতার দারিদ্র্য, স্বল্প মজুরির দারিদ্র্য, আবাসনের দারিদ্র্য, শিক্ষার দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যের দারিদ্র্য, অস্বচ্ছতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, শিশু দারিদ্র্য, প্রবীণ মানুষের দারিদ্র্য, নারীপ্রধান খানার দারিদ্র্য, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকের দারিদ্র্য, ভাসমান মানুষের দারিদ্র্য, প্রতিবন্ধী মানুষের দারিদ্র্য, 'মঙ্গা' এলাকার মানুষের দারিদ্র্য, বহিঃস্থ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য, বস্তিবাসী ও স্বল্প আয়ের মানুষের দারিদ্র্য, পরিবেশ-প্রতিবেশ বিপর্যয়ের দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, প্রান্তিকতা থেকে উদ্ভূত দারিদ্র্য (অনানুষ্ঠানিক সেক্টর, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু, আদিবাসী মানুষ, নিম্নবর্ণ-দলিত, 'পশ্চাৎপদ' পেশা, চর-হাওর-বাঁওরের মানুষ), রাজনৈতিক দারিদ্র্য (রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ না-

---

৩ উচ্চ ও ক্রমবর্ধমান আয় বৈষম্য—বিষয়টি সরকারি তথ্য-পরিসংখ্যানেও স্বীকার করা হয়। সরকার পরিচালিত খানার আয়-ব্যয় জরিপ অনুযায়ী আয় বৈষম্যের নির্দেশক গিনি সহগের মান ছিল ২০১৬ সালে ০.৪৮৩, যা ২০২২ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ০.৪৯৯। একই সময়ে জিডিপিতে ধনিক শ্রেণির দখল বেড়েছে; আর দরিদ্রদের কমেছে।

করতে পারার কারণে দারিদ্র্য), রাষ্ট্র-সরকার পরিচালনাকারীদের প্রতি আস্থাহীনতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, মানসকাঠামোর দারিদ্র্য। এসব দারিদ্র্য আরও বাড়ছে-বাড়বে।

দারিদ্র্যাবস্থা নিয়ে সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা—মানুষের কর্মসংস্থানের। দেশে মোট শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা ৬ কোটি ৮২ লক্ষ ৬ হাজার, যাদের ৮৫ শতাংশ অর্থাৎ ৫ কোটি শ্রমজীবী মানুষ—অনানুষ্ঠানিক খাতে (informal sector) কর্মরত, যাদের মধ্যে আছে বিভিন্ন ধরনের অণু ও ক্ষুদ্র ব্যবসা ও শিল্প—কুটির শিল্প; কৃষিখাত—শস্য ও শাকসবজি-প্রাণিসম্পদ-মৎস্যসম্পদ-জলজসম্পদ—কভিড-উদ্ভূত লকডাউন এবং পরবর্তী অর্থনৈতিক মন্দার কারণে এসব মানুষের অধিকাংশই হয় কর্মহীন অথবা স্বল্প মজুরিতে স্বল্প সময়ের জন্য সাময়িককালীন কর্মজীবী হয়েছেন। কারণ, কর্মবাজার সংকুচিত হয়েছে; রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধসহ অন্য অনেক ধরনের সম্ভাব্য অনিশ্চয়তার কারণে সামনে আরও হবে। পরিবার-পরিজনসহ এসব মানুষের পক্ষে জীবন পরিচালন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এদের হাতে টাকাপয়সা নেই; অনেকেই যা কিছু ছিল তাও বেচে দিতে বাধ্য হয়েছেন ("দুর্দশাগ্রস্ততার কারণে বিক্রি"-distress sale)—এরা এখন নিঃস্ব, সর্বস্বহারা, হতাশাগ্রস্ত, ভাগ্যনির্ভর। জীবন এদের অনিশ্চিত। **এসব মানুষের—সরকারি উদ্যোগে ১৯২৯-৩৩ সালের মহামন্দার সময়ে নিউ ডিল কর্মসূচির মতো—ব্যাপক এবং শোভন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই।**

বাজেট প্রণয়নে ভিত্তি-নীতির চতুর্থ মাত্রা: অর্থনীতিবিদদের প্রায় সবাই বলে থাকেন, জিনিসপত্রের দাম বাড়া বা **মূল্যস্ফীতি** (inflation) হলো গরিবের শত্রু। কর্মসংস্থানসহ শোভন আয় প্রবাহ থাকলে এ কথা মিথ্যা না। এ কথা নিরঙ্কুশ সত্য। কারণ, দ্রব্যমূল্য এখন সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। মূল্যস্ফীতি ব্যাপক জনগোষ্ঠীর দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসবের পাশাপাশি এ কথায়ও বলে রাখা দরকার যে, **মূল্যহ্রাস বা মূল্যসংকোচন** (deflation) হলো গরিবের মহাশত্রু। কারণ মানুষের যদি কাজ না থাকে, আয়ের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়—তাহলে 'জিনিসপত্তের' দাম কমলেই কী? উল্লেখ্য, ১৯২৯-৩৩ সালের মহামন্দাকালে জিনিসপত্রের দাম বাড়েনি (মূল্যস্ফীতি ঘটেনি), জিনিসপত্রের দাম কমেছিল (অর্থাৎ ঘটেছিল মূল্যহ্রাস/মূল্যসংকোচন); আর ওই মহামন্দার পরপরই 'মূল্যহ্রাস/ মূল্যসংকোচনের' সুযোগে নির্বাচনের মাধ্যমেই ফ্যাসিস্ট হিটলার জার্মানিতে ক্ষমতায় বসে পড়েন। এসব গূঢ় বিষয় নিয়ে দূরদর্শী বাজেটপ্রণেতারা ভাববেন—এ প্রত্যাশা অমূলক হবে না।

বাজেট প্রণয়নে ভিত্তি-নীতির পঞ্চম মাত্রা: "শোভন সমাজব্যবস্থায়" মানুষের জন্য কোনো কিছুই তথাকথিত জনকল্যাণ-উদ্দিষ্ট দয়াদাক্ষিণ্যের বিষয় নয়—তা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কাজ, আবাসন, বিশ্রামসহ মানুষের সামাজিক ন্যায়-অধিকার (socially justiciable rights) প্রতিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শনের অতি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বিষয়। 'শোভন অর্থনীতি ব্যবস্থায়' এসব ন্যায়-অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম মাধ্যম হলো রাষ্ট্রীয় বাজেট।

আমাদের ধারণার রাষ্ট্রীয় বাজেট প্রচলিত অর্থের মূলধারার অর্থনীতিবিদদের ধারণার বাজেট থেকে পদ্ধতিগতভাবে ভিন্ন—সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। প্রচলিত-প্রথাসিদ্ধ মূলধারার অর্থনীতিশাস্ত্রীকেরা পুঁজির শাসন-আধিপত্য-কর্তৃত্ব নিশ্চিত করার স্বার্থে যে প্রক্রিয়ায় যে পদ্ধতিতে যে ধরনের রাষ্ট্রীয় বাজেট বিনির্মাণ করে থাকেন, তার বিপরীতে আমরা বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য বিকল্প বাজেট উত্থাপন করছি। এখানে যা পূর্ণ গুরুত্বসহ উল্লেখ করা দরকার, তা হলো—"শোভন অর্থনীতি ব্যবস্থায়" আমাদের ধারণায় রাষ্ট্রীয় বাজেট হলো যুক্তিসিদ্ধ মতাদর্শিক-সাধারণ জ্ঞানের সাথে নতুন একীভূত অর্থশাস্ত্রের

সম্মিলনী দলিল। বাজেট প্রণয়নে প্রচলিত অর্থনীতিশাস্ত্রের চিন্তা-ভিত্তিকেই (premise) আমরা পুরোপুরি বিভ্রান্তিকর ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে করি। কারণ, প্রচলিত প্রথায় বাজেট প্রণয়নের শুরুটাই হয় 'টাকাপয়সাকে' মূল অবজেক্ট অথবা উদ্দিষ্ট-লক্ষ্য-অভীষ্ট ধরে নিয়ে। বাজেটপ্রণেতারা প্রথমেই যা ঠিক করেন, তা হলো "কত টাকাপয়সা আছে" (যাকে বলা হয় resource envelope)। আমরা মনে করি বই-পুস্তকে লেখা এবং বাস্তবে প্রয়োগকৃত বাজেট বিনির্মাণ ভাবনার এ পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এ ভ্রান্তি সঠিক ধরে নিয়েই প্রাক্-বাজেট ও বাজেট প্রণয়নপরবর্তী তর্ক-বিতর্ক হয়; গণমাধ্যম অযথা সোচ্চার হয়—**এসবই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর বাজেটবিষয়ক চিন্তনপদ্ধতিতে শক্তভাবে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। এসবের বিপরীতে "শোভন অর্থনীতি ব্যবস্থায়" আমাদের বাজেট প্রণয়ন কর্মকাণ্ডের শুরুটাই হচ্ছে "কত টাকাপয়সা আছে" দিয়ে নয়, "কী কী প্রয়োজন তা দিয়ে"। অর্থাৎ বাজেট প্রণয়নের হিসাবপত্তর শুরু হচ্ছে "resource envelope" দিয়ে নয় "envelope of things to do" দিয়ে। আর "envelope of things to do" অথবা "envelope of things need to be done"-এর মধ্যে থাকবে আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ দলিল সংবিধান প্রতিশ্রুত মানুষের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন, কাজ, বিশ্রাম-বিনোদন, সংস্কৃতি চর্চা থেকে শুরু করে মানুষের সুস্থ-সৃজনশীল বিকাশের জন্য যা-কিছু প্রয়োজন—সবই। এক্ষেত্রে 'envelope of resources' অর্থাৎ 'টাকাপয়সা' কোনো অর্থেই অবজেক্ট বা অভীষ্ট বস্তু নয়, তা লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমমাত্র।** কারণ, টাকাপয়সার অভাব কৃত্রিম বিষয়; আসলে টাকাপয়সার কোনো অভাবই নেই, যখন আমরা দেখছি যে—আমাদের সরকারি বাজেট মাত্র ৬-৭ লক্ষ কোটি টাকা, অথচ আমাদের হিসাবে দেশে বিগত ৪৬ বছরে (১৯৭২/৭৩-২০১৮/১৯ অর্থবছরে) সৃষ্ট মোট পুঞ্জীভূত কালোটাকার পরিমাণ হবে আনুমানিক ৮৮ লক্ষ ৬১ হাজার ৪৩৭ কোটি টাকা (দেখুন, সারণি ৩; যে পরিমাণ অর্থে কমপক্ষে ১১ বছরের বাজেট করা সম্ভব), ঠিক একই সময়ে পাচারকৃত মোট অর্থের পরিমাণ হবে আনুমানিক ৭ লক্ষ ৯৮ হাজার ৩২৭ কোটি টাকা; সম্পদ কর থেকেই মোট ৫০ লক্ষ কোটি টাকা আহরণ সম্ভব, যা থেকে ১ বছরের বিকল্প বাজেটের জন্য সম্পদ কর হিসেবে কমপক্ষে ২-৩ লক্ষ কোটি টাকা আহরণ সম্ভব; উপরুন্তু অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর থেকেই ১ বছরে কমপক্ষে ১ লক্ষ কোটি টাকা আহরণ সম্ভব। অর্থাৎ **"টাকাপয়সা কী পরিমাণ আছে" তা ধরে নিয়ে বাজেট বিনির্মাণ পদ্ধতিটাই ভ্রান্ত। আমাদের পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিপরীত—মানুষের জন্য সুস্থ-সবল-সমৃদ্ধ-সৃজনশীল-অসাম্প্রদায়িক-মুক্তচিন্তার জীবন বিনির্মাণে যা যা দরকার, সেসবের হিসেবপত্তর থেকেই বাজেট বিনির্মাণপ্রক্রিয়া শুরু। সংগত কারণেই আমরা "বাজেট ব্যালেন্স" করার পক্ষে নই** (তা আমাদের প্রয়োজনও নেই), **আমরা "মানুষের জীবনের অর্থনীতি ব্যালেন্স" করার পক্ষে।**

উল্লিখিত পঞ্চমাত্রিক ভিত্তি-নীতি মান্য করে বাজেট প্রণয়নে আমাদের লক্ষ্য হবে—পূর্ণ কর্মনিয়োজন, শিশুর জন্য সুস্থ জীবন, সবার জন্য আবাসন, মূল্যস্ফীতি রোধ—এক্ষেত্রে বাজেট কোনো অভীষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হবে না, তা হবে লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমমাত্র। "শোভন অর্থনীতি ব্যবস্থায়" এ ধরনের বাজেট প্রণয়নের মাধ্যমে আয় ও সম্পদ বণ্টনে ন্যায্যতা বাড়বে, বৈষম্য দূর হবে, তথাকথিত কৃচ্ছ সাধনের (অর্থাৎ বেল্ট টাইট করার) প্রয়োজন হবে না, অর্থনীতিতে মোট চাহিদা (aggregate demand) বাড়বে, উৎপাদন বাড়বে, যা ইচ্ছা তাই-ই উৎপাদন হবে না (যেমন পরিবেশদূষণ, স্বাস্থ্যহানিকর ঔষধপত্তর, অপসংস্কৃতি ইত্যাদি), পূর্ণ কর্মনিয়োজন নিশ্চিত হবে (বেকারত্ব থাকবে না), কোনো ধরনের ঘাটতি এবং ঋণ (deficit and debt) নিয়ে ভাবতে হবে না। কিন্তু শোষণভিত্তিক-ব্যক্তিস্বার্থনির্ভর-লোভলালসাভিত্তিক-মুনাফা-উদ্দিষ্ট পুঁজিবাদ এসব পারবে না। এসব পারবে—'শোভন জীবনব্যবস্থা' বিনির্মাণ-উদ্দিষ্ট শোভন অর্থনৈতিক ও শোভন সামাজিক কর্মকাণ্ড, যা রাজনৈতিক মতাদর্শগত প্রশ্ন।

এতক্ষণ যা বললাম তার সবই যখন সত্য, তখন এ প্রশ্নই তো অমূলক-অবান্তর যে—পুঁজিবাদ ফলপ্রদ সিস্টেম বা দক্ষ সিস্টেম কি-না? পুঁজিবাদ ফলপ্রদতাবিরোধী, অদক্ষ, জাতীয় সম্পদের অপচয়কারী, অসামাজিক এবং মানবতাবিরোধী সিস্টেম; কারণ তা মানুষ বাঁচাতে ফলপ্রদহীন—আর মানুষ মারতে তার সম্পদ অপচয়ের, দক্ষতার এবং অমানবিকতার জুড়ি নেই। তাহলে তো ফলপ্রদহীন, অদক্ষ, অমানবিক, সম্পদ অপচয়কারী পুঁজিবাদী সিস্টেম বর্জন করে তা মানবিক, সামাজিক, দক্ষ, ফলপ্রদ ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারকারী অন্য কোনো বিকল্প সিস্টেম দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে হবে। ওই বিকল্প সিস্টেমই আমাদের প্রস্তাবিত 'শোভন সমাজব্যবস্থা', 'শোভন অর্থনীতিব্যবস্থা', 'শোভন জীবনব্যবস্থা'র তত্ত্ব। আর এই 'শোভন সমাজব্যবস্থা'র অবিচ্ছেদ্য হাতিয়ার হিসেবেই প্রণীত হয়েছে "বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিকল্প বাজেট ২০২৪-২০২৫"।

আসন্ন বাজেটের ভিত্তি-নীতির ভিত্তিকথা নিয়ে যে পাঁচটি বাস্তব বিষয়-প্রবণতা উল্লেখ করলাম, তা থেকে আমরা মনে করি—মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আলোকিত মানুষের বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে এবং দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে বাঁচানোর লক্ষ্যে বাজেটপ্রণেতারা এবারের বাজেটে নিদেনপক্ষে দুটি বড় মাপের বিষয় নিয়ে ভাববেন:

প্রথম বিষয় যা নিয়ে তারা ভাববেন: আয়-ধন-সম্পদের বণ্টন হতে হবে ন্যায্য—তা ধনীদের কাছ থেকে প্রবাহিত হতে হবে দরিদ্র, বিত্তহীন, নিম্নবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের হাতে। এ লক্ষ্যে বাজেট যা পারে, তা হলো— (১) ধনী-বিত্তশালীদের ওপর সম্পদ কর আরোপ করা, (২) সুপার-ডুপার ধনীদের ক্ষেত্রে কর হার বাড়ানো, (৩) শেয়ারবাজার ও বন্ড বাজারে বড় বিনিয়োগের ওপর সম্পদ কর আরোপ করা (আসলে খুব কমসংখ্যক মানুষই ৮০ শতাংশ শেয়ার-বন্ডের মালিক), (৪) অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর আরোপ করা (tax on excess profit), (৫) কালোটাকা বাজেয়াপ্ত (জব্দ) ও উদ্ধার করা, (৬) পাচারকৃত অর্থ (money laundering) উদ্ধার করা।

দ্বিতীয় বিষয় যা নিয়ে তারা ভাববেন: সরকারিভাবেই শোভন মজুরির ব্যাপক কর্মসংস্থান-সুযোগ সৃষ্টি করা। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে অতিরিক্ত টাকা ছাপালেও কোনো অসুবিধা হবে না (তবে 'ভারসাম্য' বিষয়টি নজরে রাখতে হবে, যেন অপ্রয়োজনে টাকা ছাপানো না-হয়)। অবশ্য, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আর বিশ্বব্যাংকের নব্য-উদারবাদী অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতি-মতাদর্শে বিশ্বাস করলে এসব করা সম্ভব হবে না। কিন্তু ১৯২৯-৩৩ সময়কালের মহামন্দা থেকে উত্তরণে সরকারি উদ্যোগে 'New Deal' নীতির আওতায় ব্যাপক কর্মসংস্থানের যেমন কোনো বিকল্প ছিল না—এখনো তেমনি দ্বিতীয় কোনো বিকল্প নেই। তবে এখনকারটা হতে হবে প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ সম্মান ও আনুগত্যভিত্তিক "সবুজ নিউ ডিল" ("Green New Deal")

অধ্যায় ৩

বিকল্প বাজেট ২০২৪-২৫: বৈষম্য নিরসনমুখী বাজেটের ভাবনা-ভিত্তি

মানব ইতিহাসে এর আগে কখনো তিনটি মহাবিপর্যয়–মহাদুর্যোগ-মহাদুর্ঘটনা মোটামুটি একই সঙ্গে ঘটেনি: (১) বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা, (২) কোভিড-১৯ উদ্ভূত মহামারি, এবং (৩) ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মাধ্যমে আপাতত ইউরোপে যুদ্ধের দামামা। বাংলাদেশে আমরাও এই ত্রিমাত্রিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি। ২০২১ সালে আমরা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছরপূর্তি উদ্‌যাপন করলাম—ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ও বহুমাত্রিক দারিদ্র্য-বঞ্চনার পরিবেশে। এসবের সাথে ২০২০ সালে যুক্ত হলো বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দা এবং একই সাথে কোভিড-১৯ অতিমারির লকডাউনের কারণে বিপর্যস্ত সমাজ ও অর্থনীতি। এসবের সাথে গত বছর যোগ হলো রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ, যার মরণ-অভিঘাত সর্বব্যাপ্ত।

এহেন দুঃসময়-মহাবিপর্যয়ে নির্মোহ বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণভিত্তিক একটি বাজেট দেশের আপামর মানুষ প্রত্যাশা করবেন—এ আশা অমূলক হবে না। উল্লিখিত বিপর্যয়ের সামগ্রিক ও বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণভিত্তিক বাজেটের প্রধান লক্ষ্য হতে হবে—আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ বৈষম্যহীন 'শোভন বাংলাদেশ' বিনির্মাণ—যা ছিল '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা। এ বিশ্বাসও অমূলক হবে না যে এসব বিপর্যয় মানুষের (আমাদের) অন্তর্নিহিত শক্তিকে দুর্বল করবে না, উল্টো এ বিপর্যয় কাঙ্ক্ষিত মানবিক উন্নয়ন-প্রগতির গতি বাড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি করবে। আমাদের লক্ষ্য হতে হবে—সেই সুযোগ উদ্‌ঘাটন-অনুসন্ধান করা এবং তা দেশের মানুষের জন্য কাজে লাগানো। আমরা একদিকে যেমন জানি যে এসব এক বাজেটের কাজ নয়, আবার অন্যদিকে এটাও বিশ্বাস করি যে—কাজটি শুরু করতে হবে।

বাজেটসহ আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে ধার করা নয় অথবা (আমাদের ওপর) বহিঃশক্তির চাপিয়ে দেওয়া নয় অথবা সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক নয়া-উদারবাদী কোনো মতাদর্শ নয়—এসবের বিপরীতে "প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ সম্মান ও আস্থাভিত্তিক বৈষম্য হ্রাস-উদ্দিষ্ট উন্নয়নদর্শন"ই সঠিক পথ বলে আমরা বিবেচনা করি। কারণ, তাই-ই ছিল ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-ভিত্তি। আমরা বিশ্বাস করি—মুক্তিযুদ্ধের শুভ চেতনায় বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব—যৌক্তিক, নৈতিক, মানবিক—সব বিচারেই তা সম্ভব; সম্ভব এ দেশের দ্রুত কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন; সম্ভব উন্নত আলোকিত বাংলাদেশ গড়া; সম্ভব বৈষম্যহীন সমাজ গড়া; সম্ভব অসাম্প্রদায়িক মানবসমাজ সৃষ্টি করা। আমরা এটিও বিশ্বাস করি—মহামারি-বিপর্যয়-যুদ্ধ সেই সুযোগ সৃষ্টি করেছে, যা 'শোভন সমাজব্যবস্থা' বিনির্মাণের শ্রেষ্ঠ সময়। এই সুযোগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সমগ্র দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার 'শ্রেষ্ঠ সুযোগ'।

জনগণতান্ত্রিক বিকল্প বাজেটের ভাবনা-ভিত্তি
১. সাংবিধানিক ভিত্তি ২. জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধিকতর সক্রিয় ও ফলপ্রদ ভূমিকা ৩. বৈষম্য-অসমতা-বহুমাত্রিক দারিদ্র্য দূরীকরণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা প্রদানকারী খাত-ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ৪. কভিড-১৯-এর অভিঘাত মোকাবিলায় উন্নয়ন-ভবিষ্যৎ নিয়ে সুনির্দিষ্ট ভাবনা ৫. ব্যয় ও আয়ের কাঠামোগত রূপান্তর ৬. বৈদেশিক ঋণ নির্ভরতা থেকে মুক্তি ৭. লুটেরা-ধনী গোষ্ঠীর সম্পদ শ্রেণি মইয়ের নিচের দিকে (দরিদ্র-বিত্তহীন-প্রান্তস্থ-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে) প্রবাহিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় (বাজেটীয়) আয়ের ক্ষেত্রে লুটেরা-ধনীদের ওপর যুক্তিসংগত চাপ প্রয়োগ (যার ফলে একই সাথে বৈষম্য কমবে এবং কর-জিডিপি অনুপাত বাড়বে) ৮. পরোক্ষ করের তুলনায় প্রত্যক্ষ করের ওপর জোর ৯. কোনো আয়ই আসে না, অথচ সম্ভাবনা অনেক—এসব খাত-ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ১০. বাজেট বরাদ্দে মানুষের জীবনকুশলতার অগ্রাধিকার ১১. মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় নতুন প্রতিষ্ঠান, মন্ত্রণালয় ও বিভাগ গঠন ১২. মানব উন্নয়ন ও মানবসম্পদ-উন্নয়ন ১৩. আমদানি শুল্ক হার নির্ধারণে দেশজ শিল্পায়ন ও দেশজ কৃষি সুরক্ষার প্রাধান্য ১৪. প্রকৃত মানবিক উন্নয়নের পথনির্দেশক দলিল
উৎস: বারকাত, আবুল (২০২০), বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা। পৃ. ৫২১-৫২৫ক

এতক্ষণ নীতি-দর্শনগত যে মৌলকথন হলো, সেসবের ভিত্তিতে আসন্ন বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগতভাবে যেসব বিষয় বা 'অনুসিদ্ধান্তের' ওপর আমরা জোর দিয়েছি এবং সরকারকে অগ্রাধিকার প্রদানের কথা ভাবতে সুপারিশ করেছি, তা নিম্নরূপ:

(১) ***সাংবিধানিক ভিত্তি:*** বাজেট প্রণয়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন— সংবিধানের বিধানসমূহকে ভিত্তি হিসেবে ধরে নিতে হবে। সংবিধানের সঙ্গে সাযুজ্যহীন অথবা অসংগতিপূর্ণ অথবা বিরোধাত্মক—এ ধরনের সবকিছু বাজেট প্রণয়নে বর্জন করতেই হবে। 'সচেতনবর্জিত' বিষয়াদি হতে হবে সংবিধানের ৭ (১) ও ৭ (২) অনুচ্ছেদে "সংবিধানের প্রাধান্য"র সঙ্গে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ, যা নিম্নরূপ:

"৭ (১) *প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীনে ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।*

(২) *জণগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।*" [গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭ (১), (২)]

(২) ***জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধিকতর সক্রিয় ও ফলপ্রদ ভূমিকা:*** অর্থনৈতিক উন্নয়নে নয়া-উদারবাদী দর্শনের বিপরীতে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধিকতর সক্রিয় ও ফলপ্রদ ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ স্বীকার করে (যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংবিধানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ) রাষ্ট্রের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে ব্যয় বরাদ্দ নিরূপণ ও আয় নির্ণয় করা প্রয়োজন। আমরা মনে করি, কভিড-১৯-এর মহাবিপর্যয়কর আঘাতসহ অর্থনৈতিক-সামাজিক সংকট মোকাবিলা এবং একই সঙ্গে প্রাকৃতিক যুক্তির বৈষম্যহীন সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র বিনির্মাণে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে **জনগণের জন্য বাজেট** (অর্থাৎ জনগণতান্ত্রিক বাজেট) হতে হবে সম্প্রসারণমূলক। আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট ঠিক এ রকমই ভারসাম্যপূণ—সম্প্রসারণমূলক (দেখুন, সারণি ৫, ৮)। আমরা সম্পূর্ণ অবগত যে, নব্য-উদারবাদীরা রাষ্ট্র-সরকারের নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে নেওয়ার কথা এখন আরও জোর দিয়ে বলবেন। তাদের অনেকেই এখন বলছেন, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বেশি হওয়ার ফলেই বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ মহামন্দামুখী; বলছেন, বাজারকে তার কাজ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে বলেই মহাবিপর্যয় হচ্ছে এবং হবে; বলছেন যে, সরকারের এখন উচিত হবে—যেখানে যত অর্থকড়ি আছে, তার সবই ব্যক্তিমালিকদের হাতে তুলে দিলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

(৩) ***বৈষম্য-অসমতা-বহুমাত্রিক দারিদ্র্য দূরীকরণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা প্রদানকারী খাত:*** বাজেট বরাদ্দে সেসব খাত-ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়া জরুরি, যেসব খাত দ্রুতগতিতে বৈষম্য-অসমতা ও বহুমুখী দারিদ্র্য দূরীকরণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে; যেসব খাতের বরাদ্দে দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক অভিঘাত হয় ধনাত্মক; যেসব খাতের বরাদ্দ কৃষির বিকাশ, দেশজ শিল্পায়ন, অভ্যন্তরীণ বাজার, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ মানবসম্পদের বিকাশকে ত্বরান্বিত করে; যেসব খাতের বরাদ্দ প্রকৃতি-পরিবেশ-প্রতিবেশের সম্মান-সহায়ক, যেসব খাতের বরাদ্দ মানবসত্তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা-সহায়ক। আমাদের বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনায় এসব স্পষ্ট প্রতিভাত হয় (দেখুন, সারণি ৫)।

(৪) ***কভিড-১৯ ও অর্থনৈতিক মন্দার অভিঘাত মোকাবিলায় উন্নয়ন-ভবিষ্যৎ নিয়ে সুনির্দিষ্ট ভাবনা:*** কভিড-১৯ ও *অর্থনৈতিক মন্দার* সম্ভাব্য অভিঘাত নিয়ে গবেষণা-উদ্ভূত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব বাজেটে থাকতে হবে।

(৫) ***ব্যয় ও আয়ের কাঠামোগত রূপান্তর:*** সংগত কারণেই বাজেটের ব্যয় ও আয় খাতে কাঠামোগত রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা জরুরি। এ বিবেচনার ভিত্তি হবে সংবিধানের ভিত্তিতে 'শোভন সমাজ-শোভন অর্থনীতি বিনির্মাণ'। আমাদের জনগণতান্ত্রিক বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে এ রূপান্তর দৃশ্যমান (দেখুন, সারণি ৫, ৮, ১০)।

(৬) ***বৈদেশিক ঋণ নির্ভরতাবিহীন:*** কোনো ধরনের বৈদেশিক ঋণের প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই বাজেট প্রণয়ন করা সম্ভব এবং আমরা সেটাই করেছি (দেখুন, সারণি ৮)। এ অনুসিদ্ধান্তের মূল কারণ

দ্বিবিধ—(ক) আমরা অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক সার্বভৌমত্ব গুরুত্বপূর্ণ মনে করি, এবং (খ) আমরা মনে করি বৈদেশিক ঋণ নব্য-উদারবাদী মুক্তবাজার মতবাদতাড়িত, যা স্বাধীন বিকাশের প্রতিবন্ধক। তবে বিদ্যমান রেন্টসিকার-লুটেরা-দুর্বৃত্ত ডাকিনীবিদ্যক পুঁজি ও করপোরেশনবেষ্টিত (যাকে বলে Zombie corporation) রাজনীতি-অর্থনীতি ব্যবস্থায় রাষ্ট্র-সরকার তুলনামূলক কম বিষাক্ত (less toxic) বৈদেশিক ঋণ নিলেও নিতে পারেন (বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এটা হতে পারে প্রয়োজনীয় আপসমূলক অবস্থান)। আমরা মনে করি দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক-পরিবেশগত-অর্থনৈতিক প্রভাব-অভিঘাত বিবেচনা না করে কোনো ধরনের প্রকল্প-মেগাপ্রকল্প গ্রহণ করা আত্মঘাতি। আরো আত্মঘাতি—যদি তা বৈদেশিক ঋণনির্ভর হয়।

(৭) ***লুটেরা-ধনী গোষ্ঠীর সম্পদ শ্রেণি মইয়ের নিচের দিকে প্রবাহিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় আয়ের ক্ষেত্রে লুটেরা-ধনীদের ওপর যুক্তিসংগত চাপ প্রয়োগ:*** ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতা-বহুমাত্রিক দারিদ্র্যসহ *কভিড-১৯* ও ***অর্থনৈতিক মন্দা***-উদ্ভূত বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের বাজেটের জন্য সম্পদ আহরণ ও বৈষম্য হ্রাসের অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে সরকারের রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ওপর—দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত-মধ্য মধ্যবিত্ত—কোনো ধরনের চাপ প্রয়োগ আমরা সমীচীন মনে করি না। আমরা মনে করি, চাপ প্রয়োগ করা দরকার পরজীবি-লুটেরা ধনিক শ্রেণি তথা সম্পদশালীদের ওপর। পরজীবী-লুটেরা-ধনী ও বিত্তসম্পদশালী ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান, যারা কখনও সঠিক কর প্রদান করেন না, তারা যেন সঠিক পরিমাণ কর প্রদান করেন—তা নিশ্চিত জরুরি। একই সঙ্গে প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর হার নির্ধারণ জরুরি—তবে দেখতে হবে তা যেন কখনও সাধারণ মানুষের জন্য 'কর দাসত্ব' না হয় আর পরজীবী-লুটেরা-ধনী গোষ্ঠীর সম্পদ শ্রেণি মইয়ের নিচের দিকে প্রবাহিত করে। আমরা সেটাই করেছি (দেখুন, সারণি ৮ ও ৯)।

(৮) ***পরোক্ষ করের তুলনায় প্রত্যক্ষ করের অনুপাত:*** পরোক্ষ করের বোঝা মূলত দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্য মধ্যবিত্তদের ওপর তাদের আয়ের তুলনায় অধিক হারে চাপ প্রয়োগ করে; ফলে তা বৈষম্য-দারিদ্র্য-বঞ্চনা হ্রাস করে না। উল্টো তা বৈষম্য-অসমতা-দারিদ্র্য বাড়ায়। সে কারণে আমরা মনে করি, রাষ্ট্রের কর কাঠামোতে পরোক্ষ করের তুলনায় প্রত্যক্ষ করের অনুপাত বেশি হতে হবে। আমরা সেটাই করেছি (দেখুন, সারণি ৮, ৯, ১০)।

(৯) ***কোনো আয়ই আসে না, অথচ সম্ভাবনা অনেক:*** কর-রাজস্ব ও করবহির্ভূত রাজস্ব আয়ের সেসব খাত অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, যেসব খাত থেকে আয়করের কথা কখনো ভাবা হয় না (যেমন সম্পদ কর, অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর, কালোটাকা বাজেয়াপ্ত (জব্দ/ উদ্ধার) করা, পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার ইত্যাদি) এবং যেসব খাত থেকে কোনো আয়ই আসে না, অথচ সম্ভাবনা অনেক। একই সঙ্গে সেসব খাত চিহ্নিত করা প্রয়োজন, যেসব খাত থেকে স্বল্প আয় আসে, অথচ প্রাপ্তির সম্ভাবনা অনেক—যদি একটু সাহসী ও উদ্যমী হওয়া যায় এবং কর-রাজস্ব ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা যায়। আমাদের জনগণতান্ত্রিক বাজেটে আমরা এসব প্রস্তাব করেছি (দেখুন সারণি ১)। আমাদের এসব প্রস্তাব বাস্তবায়ন করলে একদিকে বৈষম্য হ্রাস পাবে, আর অন্যদিকে কর-জিডিপি অনুপাতও বাড়বে।

(১০) ***জনগণতান্ত্রিক বাজেট বরাদ্দে অগ্রাধিকার:*** 'শোভন জীবনব্যবস্থা' নিশ্চিতকরণে যে উন্নয়নদর্শন সঠিক বলে আমরা মনে করি, সে কারণেই জনগণতান্ত্রিক বাজেটে—বাজেট বরাদ্দে আমাদের **অগ্রাধিকারক্রম** নিম্নরূপ: সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ, শিক্ষা ও প্রযুক্তি, কৃষি, জনপ্রশাসন, স্বাস্থ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ, সুদ, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, গণপরিবহন, গৃহায়ণ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, গবেষণা-উদ্ভাবন-বিচ্ছুরণ ও উন্নয়ন, শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস, জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, বিবিধ ব্যয়, বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম (সংস্কৃতি ও ধর্মকে আমরা একবন্ধনী খাত থেকে দুটি ভিন্ন খাত হিসেবে প্রস্তাব করেছি) (দেখুন, সারণি ৫)।

(১১) ***মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়নে নতুন প্রতিষ্ঠান (মন্ত্রণালয় ও বিভাগ) গঠন:*** জনগণের স্বার্থ বিবেচনায় মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাজেটের সম্পদ ব্যবহারে আমরা দুটি নতুন মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে মোট ১৬টি বিভাগ প্রস্তাব করেছি। আমাদের প্রস্তাবিত নতুন ২টি মন্ত্রণালয় হলো **গণপরিবহন মন্ত্রণালয়** (Ministry of Public Transport), এবং **গবেষণা, উদ্ভাবন, বিচ্ছুরণ ও উন্নয়ন মন্ত্রণালয়** (Ministry of Research, Innovation, Diffusion and Development)। আর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রস্তাবিত নতুন ১৬টি বিভাগ (Division/ Directorate) হলো নিম্নরূপ: **সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন**—(১) প্রবীণ হিতৈষী বিভাগ, (২) দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়ন বিভাগ, (৩) নারীর ক্ষমতায়ন বিভাগ (গ্রাম ও শহরের দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও নারীপ্রধান খানা), (৪) আদিবাসী মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়ন বিভাগ, (৫) শিশুবিকাশ বিভাগ, (৬) বিধিবদ্ধ রেশনিং বিভাগ (দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জন্য), (৭) সার্বজনীন পেনশন বিভাগ, (৮) দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের আবাসন বিভাগ; **স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন**—(৯) জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা বিভাগ; **শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন**—(১০) নারীর বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগ, (১১) কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, (১২) মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ; **কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন**—(১৩) কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার বিভাগ, (১৪) হাওর-বাঁওর-বিল-চর-উপকূল উন্নয়ন বিভাগ; **পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে**—(১৫) অর্থনৈতিক কূটনীতি বিভাগ; **বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন**—(১৬) অণু ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিভাগ (দেখুন, সারণি ৫ ও ১০)।

(১২) ***মানব উন্নয়ন ও মানবসম্পদ-উন্নয়ন:*** মানব উন্নয়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়নসহ উৎপাদনশীল বিনিয়োগে বৈষম্য-অসমতা-বহুমাত্রিক দারিদ্র্য দূরসহ সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী (কৃষকের শস্যবীমা ও ভূমি সংস্কারসংশ্লিষ্ট কার্যক্রম), কৃষি, স্বাস্থ্য, খাদ্য মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগ, গৃহায়ণ, সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ-এর বরাদ্দে আমরা যুক্তিসংগত অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রস্তাব করছি (দেখুন, সারণি ৫)।

(১৩) ***আমদানি শুল্ক হার নির্ধারণে দেশজ শিল্পায়ন ও দেশজ কৃষি:*** আমদানি শুল্ক হার নির্ধারণে দেশজ শিল্পায়ন ও দেশজ কৃষির স্বার্থ বিবেচনায় কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ খাত-উপখাতসমূহের

ক্ষেত্রে আমরা মুক্তবাজার দর্শনের বিপরীতে সংরক্ষণবাদ নীতি-দর্শন প্রয়োগের সুপারিশ করছি (এসবই দৃশ্যমান সারণি ৫ ও ৬-এ)।

(১৪) ***প্রকৃত মানবিক উন্নয়নের অন্যতম পথনির্দেশক দলিল:*** আসন্ন বাজেটে আয়-ব্যয় বিন্যাসসহ বিভিন্ন নীতি-কৌশলসংশ্লিষ্ট নির্দেশনা মেনে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির সম্ভাব্য অর্জনমাত্রা নিরূপণ করা প্রয়োজন: (ক) প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ আস্থা ও সম্মান বজায় রেখে প্রস্তাবিত ব্যয় ও আয় যেন বৈষম্যহ্রাসকারী মানবিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে, (খ) সমাজের সকল দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত মানুষের সম্ভাব্য দ্রুতগতিতে জীবনমান বৃদ্ধির নিশ্চয়তা, (গ) বণ্টন ন্যায্যতা নিশ্চিতসহ উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, (ঘ) অধিকতর কার্যকর, বৈচিত্র্যপূর্ণ উৎপাদনশীল কৃষি, (ঙ) অধিক হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ ন্যায্য মজুরির নিশ্চয়তা, (চ) শিল্পায়ন—অণু, ক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ (আত্মকর্মসংস্থানসহ) এবং শিল্পে শ্রমিকের মালিকানাভিত্তিক অংশীদারিত্ব, (ছ) অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং শোভন কাজ, (জ) কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার, (ঝ) নারীর অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়ন, (ঞ) বাণিজ্য ও পণ্য বাজারজাতকরণে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস এবং কৃষকের পণ্যের ন্যায্য মূল্যপ্রাপ্তি, (ট) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বোত্তম জনকল্যাণকর ব্যবহার, (ঠ) সরকারি খাতে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড প্রভৃতির মাধ্যমে জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর, (ড) প্রাথমিক ও উচ্চতর স্বাস্থ্যসেবা (জনস্বাস্থ্য সুরক্ষাসেবাসহ) নিশ্চিতকরণে শক্তিশালী সরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাত, এবং (ড়) সবধরনের সামাজিক সুরক্ষার বিস্তৃতিসহ সুসংগঠিত সামাজিক বীমা পদ্ধতি।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে উল্লিখিত পদ্ধতিগত ভিত্তি-ভাবনা প্রয়োগে আমরা মনে করি—আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটের মোট আকার (পরিচালন ও উন্নয়ন মিলে) হওয়া উচিত কমপক্ষে **১১** লক্ষ ৯৫ হাজার ৪৮৬ কোটি টাকা (পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তারিত বলা হবে)। আমাদের প্রস্তাব বৃহদাকার-সম্প্রসারণশীল বাজেট। আমরা আশা করি, যুক্তি থাকলে জনগণ ও রাষ্ট্র আমাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন। কারণ, চলমান বৈষম্য-অসমতা-বহুমাত্রিক দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক মহামন্দা, কভিড-১৯-এর বিপর্যয়কর অভিঘাতসহ ইউরোপে ও মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ এবং তার সম্ভাব্য ঋণাত্মক অভিঘাত মোকাবিলা করে অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে আমরা এ দেশে আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ বৈষম্যহীন 'শোভন সমাজব্যবস্থা' বিনির্মাণের পক্ষে। কারণ সেটাই ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের জনসম্মতি।

অধ্যায় ৪

বিকল্প বাজেট ২০২৪-২৫: উন্নত বাংলাদেশ অভিমুখী বাজেটে বৃহৎ বর্গভিত্তিক সুপারিশ

৪.১ ভূমিকা

এ কথা মনে করার কোনোই যুক্তি নেই যে বৈশ্বিক পুঁজিবাদী আধিপত্যের কাঠামোতে বৈশ্বিক অর্থনীতি ও সমাজ (বাংলাদেশ যার বাইরের সত্তা নয়) খুব ভালোই চলছিল, মাঝখান দিয়ে কভিড-১৯ মহামারি আর ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ সব লণ্ডভণ্ড করে দিল। আদৌ বিষয়টি এ রকম নয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে মহামন্দা অনিবার্য বিষয়। পুঁজিবাদী বৈশ্বিক অর্থনীতিতে ওই মহামন্দা ঘটার কথা ২০১৯-২০-এর দিকেই। আর এই অনিবার্য মহামন্দা সময়কালের সাথে কভিড-১৯ মহামারির সময়কালটা মিলে গেছে—যা ইতিহাসে এর আগে ঘটেনি। আর তারই সাথে ২০২১-এ ইউরোপে মহাযুদ্ধের আশঙ্কা। সুতরাং একদিকে যেমন কভিড-১৯-এর বিপর্যয়কর প্রত্যক্ষ প্রভাব-অভিঘাতের স্বরূপ বুঝতে হবে এবং সে অনুযায়ী সমাধান-প্রস্তাব দিতে হবে; তেমনি অন্যদিকে অর্থনৈতিক-সামাজিক মহামন্দায় কভিড-১৯ যতটুকু প্রভাব-অভিঘাত ফেলেছে এবং ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা—এসবও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণপূর্বক সংশ্লিষ্ট শোভন জীবনব্যবস্থার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রস্তাব করতে হবে। এটাই সমাজ সমগ্রকের রাজনৈতিক-অর্থনীতির বিষয়বস্তু। এই অধ্যায়ে পদ্ধতিগত ভাবনার নিরিখে আমরা ঠিক এ কাজটিই করেছি।

আমরা ইতিমধ্যে যেসব বিষয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি এবং প্রয়োজনীয় উপসংহারসহ সুপারিশ প্রস্তাব উত্থাপন করেছি এই অধ্যায় তারই যৌক্তিক ধারাবাহিকতা। এই অধ্যায়ের মূল বিষয়াদি শিরোনামেই স্ব-ব্যাখ্যায়িত। সন্ধানের বিষয়টি অনুসন্ধান করে ওই প্রক্রিয়া ত্বরান্বয়ন-উদ্দিষ্ট বিষয়াদি এই অধ্যায়ের মূল লক্ষ্য। আর সংগত কারণেই অধ্যায়টির কলেবর তুলনামূলক বড় (কলেবর স্বল্পতায় প্রয়োজনীয় বিষয় হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে)।

আমরা ইতিমধ্যে স্বল্প পরিসরে বেশকিছু সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি। এ প্রক্রিয়ায় শেষপর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গ-উপবিষয়াদিকে যুক্তিসংগত শ্রেণিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। এসব যৌক্তিক শ্রেণিই হলো বিষয়ভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন বর্গ বা গ্রুপ। এই প্রক্রিয়ায় যে **২৪টি মূল বিষয় বা বৃহৎ বর্গ** নির্মিত হলো সেগুলো নিম্নরূপ: (১) বৈষম্য-অসমতা-দারিদ্র্য: অশোভন সমাজের গোড়ার কথা; (২) সামাজিক সুরক্ষা-নিরাপত্তাবেষ্টনি-মানবকল্যাণ; (৩) মূল্যস্ফীতি ও মূল্যসংকোচনসংশ্লিষ্ট; (৪) বিনিয়োগ-সঞ্চয়: সরকারি ও বেসরকারি; (৫) রেমিট্যান্স প্রবাহের উৎপাদনশীল ব্যবহার; (৬) পুঁজিবাজার; (৭) ব্যাংক; (৮) বৈদেশিক খাত: আমদানি ও রপ্তানি; (৯) বৈদেশিক ঋণ; (১০) কৃষি-ভূমি-জলা ও সংশ্লিষ্ট মেহনতি মানুষ; (১১) ভূমি মামলা: পারিবারিক ও জাতীয় অপচয়; (১২) ভূমি আইন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও নীতিমালা; (১৩) শিক্ষা: শোভন মানুষ সৃষ্টির সূতিকাগার; (১৪) স্বাস্থ্যখাত: শোভন সমাজ বিনির্মাণে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ খাত; (১৫) শিল্পখাত; (১৬) নারীর ক্ষমতায়ন ও শিক্ষার বিকাশ; (১৭) প্রতিবন্ধী মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি; (১৮) প্রকৃতি-জলবায়ু-পরিবেশ ভাবনা; (১৯) গবেষণা ও বিজ্ঞান চর্চা: ব্যয় নয় বিনিয়োগ; (২০) দেশরক্ষা-

আত্মরক্ষা-প্রতিরক্ষার ধারণা; (২১) সরকার টাকা পাবে কোথায়?; (২২) মন্ত্রণালয়সমূহের ভৌগোলিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং মন্ত্রণালয়, বিভাগ, স্থানীয় সরকার, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান, সাধারণ প্রশাসন, দাপ্তরিক বিকেন্দ্রীকরণ (স্থানান্তর); (২৩) বাজেট বাস্তবায়নসংশ্লিষ্ট বিষয়; (২৪) শোভন সমাজ বিনির্মাণ-উদ্দিষ্ট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (দেখুন, সারণি ১)।

বলে রাখা সংগত যে উল্লিখিত ২৪টি বৃহৎ বর্গের খাতসমূহ (বা উপবিষয়সহ মূল বিষয়) পরস্পরসম্পর্কিত, পরস্পরনির্ভরশীল এবং একই সাথে প্রতিটি বৃহৎ বর্গের আছে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং প্রতিটিই শর্তসাপেক্ষে স্বাধীন। আমরা ওই ২৪টি বৃহৎ বর্গ বা খাতকে সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতির প্রতিবিম্ব (mirror of Bangladesh society and economy) হিসেবে দেখি।

উল্লিখিত ২৪টি মূল বর্গের প্রতিটিকে শোভন বাংলাদেশ—বৈষম্যহীন ও অসাম্প্রদায়িক আলোকিত মানুষের বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বয়নের লক্ষ্যে কিছুটা বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিটির জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাব-সুপারিশ উত্থাপন করছি। উল্লেখ্য, আমরা যেসব সুপারিশ-প্রস্তাব উত্থাপন করছি, যার বেশির ভাগই এককালীন বা একবছরের জন্য নয়, এসব প্রস্তাবনা "শোভন জীবনব্যবস্থা-উদ্দিষ্ট প্রকৃতির প্রতি অনুগত উন্নয়নদর্শন" প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের অবিচ্ছেদ্য অংশমাত্র। সুতরাং আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশই আশুপ্রকৃতির নয়; যেমন আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে সন্নিবেশসংশ্লিষ্ট হলেও তা প্রকৃতপক্ষে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ মেয়াদ বিবেচনায় প্রণীত। আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য বিষয়ভিত্তিক আমাদের সুনির্দিষ্ট সুপারিশ নিচে বিধৃত করা হলো:

সারণি ১: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে বৃহৎ বর্গের বিষয়াদি ও সংশ্লিষ্ট সুপারিশ সংখ্যা

ক্রমিক	বাজেট সংশ্লিষ্ট বৃহৎ বর্গের বিষয়	সুপারিশ সংখ্যা
০১.	বৈষম্য-অসমতা-দারিদ্র্য: অশোভন সমাজের গোড়ার কথা	৯
০২.	সামাজিক সুরক্ষা-নিরাপত্তাবেষ্টনি-মানবকল্যাণ	৯
০৩.	মূল্যস্ফীতি ও মূল্যসংকোচনসংশ্লিষ্ট	৮
০৪.	বিনিয়োগ-সঞ্চয় : সরকারি ও বেসরকারি	৭
০৫.	রেমিট্যান্স প্রবাহ: বৃদ্ধি ও উৎপাদনশীল ব্যবহার	৪
০৬.	পুঁজিবাজার	২
০৭.	ব্যাংক	৩
০৮.	বৈদেশিক খাত : আমদানি ও রপ্তানি, রিজার্ভ	৯
০৯.	বৈদেশিক ঋণ	৩
১০.	কৃষি-ভূমি-জলা ও সংশ্লিষ্ট মেহনতি মানুষ	৫১
১১.	ভূমি মামলা: পারিবারিক ও জাতীয় অপচয়	১৪
১২.	ভূমি আইন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও নীতিমালা	১৪

সারণি ১ চলমান...

ক্রমিক	বাজেট সংশ্লিষ্ট বৃহৎ বর্গের বিষয়	সুপারিশ সংখ্যা
১৩.	শিক্ষা: শোভন মানুষ সৃষ্টির সূতিকাগার	১৭
১৪.	স্বাস্থ্যখাত : শোভন সমাজ বিনির্মাণে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ খাত	২০
১৫.	শিল্পখাত	৩০
১৬.	নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশুর বিকাশ	৪১
১৭.	প্রতিবন্ধী মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি	৪
১৮.	প্রকৃতি-জলবায়ু-পরিবেশ ভাবনা	২৪
১৯.	গবেষণা ও বিজ্ঞান চর্চা: ব্যয় নয় বিনিয়োগ	৮
২০.	দেশরক্ষা-আত্মরক্ষা-প্রতিরক্ষার ধারণা	৮
২১.	সরকার টাকা পাবে কোথায়?	৩৮
২২.	মন্ত্রণালয়সমূহের ভৌগোলিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং মন্ত্রণালয়, বিভাগ, স্থানীয় সরকার, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান, সাধারণ প্রশাসন, দাপ্তরিক বিকেন্দ্রীকরণ (স্থানান্তর)	৯
২৩.	বাজেট বাস্তবায়নসংশ্লিষ্ট বিষয়	১
২৪.	শোভন সমাজ বিনির্মাণ-উদ্দিষ্ট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	৮
	মোট	**৩৪১**

৪.২ বৈষম্য-অসমতা-দারিদ্র্য: অশোভন সমাজের গোড়ার কথা

আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটসহ ভবিষ্যতের সব উন্নয়ন দর্শন-দলিলে অন্তর্ভুক্তি এবং তা বাস্তবায়নে আমাদের প্রস্তাবসমূহ নিম্নরূপ:

বৈষম্য-অসমতা-দারিদ্র্য উচ্ছেদে অবশ্যকরণীয়

(১) শুধু আসন্ন ২০২৪-২৫ বাজেটই নয়, আগামী অন্তত পাঁচ বছরের বাজেট ও অন্যান্য পরিকল্পনা ও উন্নয়ন নীতি-কৌশল দলিল প্রণয়নে যে বিষয়টি নীতিনির্ধারকদের প্রধানতম ভিত্তি-নীতি (foundational principle) হিসেবে গ্রহণ করতেই হবে তা হলো: সমাজ থেকে চার ধরনের বৈষম্য– আয় বৈষম্য (income inequality), সম্পদ বৈষম্য (wealth inequality), স্বাস্থ্য বৈষম্য (health inequality) ও শিক্ষা বৈষম্য (education inequality) চিরতরে নির্মূল করা। এ লক্ষ্যে বাজেটের আয় খাত ও ব্যয় খাতে মৌলিক কাঠামোগত পরিবর্তন করতে হবে।

(২) বাজেটে অর্থায়নের উৎস নির্ধারণে দরিদ্র, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণির ওপর কোনো ধরনের কর-দাসত্ব আরোপ করা যাবে না। পরজীবী-লুটেরা ধনী-সম্পদশালীদের সম্পদ পুনর্বণ্টন করে তা শ্রেণিমইয়ের নিচের দিকে প্রবাহিত করতে হবে। এই কাজে

প্রধানতম পথ-পদ্ধতি হবে: যথেষ্ট বেশি হারে সম্পদ কর (বা wealth tax) আরোপ, অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর আরোপ (tax on excess profit), পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার (money laundering), কালোটাকা উদ্ধার (black money) (দেখুন, সারণি ৭)।

(৩) বাজেটে ব্যয়-বরাদ্দ নির্ধারণের ক্ষেত্রে "বৈষম্য হ্রাসকারী উন্নয়নদর্শনের" নিরিখে সেসব খাত-উপখাত-ক্ষেত্রকেই প্রাধান্য দিতে হবে, যা আপাতত বড় মাত্রায় বহুমুখী বৈষম্য হ্রাস করবে (পরবর্তীতে উচ্ছেদ করবে)—হ্রাস করবে আয় বৈষম্য, ধন বৈষম্য, স্বাস্থ্য বৈষম্য, শিক্ষা বৈষম্যসহ সবধরনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বৈষম্য-অসমতা (দেখুন, সারণি ৪)।

(৪) বাজেটের ব্যয় বরাদ্দে অগ্রাধিকার দিতে হবে অনানুষ্ঠানিক সেক্টরের প্রায় সব কর্মকাণ্ড (দেশের মোট ৬ কোটি ৮২ লক্ষ ৮ হাজার শ্রমশক্তির মধ্যে সাড়ে ৫ কোটি অর্থাৎ ৮৫ শতাংশ অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মী), যার মধ্যে আছে বিভিন্ন ধরনের অণু ও ক্ষুদ্র ব্যবসা ও শিল্প-কুটির শিল্প; কৃষি খাত—শস্য ও শাকসবজি-প্রাণিসম্পদ-মৎস্যসম্পদ-জলজসম্পদ; স্বাস্থ্যখাতে জরুরি ভিত্তিতে "জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা সিস্টেম" প্রতিষ্ঠা; সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তাবেষ্টনীর বহুমাত্রিক প্রসার; শিক্ষাখাতে নারীর বিজ্ঞান শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শিক্ষাখাতের প্রসার; জ্ঞান-বিজ্ঞানে গবেষণা, উদ্ভাবন, বিচ্ছুরণ ও উন্নয়ন; গণমানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়নে সার্বজনীন পেনশন, বিধিবদ্ধ রেশনিং, গণপরিবহন ব্যবস্থা, ভূমি সংস্কার, নারীর ক্ষমতায়ন (দেখুন, সারণি ৪)।

(৫) দারিদ্র্য-বৈষম্য উচ্ছেদে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্ধার-পুনরুদ্ধার (recovery) কর্মসূচিকে দেখতে হবে রোগের লক্ষণের চিকিৎসা হিসেবে (treatment of symptoms), যা আশু ও স্বল্পমেয়াদি; আর সংস্কারজাতীয় কর্মসূচিকে (reform) দেখতে হবে রোগমুক্তির স্থায়ী চিকিৎসা হিসেবে, যা দীর্ঘমেয়াদি এবং যথেষ্ট শ্রেণিস্বার্থসংশ্লিষ্ট কাঠামোগত বিষয়। রাষ্ট্রের সব উন্নয়নসংশ্লিষ্ট দলিলে এসব বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ পথনির্দেশনা থাকতে হবে। বৈষম্য নিরসন-উদ্দিষ্ট জনগণতান্ত্রিক বাজেট প্রস্তাবনায় আমরা এসব বিবেচনা করেছি।

দারিদ্র্যের ধরনভিত্তিক তথ্যভাণ্ডার

বহুমাত্রিক দারিদ্র্য (multiple poverty) দূরীকরণে বিভিন্ন ধরনের দরিদ্র মানুষ নিয়ে জাতীয় তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা জরুরি। প্রস্তাবিত এই "দারিদ্র্যের তথ্যভাণ্ডার"-এ দারিদ্র্যের বিভিন্ন ধরনভিত্তিক দরিদ্র মানুষের নাম-ঠিকানাসহ অন্তর্ভুক্ত হতে হবে ক্ষুধার দারিদ্র্য, আয়ের দারিদ্র্য, আবাসনের দারিদ্র্য, বেকারত্ব-উদ্ভূত দারিদ্র্য, অসুস্থতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব-উদ্ভূত দারিদ্র্য, সুপেয় পানির অভাব-উদ্ভূত দারিদ্র্য, নারীপ্রধান খানার দারিদ্র্য, অনানুষ্ঠানিক খাতের মানুষের দারিদ্র্য, দারিদ্র্যের পকেট, ভৌগোলিক অবস্থানজনিত দারিদ্র্য, ধর্ম-বর্ণ-পেশা উদ্ভূত দারিদ্র্য, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের দারিদ্র্য প্রভৃতি। দারিদ্র্যের বিস্তারিত তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করার লক্ষ্যে আসন্ন বাজেট বরাদ্দসহ সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন দলিলে সময়-নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা জরুরি।

ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য দূরীকরণ

(১) এ দেশে ক্রমবর্ধমান বহুমুখী দারিদ্র্য নিরসনে অন্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ জরুরি ভিত্তিতে বাজেটসহ দারিদ্র্য বিমোচনসংক্রান্ত সব দলিলে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত: (ক) বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ কীভাবে এবং কোন সময়ের মধ্যে মানব বঞ্চনা, দুর্দশা ও দারিদ্র্য দূরীকরণসহ সকল ধরনের বৈষম্য হ্রাসে অবদান রাখবে—সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ দিকনির্দেশনা; (খ) দারিদ্র্য নিরসনসম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার কার্যকর পদক্ষেপ; (গ) স্বাভাবিক সময়ে দেশে প্রতিবছর ৩০ লাখ মানুষ শ্রমবাজারে প্রবেশ করেন, কিন্তু ২০ লাখ মানুষেরই কর্মসংস্থান হয় না।

(২) কভিড-১৯-এর অভিঘাত ও অর্থনৈতিক মন্দার কারণে যেহেতু বেকারত্ব দ্রুত হারে বাড়ছে, সেহেতু বেকারদের আত্মকর্মসংস্থানসহ ব্যাপক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার পথ-পদ্ধতি অনুসন্ধান করে সরকারকে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৩) দারিদ্র্য-বৈষম্য দূরীকরণে যেসব বিষয়ে আরো গুরুত্ব দিতে হবে তা হলো: (ক) ক্রমবর্ধমান যুব বেকারদের বছরে কমপক্ষে ২০০ দিনের কর্মসংস্থান; (খ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সম্পদ সৃষ্টি, সম্পদ রক্ষা ও শ্রমভিত্তিক সম্পদ বৃদ্ধি; (গ) ভূমিহীন কৃষক, কর্মচ্যুত শ্রমিক, বাস্তুচ্যুত মানুষ, গ্রাম-শহরের নারীপ্রধান খানা (যার অধিকাংশই দরিদ্র), বয়োবৃদ্ধ জনগোষ্ঠী (এখন প্রায় ৮০ লাখ মানুষ), বস্তিবাসী, চরের মানুষ, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার আদিবাসী মানুষ (আনুমানিক ৫০ লাখ), নিম্নবর্ণ-দলিত সম্প্রদায়ের (৪০-৫০ লাখ) মানুষসহ সকল প্রান্তিক-ভঙ্গুর মানুষের স্থায়িত্বশীল বৈষম্য নিরসনমুখী জীবনসমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সময়ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

৪.৩ সামাজিক সুরক্ষা-নিরাপত্তাবেষ্টনি-মানবকল্যাণ

এ দেশে স্বাভাবিক অবস্থায় (অর্থাৎ কভিড-১৯ লকডাউনের আগে) সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তাবেষ্টনী সুবিধা পাওয়ার যোগ্য খানার (household) সংখ্যা ২ কোটি, যাদের ৫০ শতাংশ এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এ সংখ্যা এখন বেড়ে কমপক্ষে সাড়ে ৩ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। সেইসাথে নিঃস্বতর হয়েছেন অনানুষ্ঠানিক খাতের ব্যাপকাংশ মানুষ এবং বেকার হয়েছেন কয়েক কোটি মানুষ। অবস্থা একই রকম থাকলে সামাজিক সুরক্ষা প্রাপ্তিযোগ্য মানুষের এই সংখ্যা বাড়বে। এসব বিবেচনায়—

(১) সামাজিক বৈষম্য হ্রাস ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় 'সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ' খাতে (বিভিন্ন উপখাত ও ভাতা কার্যক্রম) বাজেট বরাদ্দ চলতি বছরের তুলনায় ৪.২২ গুণ বৃদ্ধি জরুরি (আমাদের প্রস্তাবিত জনগণতান্ত্রিক বিকল্প বাজেটে সেটাই করা হয়েছে) (দেখুন, সারণি ৪)। সরকারের চলতি বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ খাতে যেখানে মোট বরাদ্দ ৪০ হাজার ৩৪৭ কোটি টাকা, সেখানে আমাদের প্রস্তাবিত বাজেটে এই অংকটা ১ লক্ষ ৭০ হাজার ৪০৯ কোটি টাকা।

(২) সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তাবেষ্টনীর সুবিধাপ্রাপ্তির সহজগম্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। একই সাথে পথ-পদ্ধতি নিরূপণ করা প্রয়োজন যেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ-

রাজনৈতিক দলীয় পরিচিতিনির্বিশেষে সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তাবেষ্টনীর 'অন্তর্ভুক্তি ভ্রান্তি' (inclusion error) এবং 'অন্তর্ভুক্ত-না হওয়ার ভ্রান্তি' (exclusion error) দূর করা যায়। এসব 'ভ্রান্তি' দূর করার অন্যতম পন্থা হলো সামাজিক সুরক্ষা জালটাই চাহিদানুযায়ী সম্প্রসারিত করে ফেলা এবং সমগ্র প্রক্রিয়ায় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

(৩) আমাদের প্রস্তাবিত জনগণতান্ত্রিক বাজেটে "সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ" হলো সবোর্চ্চ বরাদ্দ প্রাপ্তিযোগ্য খাত। এই খাতে সরকার যেসব ব্যয়-বরাদ্দ করে থাকে তা অধিকতর যৌক্তিকীকরণে আমরা কয়েকটি বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তর হিসেবে নতুন খাত অর্ন্তভুক্ত করেছি। সেগুলো নিম্নরূপ: (১) প্রবীণ হিতৈষী বিভাগ, (২) দরিদ্র-প্রান্তিক-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়ন বিভাগ, (৩) নারীর ক্ষমতায়ন বিভাগ (গ্রাম ও শহরের দরিদ্র-প্রান্তিক-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত ও নারীপ্রধান খানা), (৪) আদিবাসী মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়ন বিভাগ, (৫) শিশুবিকাশ বিভাগ, (৬) বিধিবদ্ধ রেশনিং বিভাগ, (৭) সার্বজনীন পেনশন বিভাগ (দেখুন, সারণি ৪)।

(৪) আজকের 'প্রবীণ' মানুষই একদিকে যেমন ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের যোদ্ধা, অন্যদিকে তাঁরাই অর্থনীতির উন্নয়নে অবদান রেখেছেন। আমাদের সব অর্জনে অবদান রেখেছেন আজকের প্রবীণ মানুষ। সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তাবেষ্টনীর আওতায় 'প্রবীণ নীড়' গড়ে তোলা সময়ের দাবি। দেশে একদিকে যেমন মানুষের গড় আয়ুষ্কাল বাড়ছে, তেমনি পুঁজিবাদের ঠেলা-ধাক্কায় বর্ধিষ্ণু পরিবার (extended family) ভেঙে অণুপরিবার (nuclear family) বাড়ছে। বাড়ছে অসহায়-দুঃস্থ-নিঃসঙ্গ প্রবীণ মানুষের সংখ্যা। সেইসাথে ক্রমাগতভাবে অনেক বেশি অসহনীয় হচ্ছে প্রবীণ মানুষের জীবন। এতে করে অনেক প্রবীণ মানুষ, বিশেষত দরিদ্র প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের প্রবীণদের আশ্রয়হীন-ভঙ্গুর হওয়ার সম্ভাবনা অতীতের তুলনায় গুণিতক হারে বাড়ছে। সামনে আরো বাড়বে। আর এসব যৌক্তিক কারণেই প্রবীণ মানুষদের জন্য 'প্রবীণ নীড়' ('বৃদ্ধাশ্রম' নয়) গড়ে তোলা জরুরি। বিষয়টি বাজেটে অগ্রাধিকারযোগ্য।

(৫) স্বাভাবিক সময়েই পেনশনভোগীদের পেনশন প্রাপ্তির আয় থেকে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের সব আয় থেকে সবধরনের আয়কর, কর, শুল্ক সম্পূর্ণ রহিত করা অত্যন্ত জরুরি। আর কভিড-১৯ মহামারি ও অর্থনৈতিক মন্দার অভিঘাতসহ অন্য বহু কারণেই তা আরো বেশি যৌক্তিক। বেশ কয়েক বছর ধরে আমরা সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালুর প্রস্তাব করে আসছি। সরকারকে অশেষ ধন্যবাদ যে, সরকার প্রস্তাবটি বিবেচনা করেছেন। এ লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'সাবর্জনীন পেনশন বিভাগ' প্রতিষ্ঠা এবং ওই বিভাগে আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৫০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করছি (আমাদের মূল প্রস্তাব হলো "সার্বজনীন পেনশন বিভাগের জন্য আগামী ৫ বছরের জন্য মোট ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা—এখনকার বাজারমূল্যে) (সারণি ৪)।

(৬) কভিড-১৯ ও অর্থনৈতিক মন্দাবস্থাসহ বিভিন্ন কারণে দেশের আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামোতে ব্যাপক অধোগতির ফলে ১ শতাংশ ধনী ব্যতীত সবাই নিঃস্বতর হয়ে

শ্রেণিমইয়ে দ্রুত নিচের দিকে নামছেন। মানুষের জীবনকে সম্মান ও শ্রদ্ধাশীল করা সংবিধান মোতাবেক রাষ্ট্রের দায়িত্ব-কর্তব্য। এ নিরিখে ভবিষ্যতের জীবনকুশলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন জরুরি। সরকার এ নিয়ে কার্যকর কী কী পদক্ষেপের কথা ভাবছে, তার সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা-বিবরণী আসন্ন বাজেটে থাকাটা হবে সময়োপযোগী।

(৭) ২০২০ সালে জাতির জনকের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সরকার 'সকল গৃহহীনের জন্য বাড়ি' দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। আমাদের দেশে ১৭ কোটি মানুষের মধ্যে ১৪ কোটি মানুষেরই নিজ মালিকানায় আবাসন নেই (দেখুন, বারকাত, বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র, পৃ. xxxii)। এসব মানুষের আবাসন সমস্যা সমাধানে আমরা আগামী ৫ বছরের জন্য গৃহায়ণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ১ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করেছি অর্থাৎ বছরে ২৩ হাজার কোটি টাকা (সারণি ৪)। গৃহহীন দরিদ্র-প্রান্তিক-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষদের জন্য দ্রুততর সময়ে গৃহনির্মাণ করে দেওয়া ন্যায়সংগত—সাংবিধানিক ও ন্যায়বিধানিক যুক্তিতে। সময়-নির্দিষ্ট বরাদ্দসহ বাজেটে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ

(১) অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের উন্নয়নে বর্ধিত উদ্যোগ, ক্ষুদ্র-জাতিগোষ্ঠী, পাহাড় ও সমতলের আদিবাসী, দলিত সম্প্রদায়, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ, পরিচ্ছন্নকর্মী, মেথর-মুচি জেলে-বেদেসহ বিভিন্ন স্বল্প আয়ের পেশার এবং পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে তাদের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জীবনধারার স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ এবং মানবিক উন্নয়নে অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবারের বাজেটে অতিরিক্ত ও সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ থাকা জরুরি। এ লক্ষ্যে আমাদের কয়েকটি প্রস্তাবের একটি হলো সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণখাতের আওতায় (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধীনে "আদিবাসী মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়ন বিভাগ") গঠন করা। এ লক্ষ্যে আমরা আগামী ৫ বছরে ৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ (অর্থাৎ বছরে ৬০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ বাজেট বরাদ্দ) প্রস্তাব করছি (সারণি ৫)।

(২) দেশের অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের জন্য চলমান বাজেটে 'নিজ নামে' প্রচলিত বাজেটে বরাদ্দ দেওয়া হোক। "অনগ্রসর অঞ্চল"-এ নামে বাজেটে কোনো বরাদ্দ থাকে না। অথচ বিভিন্ন মানদণ্ডে দেশে অনেক অনগ্রসর অঞ্চল রয়েছে; এমনকি বৈষম্যের নিরিখে অনগ্রসর বিভাগও আছে। আমরা মনে করি, অনগ্রসর অঞ্চলের জন্য 'নিজ নামে' ব্যয় বরাদ্দের রীতি চালু করা প্রয়োজন।

(৩) দলিত সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য বাজেটে ভিন্ন কোনো বরাদ্দ থাকে না। বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে এসব বরাদ্দ এমনভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে, যা থেকে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ হিসাব করা সম্ভব হয় না। এসবই হলো বাজেটে দরিদ্র মানুষ নিয়ে অস্বচ্ছতা। আমরা আসন্ন বাজেটে

দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের জন্যে মাথাপিছু জাতীয় গড় বাজেটের তুলনায় কমপক্ষে তিনগুণ বেশি বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৪ মূল্যস্ফীতি ও মূল্যসংকোচনসংশ্লিষ্ট

(১) ডাবল ডিজিট মূল্যস্ফীতি মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করছে। আর মূল্যস্ফীতির সাথে সঙ্গতি রেখে মানুষের প্রকৃত আয় বাড়ছে না। এ এক মারাত্মক প্রবণতা। বার্ষিক প্রাক্কলিত মূল্যস্ফীতি ৫%-৭% এর মধ্যে রাখতে হবে। তবে শর্ত হলো কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করতে হবে এবং মানুষের প্রকৃত আয় বাড়াতে হবে। মূল্যস্ফীতি এমন কোনো পর্যায়ে নেওয়া যাবে না, যা অর্থনীতিকে মূল্যস্ফীতির মহা-ঘূর্ণনচক্রে (inflationary spiral) ফেলবে। তা হলে বিপদ হবে অনিবার্য।

(২) কোনো অবস্থাতেই ব্যাপক মূল্যহ্রাস (মূল্যসংকোচন) করে মূল্যহ্রাসের ঘূর্ণিচক্রে (deflationary spiral) পড়া যাবে না। এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হলে তা মহাবিপৎসংকেত হিসেবে গণ্য করতে হবে।

(৩) অভুক্ত-অর্ধভুক্ত-অপুষ্ট মানুষদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করে 'মানুষ বাঁচাও কর্মসূচি' চালিয়ে যেতে হবে কমপক্ষে ততদিন, যতদিন মানুষের কাজ থাকবে না অথবা "দিন আনে দিন খায়" মানুষের কাজ থাকবে না। এ লক্ষ্যে অন্য অনেক কিছুর মধ্যে দরিদ্র-প্রান্তিক-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষদের জন্য "সংবিধিবদ্ধ রেশন ব্যবস্থা" চালু করা জরুরি। এ লক্ষ্যে আমাদের প্রস্তাব হলো—সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে "বিধিবদ্ধ রেশনিং বিভাগ" প্রতিষ্ঠা এবং আগামী ৫ বছরে দরিদ্র-প্রান্তস্থ-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে রেশন বাবদ মোট ৩ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ (অর্থাৎ বছরে ৬০ হাজার কোটি টাকা, সারণি ৫)।

(৪) 'খাদ্য মূল্যস্ফীতি' কোনো অবস্থাতেই বাড়ানো যাবে না। আবার কোনো অবস্থাতেই ন্যায্য মজুরিযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি না করে তা খুব কমানোও যাবে না।

(৫) স্বাস্থ্য-শিক্ষা-সেবা খাতে মূল্যস্ফীতির লাগাম টেনে ধরতে হবে। অন্যথা মানুষের দুর্দশা বাড়তেই থাকবে।

(৬) ব্যবসায়ী-পুঁজিপতিদের উদ্দেশ্যে সরকারি প্রণোদনা প্যাকেজ এমন হতে পারবে না, যেখানে পুঁজিপতি ব্যবসায়ীরা পাবেন "সমাজতান্ত্রিক সুবিধা" আর কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষ পাবেন 'পুঁজিবাদের সুবিধা'। এসব শুধু 'মূল্যস্ফীতি-মূল্যহ্রাস' নীতির ভারসাম্যের কারণেই নয়, তা বিপজ্জনক বৈষম্য ও মেরুকরণ থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্যেও জরুরি প্রয়োজন।

(৭) কৃষিখাতে ভর্তুকি ও প্রণোদনা যাতে প্রকৃত কৃষকের কাছে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

(৮) কৃষকের কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৪.৫ বিনিয়োগ-সঞ্চয়: সরকারি ও বেসরকারি

(১) বৈশ্বিক অর্থনীতিতে আর্থিকীকরণকৃত পুঁজিবাদের খপ্পরে পড়লে সঞ্চয়-বিনিয়োগ-উন্নয়নসহ ভয়াবহ বিপজ্জনক রাজনৈতিক পরিণাম হবে—রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন দলিলের প্রতিফলন হিসেবে বাজেটে এ ব্যাখ্যার প্রতিফলন থাকতে হবে। অন্যথায় আমরা ধরে নেব যে রাষ্ট্র-সরকার হয় বড় পর্দায় মানুষের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড দেখতে অপারগ-অযোগ্য, অথবা ধরে নেব যে তারা এসবের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না, অথবা ধরে নেব যে তাদের অন্য কোনো 'এজেন্ডা' আছে। 'এজেন্ডা'টা রাষ্ট্রীয় বাজেটে স্পষ্ট উল্লেখ থাকা কাম্য।

(২) রাষ্ট্র-সরকার যদি মনে করে যে উন্নয়নদর্শন হিসেবে মুক্তবাজার অর্থনীতি সর্বশ্রেষ্ঠ বিকল্প—সেক্ষেত্রে মুক্তবাজার অর্থনীতি বলতে সরকার কী বোঝেন, মুক্তবাজারে এ দেশে মানুষের কী কী কল্যাণ এবং তা কীভাবে হয়েছে এবং হবে—এসব সম্পর্কে বাজেটসহ সব উন্নয়ন দলিলে বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থাকতে হবে। বলা যাবে না যে বাজেট বিশ্লেষণমূলক দলিল নয়, সে কারণে বলা গেল না। প্রয়োজনে এ বিষয়ে সরকারের আসন্ন বাজেট দলিলে সংযুক্তি হিসেবে ব্যাখ্যামূলক ৫-১০ পৃষ্ঠা সংযোজন করার প্রস্তাব করছি। আর যদি তা না-করা হয়, সেক্ষেত্রে আমরা ধরেই নেব যে সংবিধানের বিধি "জনগণই হইবেন প্রজাতন্ত্রের মালিক"—এটাকে বাজেট প্রণেতারা যথাযোগ্য সম্মান করেন না; তাও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষোত্তর এবং মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর পূর্তির পরের বাজেটে।

(৩) উন্নয়ন ইতিহাসে প্রমাণিত যে, আজকের ধনী দেশগুলোর ধনী হওয়ার পেছনে প্রধান ভূমিকা রেখেছে দেশাত্মবোধ-উদ্ভূত চেতনার সংরক্ষণবাদী নীতি-কৌশল (protectionist policies and strategies, যাকে অনেকেই বলেন nationalist policies)। আজকের ধনী দেশগুলোর কোনোটারই ধনী হওয়ার পেছনে নব্য-উদারবাদীদের মুক্তবাণিজ্য বা মুক্তবাজার মতবাদ কাজে লাগেনি; উল্টো কাজে লেগেছে বাণিজ্য ও বাজার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশজ শিল্প সুরক্ষা এবং তা বিকশিত করার পথ-পদ্ধতি, যেখানে সরকারি ব্যয়-বরাদ্দ ও রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ (public expenditure and state intervention) নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে। এসব ঐতিহাসিক নির্মোহ সত্য। এ নিরিখে মালিকানার নীতি হিসেবে আমাদের সংবিধানের বিধান অনুযায়ী উৎপাদনযন্ত্র-উৎপাদনব্যবস্থা-বণ্টনপ্রণালীসমূহের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারি খাতের প্রাধান্য (সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১৩) বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক আমাদের সুস্পষ্ট সুপারিশ হলো—রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটানোর দায়িত্বটা রাষ্ট্রকেই নিতে হবে। আর সেক্ষেত্রে আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট এবং শিল্পায়ন নীতিতে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অন্তর্ভুক্ত পাট শিল্প, বয়ন শিল্প, গ্যাস, তেল, কয়লা, বিদ্যুৎসহ অন্যান্য শিল্প-বাণিজ্য খাতের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ আরো কীভাবে শক্তিশালী করা যায় অথবা কীভাবে তা শ্রমিকদের মালিকানাধীন সরকারি ব্যবস্থায় (যা সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদে আছে) পরিচালনা করা যায়, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যয়-বরাদ্দসহ সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা থাকতে হবে। আমাদের প্রস্তাবিত বাজেটে ব্যয় ও আয় উভয় ক্ষেত্রেই এসবের সুস্পষ্ট প্রতিফলন আছে (মূল দিকনির্দেশনার জন্য দেখুন, সারণি ৪ ও ৭)।

(৪) ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, সরকারি ব্যয়-বরাদ্দ (এবং রাষ্ট্রায়ত্ত খাত, public sector) বেসরকারি বরাদ্দের চেয়ে খারাপও নয় এবং তা ব্যক্তি খাতের (private sector) বরাদ্দের জন্যে বাধাও নয়—এ বিবেচনায়, বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ বাড়ানোর বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নিতে হবে। কভিড-১৯-এর লকডাউন এবং অর্থনৈতিক মন্দার ফলে শিল্প-ব্যবসায়-পরিবহন খাতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এসব খাতের ক্ষতিমাত্রা অনেক ক্ষেত্রেই অপূরণীয়। এসব খাত-ক্ষেত্র উদ্ধার-পুনরুদ্ধারে অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধিসহ, 'ব্যবসা-ব্যয়' কমিয়ে আনা (cost of doing business) এবং 'ব্যবসাপ্রক্রিয়া সহজীকরণ' (ease of doing business) জরুরি। আমাদের শিল্পায়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য নীতিসহ বাজেটে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বাস্তবায়ন কৌশলসমূহ নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে শিল্প স্থাপনের জন্য ভূমি প্রাপ্তি, আইনশৃঙ্খলা উন্নয়ন, দুর্নীতি হ্রাসে 'ঝুঁকি হ্রাস কৌশল' ও 'ক্ষতি হ্রাস কৌশল', বিদ্যুৎ-জ্বালানির সহজলভ্যতাসহ বিভিন্ন অবকাঠামো সুবিধা সৃষ্টি, ব্যাংক-বীমা-কাস্টমসসহ দলিল-দস্তাবেজ প্রক্রিয়াকরণ সহজ করা, ব্যবসা ত্বরান্বিতকরণসংশ্লিষ্ট রেগুলেটরি নীতিসহায়ক পদক্ষেপ প্রাধিকার ভিত্তিতে নিতে হবে। 'ব্যবসাপ্রক্রিয়া সহজীকরণ'-এর ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় বিবেচনা জরুরি: (ক) 'ব্যবসার প্রক্রিয়াগত' দিক (process অর্থে)—অপ্রয়োজনীয় ধাপসমূহ কমিয়ে আনতে হবে, (খ) 'সময়গত দিক' (time factor অর্থে)—অযথা সময়ক্ষেপণ কমিয়ে আনতে হবে, (গ) 'ব্যয়গত দিক' (cost)—যুক্তিহীন ব্যয় কমিয়ে আনতে হবে। এসব বিষয়ে সকল সংশ্লিষ্ট নীতি-দলিলে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা থাকা জরুরি। সংবিধানের বিধান অনুযায়ী (অনুচ্ছেদ ১৩) রাষ্ট্রীয় খাত, সমবায়ী খাত ও ব্যক্তি খাতের মধ্যে ভারসাম্য বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।

(৫) কভিড-১৯-এর লকডাউন এবং অর্থনৈতিক মন্দায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অনানুষ্ঠানিক খাত (informal sector)। অনানুষ্ঠানিক খাতের অণুব্যবসা-বাণিজ্যসহ শ্রমজীবী মানুষের জন্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ থাকতে হবে। এসবের মধ্যে থাকবে এককালীন অনুদান (যেমন ভ্রাম্যমাণ অণু ব্যবসায়ী হকার, ভ্যানে পণ্য ব্যবসায়ী), বিনাসুদে অথবা অতি অল্প সুদে চলতি মূলধন ঋণ ইত্যাদি। এই খাতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে আমরা এ বছরের বাজেটে "শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস" খাতের অধীনে **"অণু ও ক্ষুদ্র ব্যবসা-উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিভাগ"** গঠনের প্রস্তাব করছি। আর এ জন্য আগামী ৫ বছরের জন্য মোট ১ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকা অর্থাৎ বছরে ২৮ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করছি (দেখুন, সারণি ৪)।

(৬) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশেষ করে জিডিপিতে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ ভূমিকা রাখে। কভিড-১৯-এর লকডাউন এবং অর্থনৈতিক মন্দায় এসব খাতে যারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের জন্য ন্যূনতম প্রস্তাব হলো:

(ক) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কাছে ব্যাংক ঋণ সহজলভ্য করার লক্ষ্যে সকল ব্যাংককে তাদের ঋণের অন্তত ২৫ শতাংশ ১ কোটি টাকার কম পুঁজিসম্পন্ন ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে প্রদানের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করতে হবে এবং প্রতিটি ব্যাংকে

"ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সেল" গঠন করতে হবে। এই ঋণ হতে হবে চাহিদাতাড়িত, সরবরাহচালিত নয়।

(খ) স্থানান্তরযোগ্য সম্পদের ভিত্তিতে গ্রুপ ব্যাংকিং সিস্টেমে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

(গ) যুবকদের উদ্যোক্তা এবং উদ্ভাবক হতে উৎসাহিত করতে স্টার্ট-আপ পুঁজি সরবরাহ করে প্রকল্প সম্প্রসারিত করতে হবে।

(৭) ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সঞ্চয় কমছে—জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি (দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি) এবং প্রকৃত আয় (মজুরি) বৃদ্ধি না পাবার কারণে। এ অবস্থায় মানুষ সঞ্চয় ভাঙাতে বাধ্য হচ্ছেন, বাধ্য হচ্ছেন ধার-দেনা করতে। এ অবস্থা কাম্য নয়।

৪.৬ রেমিটেন্স প্রবাহ: বৃদ্ধি ও উৎপাদনশীল ব্যবহার

(১) ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল ২১.৬১ বিলিয়ন ডলার (রেমিটেন্স প্রবাহের প্রবণতা এমন থাকলে বার্ষিক অংকটা চলতি বাজারমূল্যে জিডিপির ৫%-এর মতো হবে)। এই অর্থের ফলপ্রদ উৎপাদনশীল বিনিয়োগ পদ্ধতি বের করা জরুরি। উপজেলা কুটিরশিল্প নগরীতে শিল্প-বাণিজ্যের প্রক্রিয়া চালু করে এই অর্থ বিনিয়োগ করা সম্ভব। এ অর্থ বিশেষ বন্ড ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদনশীল বিনিয়োগেও প্রবাহিত হতে পারে। এসব দিকনির্দেশনা বাজেটে থাকা অত্যন্ত জরুরি।

(২) রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়াতে বিদেশে দক্ষ শ্রমশক্তি প্রেরণের উদ্যোগ নিতে হবে।

(৩) বিদেশ থেকে অর্থ প্রেরণে প্রতিষ্ঠানিক ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যবহারে উৎসাহ-অনুপ্রেরণা-প্রণোদনা দিতে হবে।

(৪) বাজারে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারে ব্যাপক তারতম্য রেখে রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়নো যাবে না। এ ব্যবধান যথাসম্ভব কমিয়ে আনতে হবে।

৪.৭ পুঁজিবাজার

(১) আমাদের পুঁজিবাজারের আকার তুলনামূলক ছোট, জিডিপির ১২-১৪ শতাংশ। আর বন্ড মার্কেট নেই বললেই চলে। আমাদের পুঁজিবাজারে বড় ধরনের ধস নামে প্রতি ১০ বছর পরপর; সাধারণ বিনিয়োগকারীদের তেমন আস্থা নেই; আর যেসব সাধারণ বিনিয়োগকারী গত ৩০-৪০ বছর পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করে আসছেন, তাদের অভিজ্ঞতা খুবই হতাশাজনক; তবে বড় জাল-জালিয়াতিকারীদের তাতে বেশি সুবিধা। পুঁজিবাজারের প্রতি সাধারণ বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনা দুঃসাধ্য ব্যাপার। পুঁজিবাজারে সরবরাহ ঘাটতি ও চাহিদা স্বল্পতা উভয়ই আছে। তবে 'ভালো' শেয়ার যেমন নেই, তেমনি 'খারাপ' শেয়ারে তুলনামূলকভাবে বাজার সয়লাব। পুঁজিবাজার ও অর্থবাজারের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের অভাব আছে। কভিড-১৯ ও অর্থনৈতিক

মন্দার অভিঘাত কিছুটা লাঘবে এবং মধ্যবিত্তদের জন্য একটু নিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য সরকার সরকারি বন্ড মার্কেট সৃষ্টির কথা ভেবে দেখতে পারে। তবে পুঁজিবাজার ও বন্ড মার্কেটের স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করতে হবে (যা আদৌ সহজসাধ্য নয়)। প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য সরকারি বন্ড প্রচলনের কথা ভাবা যেতে পারে। এসব কার্যক্রম গ্রহণ করলে একদিকে স্টক বাজারের ওপর নির্ভরশীলতা কমবে, অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা তাদের পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যকরণে সক্ষম হবেন। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য অধিকতর কার্যকর মিউচুয়াল ফান্ডের কথা ভাবা যেতে পারে। তবে মিউচুয়াল ফান্ডের বাস্তব অভিজ্ঞতা যথেষ্ট অপ্রিয়। বিষয়সমূহ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় নতুন করে ভাবা দরকার।

(২) পুঁজিবাজারের সম্প্রসারণ ও গভীরতা বৃদ্ধির বিষয়সহ নিয়ন্ত্রক সংস্থার জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা দৃশ্যমান করতে হবে।

৪.৮ ব্যাংক

(১) বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থা মূলত ব্যাংকনির্ভর। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সিকিউরিটিজ মার্কেটের সীমিত ভূমিকাও বর্তমান অবস্থায় তেমন কোনো অবদান রাখতে সক্ষম নয়। অর্থনীতিতে ব্যক্তি খাতের যৌক্তিক অর্থায়ন যাতে অব্যাহত থাকে, সে জন্য বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংককে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। নিকট অতীতে সংঘটিত ব্যাংকিং অঘটনসমূহ আগ্রহী ব্যাংক কর্মকর্তাদের (ব্যাংক মালিকদের কথা ভিন্ন) ঋণ প্রদানে অনুৎসাহী করছে; আবার অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদি লকডাউন ও ব্যবসার অনুকূল পরিবেশের অভাবে ভালো ঋণগ্রহীতাদের মধ্যেও উৎসাহ কম। আবার ব্যাংক ঋণ যেভাবে কয়েকজন ব্যক্তির হাতে পুঞ্জীভূত ও ঘনীভূত হয়েছে, তা মারাত্মক বিপজ্জনক। এই বিপৎমাত্রা সম্পর্কে আমরা এর আগেও বহুবার সুপারিশ করেছি, আশা করি সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক সেসব তলিয়ে দেখবে। **বেইল-আউট কর্মকাণ্ডে বৃহৎ ঋণগ্রহীতাদের নির্বিচার নগদ অর্থ প্রদান কোনোভাবেই সমীচীন হবে না**। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারকে সম্মিলিত উদ্যোগে নীতি-কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে। ব্যাংকিং শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রা নীতি ও ঋণ নীতি হতে হবে বিনিয়োগবান্ধব এবং বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নতিকল্পে বাংলাদেশ সরকারকে উপযুক্ত রাজস্ব নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। **তবে লক্ষ্য রাখতে হবে—এসবের ফলে যেন আমাদের দেশে আর্থিকীকরণকৃত রেন্টসিকিং পুঁজি প্রণোদিত না হয়**।

(২) ব্যাংক খাতের অন্যতম সমস্যা হলো ক্রমপুঞ্জিভূত খেলাপি ঋণ। প্রকৃত খেলাপি ঋণের পরিমাণ এখন কমপক্ষে ৩ লক্ষ কোটি টাকা। খেলাপি ঋণ ফেরত না দেবার সংস্কৃতিটা প্রবল রূপ ধারণ করেছে। খেলাপি ঋণের অর্থ পাচার হয়েছে। এ অবস্থার পরিবর্তন জরুরি। অন্যথায় ব্যাংক খাত ধসে যেতে পারে।

(৩) ব্যাংক খাতে ছোটখাটো পরিবর্তন করে তেমন কোনো লাভ হবে না। স্বল্পমেয়াদি এবং এডহক ভিত্তির কোনো কিছুই ব্যাংক খাতকে সম্মানজনক-নিরপেক্ষ অবস্থানে ফেরাতে পারবে না। ব্যাংক খাতসংশ্লিষ্ট কয়েকটি বড় মাপের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং একই সাথে বেশকিছু সংস্কারমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন:

(ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি স্বাধীন সত্তা, না-কি তা সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন সত্তা—বিষয়টি পরিষ্কার করতে হবে। জনমনে সাধারণ ধারণা যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মহোদয় অর্থমন্ত্রীর অধীনে চাকরি করেন অথবা গভর্নর-ডেপুটি গভর্নররা নিযুক্তি পান বড় বড় জোম্‌বি কর্পোরেশনের তদবির-লবিংয়ের জোরে—এসব বিষয় স্পষ্টীকরণ জরুরি।

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করে। এসব প্রতিবেদনের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। আবার প্রয়োজনীয় অনেক কিছুই এখানে থাকে না। বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রতি ছয় মাস অন্তর প্রকাশ করা উচিত যে দেশে কোটিপতির সংখ্যা কত, কত তাদের ব্যাংক ঋণ, কোন ঋণ তারা পরিশোধ করেননি, কোন ঋণ অগ্রিম কতবার পুনঃতফসিল করেছেন, তাদের পরিচয়টা কী, তারা এবং তাদের নিকটাত্মীয়রা (family-এর সংজ্ঞা আইন মন্ত্রণালয় ঠিক করে দিক) কে কোন ব্যাংকের পরিচালক, কত বছর ধরে পরিচালক;

(গ) বাংলাদেশ ব্যাংককে বলতে হবে—ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক সংখ্যা নিয়ে এত গোঁজামিল দিতে হয় কেন? সমস্যার সমাধান কী;

(ঘ) বিভিন্ন ব্যাংকে ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালক কে কী বিচার করে নিয়োগ দেন; কেন নির্দিষ্ট গোছের ব্যক্তিরাই ঘুরেফিরে পরিচালক হয়ে যান—আসলে স্বার্থটা কার;

(ঙ) একই ব্যক্তি অথবা একই ব্যবসার মালিকেরা কি একই সাথে ব্যাংক ও বীমা কোম্পানির মালিক এবং/ অথবা পরিচালক হতে পারেন? যদি পারেন, তাহলে 'স্বার্থের সংঘাত' (conflict of interest) সমস্যা কীভাবে দূর করা হয়?

৪.৯ বৈদেশিক খাত: আমদানি ও রপ্তানি, রিজার্ভ

বিশ্ব বাণিজ্য-আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশ্লেষিত সুপারিশসমূহ বড় পর্দায় উত্থাপন করছি। আমাদের সুপারিশ নিম্নরূপ:

(১) আমাদের রাজনৈতিক নীতিনির্ধারকদের স্বীকার করতে হবে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের রপ্তানি-আমদানিসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাত ও ক্ষেত্রে আমরা প্রতিনিয়তই অন্যায্যতার শিকার হচ্ছি। আমাদের ঠকানো হচ্ছে—বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন কায়দায়; "আমরা আসলে ভিক্ষুক জাতি নই"—রাষ্ট্রীয়-সরকারি দলিলপত্রে এসব স্বীকৃতির কথা উল্লেখ করতে হবে।

(২) উন্নয়নসংশ্লিষ্ট দলিলে উল্লেখ করতে হবে যে তথাকথিত 'ভ্যালু চেইন' ব্যাখ্যা আপাতদৃষ্টিতে যৌক্তিক মনে হলেও আসলে এর উদ্দেশ্য ভিন্ন; উদ্দেশ্য হলো—আমাদের যে বিভিন্নভাবে শোষণের জাঁতাকলে ফেলা হয়েছে, তা জায়েজ করা। প্রয়োজনে উদাহরণ দিয়ে এসব বলতে হবে।

(৩) রপ্তানি-আমদানির মূল্য নির্ধারণ ও সংশ্লিষ্ট যেসব জাল-জালিয়াতি আর হিসাবের মারপ্যাঁচ—এগুলো আমাদের রাজনীতিবিদসহ (ক্ষমতাসীন-বিরোধী দলনির্বিশেষে) আমলা ও কূটনীতিকদের খুব ভালোভাবে জানানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। জ্ঞানভিত্তিক আলাপ-আলোচনা ও দর কষাকষির (negotiation) জন্য এসব খুবই জরুরি। এসব বিষয়ে নিয়ে ফলপ্রদ আলোচনা করতে হবে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে, যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO), আনক্টাড (UNCTAD), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), জাতিসংঘের সদরদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটি, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি প্রভৃতি। এ লক্ষ্যে আমরা 'পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়'-এর অধীনে "অর্থনৈতিক কূটনীতি বিভাগ" গঠনের প্রস্তাবসহ এ বাবদ ২৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করছি (সারণি ৪)।

(৪) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অন্যায্যতার শিকার যত দেশ—সবাইকে সাথে নিয়ে যৌথমঞ্চ (common platform) সামিট-এর উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। বাংলাদেশ এ উদ্যোগ নিতে পারে।

(৫) কভিড-১৯-উদ্ভূত সংকট, সাপ্লাই চেইনের সমস্যা, ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের অনিশ্চয়তা এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা-উদ্ভূত—এসব বিবেচনায় রেখে রপ্তানি বাণিজ্য বহুমুখীকরণ এবং সেইসাথে উচ্চমূল্যের রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে যুক্তিসিদ্ধ প্রণোদনা প্রদানের বিষয়সমূহ বাজেট বিবেচনায় থাকতে হবে। ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজ উৎসাহিতকরণ জরুরি।

(৬) রপ্তানি পণ্যের নতুন গন্তব্য-দেশ অনুসন্ধান উৎসাহিত করতে হবে।

(৭) গ্লোবাল ভ্যালু চেইনে অধিকতর কার্যকর ও ন্যায্য অংশীদারি নিশ্চিতকরণে বৈদেশিক বিনিয়োগবান্ধব কর্মকৌশল নির্ধারণ এবং তা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

(৮) আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে কারেন্সি সোয়াপ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে সক্রিয়ভাবে ভাবতে হবে।

(৯) আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমছে। কমা শুরু হয়েছে রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের ছয় মাস আগে থেকে। গত বছরের এপ্রিলে (২০২২) বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৪৮.২৬ বিলিয়ন ডলার, যা এ বছরে বিভিন্ন হিসাব মতে, ২০ থেকে ২৫ বিলিয়ন ডলার।

৪.১০ বৈদেশিক ঋণ

বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য-অনুদান-এর রাজনৈতিক অর্থনীতি সম্পর্কে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির অবস্থান খুবই স্বচ্ছ। এ মুহূর্তে আমাদের দেশের মানুষের মাথাপিছু দেনা প্রায় ৩৮ হাজার টাকা; জিডিপির তুলনায় বৈদেশিক ঋণ খুব বেশি নয়; বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে আমাদের অবস্থা "স্বস্তিদায়ক" (বা "সবুজ সংকেতবাহী"); আমরাই এখন বিদেশে ঋণ দিই—এসবই সরকারি কথাবার্তা এবং আপাতদৃষ্টে "স্বস্তিদায়ক"।

বৈদেশিক ঋণ পরিস্থিতি স্বস্তিদায়ক নয় এবং এ নিয়ে আত্মতুষ্ট হবার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, এখন আমাদের সরকারি ঋণের পরিমাণ মোট ১৬৭ বিলিয়ন ডলার, যার মধ্যে ৪৩% বৈদেশিক ঋণ আর ৫৭% দেশের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে নেওয়া। সরকারের ঋণ-জিডিপি অনুপাত ক্রমবর্ধমান—২০১৪ সালে ছিল ২৮.৭%, যা এখন ৪২.১%। আর ঋণের সুদ পরিশোধ খাতটা এখন বাজেটে অন্যতম বড় ব্যয় খাত। আবার ঋণ পরিশোধের মাধ্যম হিসেবে বাজেটের কর-রাজস্ব খাতে আশানুরূপ অগ্রগতি নেই—কর-জিডিপি অনুপাত (অনুদানসহ) এখন ৮.৮%, যা গত ১০ বছরে তুলনামূলক একই অবস্থায় রয়ে গেছে। সরকারের বিদ্যমান ঋণ পরিশোধে অপেক্ষাকৃত স্বস্তিদায়ক অবস্থায় পৌঁছাতে কর-জিডিপি অনুপাতটি হতে হবে কমপক্ষে ১৩%। এসবের পাশাপাশি এ কথাও মনে রাখতে হবে যে ক্রমর্ধমান বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে বৈদেশিক মুদ্রায় আয়ও বাড়াতে হবে। বাড়াতে হবে রপ্তানি আয়, কমাতে হবে রপ্তানি পণ্যে আমদানির অংশ (এখন ৪০%), বাড়াতে হবে রেমিটেন্স প্রবাহ। এসবের অন্যথা অর্থনীতিতে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করবে।

উল্লেখ্য, আমাদের বৈদেশিক ঋণের বোঝা বাড়ছে। বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল ৫১.১৩ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬০.১৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ আমাদের বৈদেশিক ঋণের সম্ভাব্য পরিমাণ দাঁড়াবে ১১৫ বিলিয়ন ডলার। ডলারের মূল্য বৃদ্ধির কারণে বৈদেশিক ঋণের পরিশোধে চাপ বাড়বে।

মেগাপ্রকল্পসহ বিভিন্ন প্রকল্পে বৈদেশিক ঋণ নিয়ে এখন পর্যন্ত আমাদের যে অবস্থা তা বিশ্লেষণে স্পষ্ট যে যখন থেকে আমরা একসঙ্গে চার-পাঁচটি বড় (মেগা) প্রকল্পের ঋণের সুদ পরিশোধ করা শুরু করব, ঠিক তখন থেকেই ঋণ পরিশোধ অবস্থা "লাল সংকেতবাহী" হবে। আনুমানিক সময়কালটা হতে পারে ২০২৭-২৮ সাল। বৈশ্বিক অর্থনীতির মহামন্দা, কভিড-১৯ উদ্ভূত মহাবিপর্যয়, ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির ক্ষমতাকেন্দ্রের ভৌগোলিক স্থানান্তর—এসব কারণে বৈদেশিক ঋণ-উদ্ভূত "লাল সংকেত" আমাদের সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলবে—এ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বৈদেশিক ঋণের রাজনৈতিক অর্থনীতি তাই-ই বলে।

৪.১১ কৃষি-ভূমি-জলা ও সংশ্লিষ্ট মেহনতি মানুষ

বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও আলোকিত মানুষের 'শোভন বাংলাদেশ' গড়তে চাইলে প্রস্তাবিত সব সুপারিশ-এর যথার্থতা স্বীকার করতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে। এ নিরিখে কৃষি-ভূমি-জলা ভাবনাসংশ্লিষ্ট আমাদের প্রস্তাব-সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

কৃষি ও কৃষক স্বার্থ—আপসে মীমাংসনীয় বিষয় নয় (non negotiable বিষয়)

(১) সরকারে যে-ই থাকুন না কেন স্বীকার করতে হবে যে শুধু বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ "শোভন সমাজব্যবস্থা—শোভন জীবনব্যবস্থা" বিনির্মাণের লক্ষ্যেই নয়, বিশ্বব্যাপী ডুবন্ত পুঁজিবাদ ব্যবস্থা থেকে প্রকৃতির বিধানানুযায়ী মানবকল্যাণকামী উন্নততর ব্যবস্থায় উত্তরণে শুধু সম্পদের (সব প্রাকৃতিক সম্পদসহ জমি-জলা-জঙ্গল) ন্যায্য পুনর্বণ্টনই নয়—সম্পদের মালিকানারও বণ্টন করতে হবে (এ কাজটি কোনো

সরকার পারবেন কি পারবেন না তা বিচার্য বিষয় নয়, বিচার্য বিষয় হলো—প্রাকৃতিক সম্পদ, যা মনুষ্যসৃষ্ট নয় তার মালিকানা ন্যায্যতা)।

(২) কৃষি ও কৃষক ভাবনার ভিত্তিমূল হতে হবে বাংলাদেশের সংবিধানের ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদে প্রতিশ্রুত নিম্নলিখিত বিষয়: *"নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন"*। সরকারে যে-ই থাকুক না কেন তাকে এ কাজটি করতেই হবে। কারণ, এসব প্রতিশ্রুতি সাধারণ নয় সাংবিধানিক এবং 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি'র অন্তর্ভুক্ত। আর এটা সেই রাষ্ট্রের যে রাষ্ট্রটি *'প্রজাতান্ত্রিক'* (সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১) এবং সংবিধান মোতাবেকই এই *"প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে"* (সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১১)। আর সংবিধান অনুযায়ীই এই প্রজাতন্ত্রে *"প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ"* [অনুচ্ছেদ ৭ (১)] এবং *"জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে"* [অনুচ্ছেদ ৭ (২)]। তাহলে সংগত প্রশ্ন, সংবিধানের কোন বিধানবলে জমি-জলা-জঙ্গলসহ সকল প্রাকৃতিক সম্পদের (মনুষ্যসৃষ্ট নয়) মালিকানা ব্যক্তিগত হয়? এই সবকিছুর মালিকানা হবে জনগণের—জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের। আর এ কথাও তো সংবিধানে স্পষ্ট প্রতিশ্রুত যে, *"উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টনপ্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্য মালিকানা ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে: (ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারি খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা; (খ) সমবায়ী মালিকানা ... , এবং (গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা"* (অনুচ্ছেদ ১৩)।

এসবই যদি সংবিধানে বিধৃত বা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন হয়, তাহলে কোন বিধানে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন পাটকল থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা এবং তা ব্যক্তিমালিকদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়? কোন আইনে সমবায়ী খাস জমি-জলা-জঙ্গলের মালিক বনে যান গুটিকয়েক ব্যক্তি? কোন আইনে খাস জমি-জলা-জঙ্গলের মালিকানা দরিদ্র মানুষের হাতছাড়া হয় অথবা তার কাছেই যেতে পারে না? কোন আইনে গ্যাস-তেল-কয়লাসহ প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা কার্যকর হয়? কোন আইনে শত-কোটিপতি উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া বহাল থাকে? কোন আইনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষনির্বিশেষে জনগণের ব্যাপকাংশ প্রজাতন্ত্রের মালিক না হয়ে 'প্রজা' হয়ে যান? কোন আইনে মানুষ দরিদ্র হন-নিঃস্ব হন-ভিক্ষুক হন-গৃহহীন হন-শিক্ষাহীন হন-বিনেচিকিৎসায় মারা যান? কোন আইনে একজন শিশু অভুক্ত থাকে? কোন আইনে একজন প্রবীণ মানুষ অসহায়-অসুস্থ হয়ে দ্বারে দ্বারে ঘোরেন? কোন আইনে অর্থপূজার সম্মান হয় সর্বোচ্চ? কোন আইনে

জনগণ হয়ে যান 'প্রজা', আর জনগণের সেবক—শাসক-প্রশাসকেরা বনে যান 'রাজা'? রাষ্ট্র হোক আর সরকার হোক—এ দুয়ের কোনো সত্তাই সংবিধানের ঊর্ধ্বে নয়। সুতরাং এসব প্রশ্নের উত্তর তাদেরই দিতে হবে, তাদের মালিকের কাছে—জনগণের কাছে (কারণ সংবিধান অনুযায়ী জনগণ এবং একমাত্র জনগণই সার্বভৌম এবং প্রজাতন্ত্রের মালিক)। আর এসব প্রশ্নের সদুত্তর দিতে ব্যর্থ হলে কী হবে তাও সংবিধানে স্পষ্ট বলা আছে *"অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।"* তাহলে- যে কেউই অনুমান করতে পারছেন—মুক্তিযুদ্ধ কোথায়, আর আমাদের শাসক-প্রশাসকেরা কোথায়? সংবিধান কোথায়, আর ন্যায়বিচার কোথায়? এসব কারণেই আমরা বহু বছর ধরে বহুবার বলেছি-লিখেছি সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বৈষম্যহীন ও আলোকিত মানুষের সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র গঠনের কোনোই বিকল্প নেই—নেই তা সাংবিধানিকভাবে, ন্যায়বিচারিক যুক্তিতে, নৈতিক বিচারে, এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক যুক্তিতে।

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার

(১) আসন্ন ২০২৪-২৫ জাতীয় বাজেটসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল দলিলে কৃষি ও কৃষক ভাবনার অনুষঙ্গ কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি নিয়ে সুনির্দিষ্ট ও সময়-নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি এবং প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথনির্দেশ থাকতে হবে: ভূমি সংস্কারসহ ভূমি মালিকানার পরিবর্তন, দরিদ্র মানুষের মধ্যে খাস জমি-জলা-জঙ্গলের বণ্টন-বন্দোবস্ত, অনুপস্থিত জমি-জলা মালিকানা ব্যবস্থার সুরাহা, সিলিং উদ্বৃত্ত জমি-জলা দরিদ্র-প্রান্তিক কৃষিজীবী-জলাজীবীদের মধ্যে বণ্টন, সংশ্লিষ্ট আইনকানুনের পরিবর্তন, বর্গা/ভাগ-চাষসহ কৃষিতে বিভিন্ন ধরনের ভোগদখলস্বত্বের (টেন্যুরিয়েল সিস্টেম) পরিবর্তন, প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর, ভূমি-জলাকেন্দ্রিক বিবাদ-মামলাজনিত অপচয় হ্রাস, রেকর্ড, রেজিস্ট্রেশন, প্রশাসন, ভূমি আইন, বাজার, বিপণন, মজুরি, কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য, মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলুপ্তি, কৃষি ঋণ, ভর্তুকি, কৃষি বীমা, পরিবেশবান্ধব কৃষি (টেকসই কৃষি), জমি-জলায় নারীর অধিকার-উত্তরাধিকারসহ কৃষিতে নারীশ্রমের স্বীকৃতি, জমি-জলা-জঙ্গলে আদিবাসী মানুষের অধিকার, শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ক্ষতিপূরণ, ভূমি-জলা ব্যবহার নীতি, চর-হাওর-বাওরসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, সুদবিহীন ঋণ, শস্য বহুমুখীকরণ, উপকরণ সংরক্ষণ, বিশেষ উৎপাদন অঞ্চল গঠন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের বিকাশ, কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন (R & D), প্রযুক্তি এবং ইনপুট খাতসমূহে পরিবর্তন, বিশ্বায়নের আওতায় কৃষিতে সংশ্লিষ্ট নীতি-কৌশল। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার—রাজনৈতিক বিষয়। এ সংস্কারে আর্থরাজনৈতিক কাঠামোর প্রসঙ্গটি নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। কারণ, বিষয়টি উন্নয়নপ্রক্রিয়ায় প্রান্তিক-বঞ্চিতদের নিরন্তরভাবে অন্তর্ভুক্তিকেন্দ্রিক।

(২) 'বঙ্গবন্ধুর কৃষি ও কৃষক ভাবনার' নিরিখে—"৬৫ হাজার গ্রামে বাধ্যতামূলক বহুমুখী গণমুখী সমবায় গঠন"— বিষয়টি এবারের বাজেটে অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে। এ লক্ষ্যে, ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমির বণ্টন, খাসজমিতে দরিদ্র মানুষের আবাসন, খাসজলায় প্রকৃত জেলের অভিগম্যতা-মালিকানা, বর্গাচাষির বর্গাস্বত্ব নিশ্চিত করা, প্রান্তিক

ও ক্ষুদ্র কৃষকের ন্যায্য পণ্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, বহুমুখী কৃষি সমবায় গড়ে তোলা (এখন গ্রামের সংখ্যা ৮৭,২২৩; ২০১১-এর আদমশুমারি অনুযায়ী ইত্যাদি) বিষয়ে বাজেটে স্পষ্ট দিকনির্দেশনাসহ বরাদ্দ থাকতে হবে।

(৩) সরকারের ২০০৮ নির্বাচনী ইশতেহার 'রূপকল্প ২০২১'-এ 'ভূমি সংস্কার কমিশন' গঠনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর পরে আসন্ন বাজেটে তা পূর্ণ কার্যকর বাস্তবায়ন এবং সে লক্ষ্যে যথোপযুক্ত বরাদ্দ সময়ের দাবি।

(৪) প্রস্তাবিত বাজেট বছরেই কৃষি ও কৃষক ভাবনার যথার্থতা বিচারে ১ লক্ষ ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে কমপক্ষে ২ লক্ষ বিঘা কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত দেওয়া সম্ভব। পাশাপাশি, ২০ হাজার জলাহীন প্রকৃত মৎস্যজীবী পরিবারের মধ্যে কমপক্ষে ৫০ হাজার বিঘা খাস জলাশয় বন্দোবস্ত দেওয়া যায়।

(৫) অবৈধ দখলকৃত ২ কোটি বিঘা খাস জমি-জলা এখনই জমিদস্যু-জলাদস্যুদের থেকে উদ্ধার করে কীভাবে দরিদ্র ভূমিহীন-প্রান্তিক নারী-পুরুষের মালিকানায় যাবে—এ বিষয়ে বাজেটে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দসহ স্পষ্ট দিকনির্দেশনা থাকতে হবে।

(৬) খাস জমি-জলা-জঙ্গল সম্পর্কে সরকারকে কয়েকটি সত্য স্বীকার করে নিতে হবে: (ক) খাস জমি-জলা-জঙ্গল আত্মসাৎ করে নিজেদের ভাগ্য গড়ে তুলতে দেশে একটি কায়েমি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে, যারা খাসজমির সুষম বণ্টনে প্রধান অন্তরায়; (খ) অবৈধ দখলদারদের বড় অংশ সবসময়ই ক্ষমতাসীনদের সম-দলভুক্ত; (গ) খাসজমি-জলা চিহ্নিতকরণ ও বিলি-বণ্টন ফলপ্রদ করা জনকল্যাণকামী স্থানীয় সরকার ও সমগ্র প্রক্রিয়ায় জনগণের সম্পৃক্ততা ছাড়া সম্ভব নয় (যা সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদে "স্থানীয় শাসন"-এর সাথে সাযুজ্যপূর্ণ)।

(৭) খাসজমি-জলা বণ্টন বিষয়টি যেহেতু হতে পারে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা দূরীকরণের অন্যতম প্রধান মাধ্যম, সেহেতু আমরা প্রস্তাব করছি যে—আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটসহ সরকারের সকল সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারণী দলিলপত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে বলা হবে: (ক) ২০০৫ সালে ভূমিবিষয়ক সংসদীয় কমিটি যে ৫০ লক্ষ একর খাসজমির (কৃষি, অকৃষি ও জলাভূমি) কথা বলেছে, তা অবিলম্বে চিহ্নিত করে জনগণকে অবহিতকরণ; (খ) সব খাসজমি ও জলা (চিহ্নিত-অচিহ্নিত, কৃষি-অকৃষি-জলা অবিলম্বে দেশের দরিদ্র-ভূমিহীন-প্রান্তিক জনসাধারণের মাঝে বণ্টনের পরিকল্পনা এবং এই বণ্টনে অগ্রাধিকার পাবে—গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন শ্রেণি-১, ভূমিহীন শ্রেণি-২, ভূমিহীন শ্রেণি-৩ এবং শহরাঞ্চলে দরিদ্র বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-স্বল্প আয়ী মানুষ; (গ) প্রাপ্য সমস্ত অকৃষি শহুরে খাসজমি বস্তি থেকে নগর দরিদ্রদের উচ্ছেদ বন্ধ এবং সহজ শর্তে খাসজমিতে বাসস্থানের ব্যবস্থা; (ঘ) দলিত, বেদে, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষসহ সবধরনের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্থায়ী বাসস্থানের জন্য ভূমি অধিকার নিশ্চিতকরণ; (ঙ) উপকূলীয় অঞ্চলে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত খাসজমি অবিলম্বে ভূমিহীনদের বন্দোবস্ত দেওয়া; (চ) প্রকৃত পেশাদার জেলে সম্প্রদায় এবং সংশ্লিষ্ট অন্য বৃত্তিধারী সম্প্রদায়ের মধ্যে খাস জলাভূমিসমূহ বণ্টন; (ছ) চরের সব জমি দিয়ারা জরিপপূর্বক খাস খতিয়ানভুক্ত করে

প্রকৃত ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করা; (জ) খাসজমির বিভ্রান্তিকর শ্রেণিবিভাজন বন্ধ করা (যেমন কৃষিজমিকে জলাভূমি হিসেবে দেখানো); (ঝ) খাসজমি চিহ্নিতকরণ কমিটিতে কৃষক সংগঠন, ক্ষেতমজুর, নারী সংগঠন, রাজনৈতিক দলসমূহ, বেসরকারি সংস্থা, সামাজিক সংগঠনসমূহ ও স্কুলশিক্ষকদের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা; এবং এসব কমিটিতে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রভাব হ্রাস ও সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া; (ঞ) খাসজমি চিহ্নিতকরণ, বাছাই, বণ্টন এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে জনসম্পৃক্ত স্থানীয় সরকারের ফলপ্রদ সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করা; (ট) খাসজমি বণ্টনের ক্ষেত্রে সহজবোধ্য বাংলায় লিখিত ফরম গরিব মানুষের মধ্যে বিতরণ করা; (ঠ) খাসজমি বণ্টনসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি জাতীয় প্রচারমাধ্যম ও ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রকাশ ও প্রচার করা এবং তা তৃণমূলপর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়া; (ড) ভূমিহীনেরা যেন তাদের মাঝে বণ্টনকৃত জমি-জলা রক্ষা করতে পারেন, তার জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদনী-উপকরণ (ইনপুট) সরবরাহ করা ও আইনি সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা; (ঢ়) জমির দখলিস্বত্বের সমস্যা ও ফসলের ওপর কর্তৃত্বের সমস্যা নিরসনে আইনি সহায়তা ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা। এসব ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থা ও অন্যান্য পেশাভিত্তিক সংস্থার সহায়তা (যেমন আইনগত পরামর্শ) ব্যবস্থা জোরদার করা; (ঢ) উৎপাদনমুখী উপকরণ ও কৃষিজ-ইনপুট কেনার ক্ষেত্রে ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে সহজ শর্তে (প্রয়োজনে বিনাসুদে) ঋণ সুবিধার প্রসার ঘটানো; (ঢ়) উৎপন্ন ফসল বাজারজাতকরণে সবধরনের সহায়ক ব্যবস্থা চালু করা। সরকারের পক্ষ থেকে গরিব ভূমিহীন জনগণকে পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করা; (ণ) সম্ভাব্য সব ক্ষেত্রে গণমুখী সমবায়ভিত্তিক খামারব্যবস্থা গঠনে সর্বোচ্চ প্রণোদনা দেওয়া; (ত) ভূমি অফিসের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কর্মকাণ্ডে নিবিড় তদারকির ব্যবস্থা করা; (থ) খাসজমির বণ্টনপ্রক্রিয়াকালীন ভূমি অফিসের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারসম্পর্কিত সুপারিশমালা

১. আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জনগণতান্ত্রিক বিকল্প বাজেটে আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হলো কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে **"কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার বিভাগ"** গঠন করা হোক। এ লক্ষ্যে আগামী ৫ বছরের জন্য মোট ৮১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হোক, অর্থাৎ আসন্ন অর্থবছরে ১৬ হাজার ২০০ কোটি টাকা (দেখুন, সারণি ৪)।

২. আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারসংশ্লিষ্ট আমাদের প্রস্তাবিত ১৬ হাজার ২০০ কোটি টাকার মধ্যে থাকবে: (ক) দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষি ও জলাজীবী খানার মধ্যে খাসজমি ও জলা বিতরণ; (খ) দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য সুদবিহীন/ স্বল্প সুদের স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান; (গ) কৃষকদের কৃষিপণ্যের ন্যায্য বাজারমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ; (ঘ) ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য বীমা; (ঙ) সেটেলার বাঙালিদের সমতলে পুনর্বাসন।

৩. কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারসংশ্লিষ্ট সকল বৃহৎ বর্গের খাত-উপখাতকে বাজেটে ভিন্ন লাইন আইটেম হিসেবে বরাদ্দসহ দেখানো হোক;

৪. কৃষি-ভূমি-জলা খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যাবলী তদারকি করতে মনিটরিং সেল গঠন এবং তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হোক।

পারিবারিক কৃষি

(১) পারিবারিক কৃষিকে স্বীকৃতি দিতে হবে। আর স্বীকৃতির বাস্তবায়নে যথাযথ বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে;

(২) বাজেটে পারিবারিক কৃষির সাথে জড়িত প্রান্তিক কৃষক এবং বর্গাচাষীদের জীবন ও জীবিকার সুরক্ষার জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে;

(৩) প্রান্তিক কৃষকের জন্য ভর্তুকিমূল্যে প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণে বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে এবং সঠিকভাবে বাধাহীন প্রাপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে;

(৪) যেকোনো দুর্যোগে ফসলের ক্ষতি হলে কৃষককে দ্রুত এবং সরাসরি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য বরাদ্দ রাখা জরুরি;

(৫) কৃষকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের বীমা—আবাসন, শস্য, গবাদিপশু, শিক্ষা, স্বাস্থ্য—চালুর জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে;

(৬) শোষণ-বঞ্চনা-দারিদ্র্য-প্রান্তিকতার নিরন্তর শিকার খুদে পারিবারিক কৃষকদের জীবনমান উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে, তাদের ক্ষেত্রে গড় উন্নয়ন বরাদ্দ জাতীয় উন্নয়ন বরাদ্দের চলমান গড়ের তুলনায় ২৭% বেশি হওয়া উচিত (এখন তারা পান জাতীয় মাথাপিছু গড় বরাদ্দের মাত্র ১৭%)।[৪]

(৭) দরিদ্র-প্রান্তিক-খুদে পারিবারিক কৃষির জন্য বাজেটে সুনির্দিষ্ট লাইন আইটেমভিত্তিক কোনো বরাদ্দ থাকে না। এক হিসেবে দরিদ্র-প্রান্তিক-খুদে পারিবারিক কৃষকদের জন্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দের আনুমানিক পরিমাণ হবে ২৯ হাজার ৪৯১ কোটি টাকা, যা আবার জনসংখ্যানুপাতে (তারা জনসংখ্যার ৪৭.৬৩%) তাদের ন্যায্য হিস্যার মাত্র ১৯.৮৭%। বিষয়টি আসন্ন বাজেটে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

আদিবাসী মানুষ

(১) আদিবাসী মানুষের জীবনবঞ্চনা বিশ্লেষণে আমরা ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে "সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ" খাতের আওতায় (সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে) **"আদিবাসী মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়ন বিভাগ"** প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করছি। আমাদের প্রস্তাবিত এই বিভাগের জন্য আগামী ৫ বছরে মোট ৩ হাজার কোটি টাকা এবং আসন্ন

---

[৪] বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত (২০২৩), "অ-জনগণকরণের" রাজনৈতিক অর্থনীতি: বাংলাদেশে ৫০ বছরের রাষ্ট্রীয় বাজেটে পরিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ ও ভূমি সংস্কার, ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, পৃ. xxvi, ১২৭-১৪৯, ২৩৩-২৩৮।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে ৬০০ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করছি (দেখুন, সারণি ৪)।

(২) আদিবাসী মানুষের জন্য বাজেটে সংশ্লিষ্ট সকল খাত-উপখাতভিত্তিক লাইন আইটেমসহ বরাদ্দ প্রদর্শন করতে হবে; 'পার্বত্য' ও 'সমতল' এর আদিবাসী মানুষের জন্য ওই বরাদ্দ ভিন্ন ভিন্ন দেখানো স্বচ্ছতার নিরিখে যুক্তিসংগত হবে;

(৩) আদিবাসী শিশুদের নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় পাঠ্যবই, উপকরণ, হোস্টেলসহ শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বাজেটে যথেষ্ট পরিমাণে বরাদ্দ রাখতে হবে;

(৪) শ্রেণিবিভক্ত সমাজ ব্যবস্থায় যুগ যুগ ধরে আদিবাসী মানুষ দ্বিবিধ শোষণ-নির্যাতন-বৈষম্য-অবদমনের শিকার: একবার দরিদ্র-প্রান্তস্থ-বহিঃস্থ মানুষ হিসেবে; আরেকবার আদিবাসী মানুষ হিসেবে। বংশপরম্পরা বৈষম্য-দারিদ্র্যের শিকার আদিবাসী মানুষের মানবসত্তার স্বীকৃতি এবং তাদের ক্ষমতায়নে উন্নয়ন বরাদ্দের জাতীয় গড়ের তুলনায় কমপক্ষে তিনগুণ বেশি বরাদ্দ দেওয়া যুক্তিসংগত;

(৫) জুমচাষিদের অন্তত এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত যে তিন মাস তারা কর্মহীন থাকেন, সেই সময়ের জন্য রেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। এটা জরুরি মানবিক সেবা (Emergency humanitarian service) হিসেবে গণ্য করতে হবে। জুমচাষিদের জন্য রেশন ব্যবস্থার অর্থসংকুলানের জন্য আমাদের প্রস্তাবিত "বিধিবদ্ধ রেশনিং বিভাগ"কে দায়িত্ব দেওয়া সংগত।

সমতলের আদিবাসী

(১) সমতলের আদিবাসী মানুষের জীবনমান দেখভাল করার জন্য সরকারের কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগ নেই। এ লক্ষ্যে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় এবং সেই মন্ত্রণালয়ের জন্য পৃথক বাজেট বরাদ্দ থাকা জরুরি;

(২) পার্বত্য আদিবাসীদের মতো সমতলের আদিবাসীদের জন্যেও একটি ভূমি কমিশন গঠন করতে হবে;

(৩) ওই কমিশনকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে কার্যকর করতে মধ্যমেয়াদি (৫ বছরব্যাপী) বরাদ্দ দিতে হবে;

(৪) হাওর এবং সমতলের অন্যান্য এলাকায় আদিবাসী মানুষের বেদখল হয়ে যাওয়া জমি-জলার পুনরুদ্ধারে বাজেটে বরাদ্দসহ কার্যকর উদ্ধার মেকানিজমের পথ-নির্দেশ থাকতে হবে।

শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তি আইন ও আইনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ

শত্রু/ অর্পিত সম্পত্তি আইনে ১২ লক্ষ হিন্দু পরিবার ২৬ লক্ষ একর ভূ-সম্পত্তি হারিয়েছেন। অমানবিক এই সমস্যাটি গত ৫০ বছর জিইয়ে রাখা হয়েছে; ভূ-সম্পত্তি হাতবদল হয়েছে, যে কারণে অনেক ক্ষেত্রেই আইনগতভাবে প্রকৃত মালিকানা প্রতিষ্ঠা করাও হয়তো বা দুষ্কর; সরকার বলছে তাদের হাতে মাত্র ২ লক্ষ ১৫ হাজার একর ভূ-সম্পত্তি আছে অর্থাৎ প্রায় সব সম্পত্তি সরকারের বেহাত হয়েছে; জোরদখলকারীরা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ও ক্ষমতাবলয়ের সাথে সুসম্পর্কিত—সুতরাং কেউ কেউ হয়তো বা ভাবতে পারেন যে সমস্যার সমাধানে উত্থাপিত সুপারিশসমূহ কল্পনাপ্রসূত অথবা যথেষ্ট বাস্তবমুখী নয়। এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট— সমস্যাটি মানবসৃষ্ট কিন্তু মনুষ্যবিরোধী। সুতরাং সভ্য সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সমাধান হতেই হবে, নচেৎ ভবিষ্যতে একই ধরনের এবং অপেক্ষাকৃত বড় মাপের ঐতিহাসিক বিপর্যয় অনিবার্য।

আমরা মনে করি যে শত্রু/ অর্পিত সম্পত্তি আইনের আওতাধীন সম্পদ-সম্পত্তির মালিক সরকার নয়, সরকার হলো রক্ষক বা জিম্মাদার (custodian not owner)। সরকারের আইনগত বাধ্যবাধকতা হলো ওই সম্পত্তি প্রকৃত মালিক এবং/ অথবা তার উত্তরাধিকারীদের বুঝিয়ে দেওয়া; সেইসাথে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বন্দোবস্ত (লিজ) দেওয়া এবং বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে প্রকৃত মালিক ও তার উত্তরাধিকারদের অগ্রাধিকার দেওয়া। সরকার যখন নিজেই বলছে যে ২ লক্ষ একরের বেশি জমি-সম্পত্তি তার হাতে নেই, তখন ধরে নিলে হিসাবে কোনো ভুল হবে না যে ২০ লক্ষ একর জমি-জমা দুর্বৃত্তরা গ্রাস করেছে।

আমরা মনে করি, সমাধান হতে হবে সুনির্দিষ্ট (specific) ও বাস্তবসম্মত (realistic)। যেহেতু সমস্যাটি ভূমিসম্পদকেন্দ্রিক এবং তা ঐতিহাসিক রূপ পরিগ্রহ করেছে, সেহেতু আমাদের সুপারিশ হলো—সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধানে নির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ করতে হবে।

কৃষিঋণ ও উপকরণ ভর্তুকি

কভিড-১৯-উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এ কথা অনস্বীকার্য যে কৃষি ও কৃষক না থাকলে দেশে অর্থনৈতিক-সামাজিক বিপর্যয়মাত্রা অনেক গুণ বৃদ্ধি পেত। কভিড-১৯-এর লকডাউনে প্রমাণ হয়েছে যে দেশের সকল অর্থনৈতিক খাত-ক্ষেত্রের মধ্যে কৃষিখাতের "কভিড-১৯ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা" (ইম্যুনিটি লেভেল) সর্বোচ্চ। রপ্তানিমুখী শিল্প খাতসহ বৃহৎ ঋণগ্রহীতারা যেসব সুযোগ/ প্রণোদনা পান কৃষক-কৃষি তা পান না। এখন ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের অভিঘাত এবং বৈশ্বিক মন্দাবস্থা থেকে এ কথা অনস্বীকার্য যে—এখনই শ্রেষ্ঠ সময় ও সুযোগ—কৃষির প্রতি সর্বোচ্চ মাত্রায় জোর দেওয়া। আমাদের সুপারিশ হচ্ছে কৃষককে দিতে হবে—

(১) বিনাসুদে (অথবা স্বল্প সুদে) ঋণ অন্তত সামনে ৫ বছর (মাইক্রো ক্রেডিট সংস্থাদের জন্যও তা করার নির্দেশনা দিতে হবে),

(২) ন্যায্যমূল্যে মৌলিক কৃষি উপকরণ (অন্তত সামনের ৫ বছর) যেমন বীজ, সার, সেচ, কীটনাশক।

কৃষককে কৃষিপণ্যের ন্যায্য বাজারমূল্য প্রদান

প্রকৃত কৃষক কখনওই তার শ্রমে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য পান না। কভিড-১৯-এর লকডাউনের মধ্যে অসম্ভব প্রতিকূলতর মধ্যে যে বোরো ধান উঠল, তার কথাই ধরা যাক। চালকলমালিক আর পাইকারি ব্যবসায়ীদের কাছে কৃষক তার ধান বিক্রি করলেন মণপ্রতি ৪০০-৬০০ টাকায় (দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মূল্য), ওই ধানেরই চালের দাম হয়ে গেল মণপ্রতি ১৪০০-১৫০০ টাকা। অর্থাৎ প্রতি কেজি চালের দাম গড়ে ৩৭.৫০ টাকা। চালকলমালিক, পাইকার, পরিবহন ও 'নরমাল' মুনাফা (সব পর্যায়ে) যোগ করলে প্রতি কেজি চালের খুচরামূল্য হওয়ার কথা ২২.৫০ টাকা, তাহলে কৃষক প্রতি কেজি ধানে ঠকলেন কমপক্ষে ১০ টাকা। কৃষক উৎপাদন করলেন ২ কোটি মেট্রিক টন। তাহলে কৃষক তো শুধু বোরো ধানেই ঠকলেন ২০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ। আসলে বলা যৌক্তিক হবে যে, কৃষক ২০ হাজার কোটি টাকা ট্যাক্স দিয়েছেন। এসব দেখার কেউ নেই, নেই কোনো সিস্টেম। কৃষক তো বলেছেন "ফসল লাগান ছাড়ি দিমু; ঠেলা বুঝবানে; রাঘব-বোয়াল বুজবে"। সর্বত্র সিন্ডিকেট–চালকলমালিক সমিতি, ধান ক্রেতা আড়তদার সমিতি, পরিবহন সমিতি ইত্যাদি। মারাত্মক যা, তা হলো—চাল বিক্রেতাদের মজুদ বাড়ল; সরকারি ক্রয় যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ বাজারে খুচরামূল্য বাড়বে, যখন ক্রেতার হাতে টাকা থাকবে না। এসব নতুন কথা নয়—নয় আমাদের আবিষ্কার। এসবই বাস্তব সত্য। কৃষককে তার উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্য বাজারমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য জরুরিভাবে কয়েকটি পদক্ষেপ নিতে হবে—

(১) সরকারের মজুদ (ধান-চাল) আরো অনেক বাড়াতে হবে (যদিও কয়েক লাখ টন কিনেছে), প্রয়োজনে ভাড়া করা গুদামে চাল রাখতে হবে—এটি একান্ত জরুরি।

(২) সরকারিভাবে সংগ্রহের ক্রয়মূল্য শুধু উৎপাদন খরচের তুলনায় কমপক্ষে ২০ শতাংশ বাড়ালেই হবে না, সেইসাথে নিশ্চিত করতে হবে প্রকৃত কৃষকই (মধ্যস্বত্বভোগী-দালাল নয়) যেন কোনো ঝামেলা ছাড়াই ওই বাজারমূল্য নিশ্চিতভাবে হাতে পান। সরকারিভাবে সংগ্রহের কাজটি সরকারি উদ্যোগেই বিভিন্ন হাটবাজার-মোকামে সংগঠিত করতে হবে।

(৩) কৃষিপণ্য উৎপাদনের আগেই কৃষক যখন থেকে জমি প্রস্তুত শুরু করবেন, তখন থেকেই তাকে স্বল্প সুদে অথবা পারলে বিনাসুদে (অন্তত দরিদ্র, প্রান্তিক, খুদে কৃষকসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকার কৃষকদের) স্বল্পমেয়াদি ঋণ দিতে হবে, যাতে তিনি চড়া সুদের ঋণের জালে আবদ্ধ না হন অথবা কৃষিকাজে লোকসানের কারণে সম্পদহীন হয়ে না পড়েন।

(৪) কোনো কারণে কৃষিফসল মার গেলে মূল ঋণ (সুদ তো বটেই যদি থাকে) মওকুফ হয়ে যাবে।

(৫) কৃষককে কৃষিপণ্যের ন্যায্য বাজারমূল্য প্রদানের বিষয়টি আসন্ন বাজেটে যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট খাত-উপখাতে বাজেট বরাদ্দ প্রদান করতে হবে।

কৃষি ফসলের উৎপাদন-অঞ্চল গঠন, শস্য বহুমুখীকরণ, উপকরণ সংরক্ষণ ও বিপণনব্যবস্থা সংস্কার

বাংলাদেশের কৃষি এখনও প্রকৃতিনির্ভর। যত না বাজারের উদ্দেশ্যে তার চেয়ে বেশি নিজ প্রয়োজনে কৃষক ফসল উৎপাদন করেন। বাজারমূল্যের চেয়ে প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় বেশি। ফসল সংরক্ষণের ব্যবস্থাও অপ্রতুল। শুধু ফসলই নয়, প্রাণিজ আমিষের বাজারমূল্যও অনিয়ন্ত্রিত। তৈলবীজ ও মসলাজাতীয় শস্য উৎপাদনের সুযোগ ও চাহিদা আছে। কিন্তু সে অনুযায়ী উৎপাদন হয় না। আবার সব এলাকায় সব ফসল হয় না। এসব বিবেচনায় আমাদের সুপারিশ নিম্নরূপ:

(১) কৃষিপণ্যের সময়ভিত্তিক চাহিদা নিরূপণ করে দেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ফসলের জন্য বাজেটের আওতায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সুবিধাজনক এলাকা ভাগ করে কৃষি উৎপাদন অঞ্চল গঠন করা দরকার।

(২) দেশের কৃষি-পরিবেশ জোনভিত্তিক এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্ক রেখে সামঞ্জস্যপূর্ণ শস্য বহুমুখীকরণ-এর দিকনির্দেশনা থাকতে হবে।

(৩) কৃষিখাতের উদ্যোগ কার্যকর করার জন্য বিপণনব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাসে সরকারকে হতে হবে কঠোর এবং নির্মোহ। প্রতিটি উপজেলাভিত্তিক (প্রয়োজনে বিশেষ গ্রামসহ) কৃষি উপকরণ, পণ্য সংরক্ষণ এবং বিপণনের জন্য পর্যাপ্ত কোল্ডস্টোরেজ (প্রয়োজনে ভূগর্ভস্থ) নির্মাণকল্পে বিশেষ কর্মসূচিভিত্তিক অবকাঠামো তৈরিতে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

হাওর-বাঁওর-বিল-চর-প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকার দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষের জন্য সুদবিহীন ঋণ

দারিদ্র্যপীড়িত ভৌগোলিক এলাকা (হাওর-বাঁওর-বিল-চর) এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ (climate-natural calamities hotspots) এলাকার ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে কৃষিজ উপকরণ ক্রয়ে সুদবিহীন স্বল্পমেয়াদি (ছয় মাস) ঋণ প্রদান একই সাথে দারিদ্য দূরীকরণ ও বৈষম্য হ্রাসে অন্যতম পন্থা হিসেবে ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। উল্লেখ্য গত বছর ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে দেশের ২৬ জেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে—১ লক্ষ ৭৬ হাজার হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে; ২ লক্ষ ২০ হাজার ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে; পশু ও মৎস্যসম্পদ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত; কয়েক লক্ষ গাছপালা উপড়ে গেছে; কমপক্ষে ২০০ ব্রিজ-কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; শতাধিক গ্রাম সম্পূর্ণ পানির তলায় তলিয়ে গেছে; কমপক্ষে ১৫০ কিলোমিটার বাঁধ ভেঙে গেছে; ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কমপক্ষে ১০ লক্ষ মানুষ। বাংলাদেশে এসব নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সাইক্লোন আম্ফানসহ এ ধরনের দুর্যোগে যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়, তা পূরণের জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে। আমাদের সুপারিশ হলো:

(১) দরিদ্র-প্রান্তিক কৃষকদের জন্য সুদবিহীন ঋণ, হাওর অঞ্চলের উন্নয়ন, উপকূলীয় দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলের উন্নয়ন এবং আম্ফানসহ বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি পূরণের বিষয়াদি আসন্ন বাজেটে বিবেচিত হওয়া ন্যায়সংগত।

হাওরাঞ্চলের প্রকৃতিবান্ধব উন্নয়ন

(১) হাওর-বাঁওর-বিল-চরাঞ্চলের মানুষের দুর্দশা-বঞ্চনা নিরসন ও উন্নয়ন সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হলো—

(ক) **"হাওর-বাঁওর-বিল-চর-উপকূল উন্নয়ন বিভাগ"** (কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে) প্রতিষ্ঠা করা,

(খ) প্রস্তাবিত এই বিভাগের জন্য আগামী ৫ বছরে মোট ৮০ হাজার কোটি টাকা অর্থাৎ বছরে ১৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা (দেখুন, সারণি ৪)।

(২) প্রকৃত মৎস্যজীবীদের জলমহাল ইজারা নিতে লিজের টাকার পরিমাণ কমাতে হবে;

(৩) প্রকৃত মৎস্যজীবীদের বিনাসুদে বা সহজ শর্তে স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণ প্রদানে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে;

কৃষি বীমা

ভূমিহীন-প্রান্তিক-খুদে কৃষকদের জন্য "শস্য বীমা", "কৃষি বীমা", "জীবিকা বীমা", "আবাসন বীমা", "প্রাকৃতিক দুর্যোগ বীমা", "গবাদিপশু বীমা", 'স্বাস্থ্য বীমা', শিক্ষা বীমা—পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার পথনির্দেশসহ ব্যয়-বরাদ্দ আসন্ন বাজেটে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপখাত

সাম্প্রতিককালে, বাংলাদেশের উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপখাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশ আজ মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ। পোলট্রি, দুগ্ধ, মাংস, শাকশবজি উৎপাদনে আমরা প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। অভাবিত এই সাফল্যকে টেকসই করতে পরিকল্পিতভাবে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে:

(১) সবপর্যায়ের খামারিদের প্রণোদনা, ভর্তুকি এবং বীমার আওতায় আনা,

(২) সকল খামারির সাথে টেকনোলজি ও সংশ্লিষ্ট গুণগত ও স্বাস্থ্যগত মান নিয়ন্ত্রণপ্রক্রিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণকরণ,

(৩) এই উপখাতে, উৎপাদন ও পণ্যের বাজারজাতকরণের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে সুসমন্বিত করে একটা দায়বদ্ধতামূলক মেকানিজম (কর্মপদ্ধতি) প্রতিষ্ঠাকরণ,

(৪) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপখাতকে একটি পূর্ণাঙ্গ খাতের স্বীকৃতি দিয়ে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে,

(৫) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপখাতে ইনোভেশন ও গবেষণায় বিশেষ বরাদ্দ দিতে হবে।

কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন

কৃষিতে সরকারিভাবে গবেষণা ও উন্নয়ন বরাদ্দ (R & D expenditure) যথেষ্ট অপ্রতুল। ব্যাপক মাত্রায় গবেষণা ও উন্নয়নব্যয় ছাড়া প্রকৃতিবান্ধব-স্থায়িত্বশীল কৃষি উন্নয়ন সম্ভব নয়। সম্ভব নয় বৈষম্য হ্রাস ও উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন। কৃষিতে গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ নিয়ে আমাদের সুপারিশ নিম্নরূপ:

(১) কৃষিতে ব্যাপক মাত্রায় গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়-বরাদ্দ দিতে হবে, তবে এ বরাদ্দ শর্তহীন হবে না। 'গবেষণা ও উন্নয়ন'-এর নামে এমন কোনো বরাদ্দ দেওয়া যাবে না অথবা প্রাইভেট সেক্টরে বরাদ্দ হলে তা শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে সেইসব বরাদ্দ—যা শেষপর্যন্ত মানুষসহ প্রাণিকূলের স্বাস্থ্যগত-শরীরগত বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে, প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ-প্রতিবেশ ধ্বংসের কারণ হতে পারে।

(২) এ বছর আমরা "গবেষণা, উদ্ভাবন, বিচ্ছুরণ ও উন্নয়ন" (Research, Innovation, Diffusion and Development) নামে একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করছি। এই মন্ত্রণালয়ের জন্য আমাদের প্রস্তাব হলো আগামী ৫ বছরে ১ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ, আর আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩০ হাজার কোটি টাকা (দেখুন, সারণি ৪)। প্রস্তাবিত এই মন্ত্রণালয়ের আওতায় সার্বিক কৃষি উন্নয়নের কৌশলগত কারণে আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে শুধু কৃষিখাতে গবেষণা, উদ্ভাবন, বিচ্ছুরণ ও উন্নয়নের জন্য উল্লিখিত ৩০ হাজার কোটি টাকার মধ্যে কমপক্ষে ১৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা।

তামাক চাষ বন্ধ করা

কৃষিজমির বাণিজ্যিক ব্যবহার, যা খাদ্যনিরাপত্তা বিঘ্নিত করে, বিশেষত তামাক চাষ নিরুৎসাহিত করতে বাজেটে আর্থিক নির্দেশনা থাকা আবশ্যক। একদিকে তামাক চাষ বন্ধ করতে হবে অন্যদিকে এখনকার তামাক চাষিদের তামাক চাষ ছেড়ে পরিবেশবান্ধব কৃষিকাজে নিযুক্ত হতে প্রণোদনা দিতে হবে। তামাক চাষ নিরৎসাহিত করার জন্য প্রণোদনা দেবার সাথে সাথে যেন তামাক চাষ কমে আসে—বিষয়টি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৪.১২ ভূমি মামলা: পারিবারিক ও জাতীয় অপচয়

এ দেশে ভূমি মামলা বিষয়টির সুরাহা দেখতে হবে সামগ্রিক কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারসহ শিল্পায়ন, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং প্রকৃত মানব উন্নয়নের অংশ হিসেবে। আর বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোতে বড় মাপের এ ধরনের সংস্কারমুখী কর্মকাণ্ড সংগঠিত না করা গেলেও কিছু কিছু সংস্কার করা সম্ভব, যা ভূমি মামলাসংশ্লিষ্ট মানুষের দুঃখ-দুর্দশা-কষ্ট-ক্লেশ প্রশমনে সহায়ক হবে। সেক্ষেত্রে সংস্কারের আওতায় আসতে পারে: (ক) ভূমি আইন ও প্রশাসন; (খ) সম্পূর্ণ বিচার-আইনব্যবস্থা; (গ) প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট খাত ও ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা। এবং অবশ্যই "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ" (সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭.১)—বিষয়টি সংশ্লিষ্ট জনকল্যাণকামী রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের লাগাতারভাবে বলে যাওয়া এবং যেখানে যতটুকু সম্ভব কার্যকর করার

প্রচেষ্টাসংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফলপ্রদ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এসব বিবেচনা থেকেই আমাদের প্রস্তাবনাসমূহ নিম্নরূপ, যা বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ করতে হবে:

(১) সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কোর্ট, ভূমি প্রশাসন ও থানা-পুলিশের দুর্নীতি হ্রাসে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা।

(২) স্থানীয়পর্যায়েই (গ্রাম/ ইউনিয়ন/ পাড়া/ মহল্লা) প্রচলিত প্রথাগত 'সালিস' পদ্ধতির মাধ্যমে ভূমিসংক্রান্ত বিবাদ মিমাংসার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। এ বিষয়ে কমিটিতে অন্যদের মধ্যে নারীসহ নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা।

(৩) স্থানীয়পর্যায়ে ভূমিসংক্রান্ত বিবাদ মিমাংসার জন্য স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে সক্রিয় করা।

(৪) দরিদ্র মানুষের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করা এবং ভূমিসংক্রান্ত বিবাদ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ভূমি ট্রাইবুনাল গঠন করা।

(৫) ভূমি মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা—তবে তা হতে হবে সম্পূর্ণ আইনসম্মত (কারণ দ্রুত নিষ্পত্তি আর্থিক-পেশি প্রতিপত্তিশালী রেন্ট-সিকারদের স্বার্থসিদ্ধিসহায়ক হতে পারে)। ভূমি মামলা শ্রেণিবদ্ধ করে বিভিন্ন শ্রেণির মামলার নিষ্পত্তির সময়সীমা বেঁধে দেওয়া।

(৬) নৈতিক উন্নত মানসকাঠামোসম্পন্ন অধিকসংখ্যক দক্ষ পেশাজীবী বিচারক নিয়োগ দেওয়া।

(৭) ন্যায়বিচারের রায় কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা (যেমন এ বিষয়ে পুলিশের ভূমিকা স্বচ্ছ করা)।

(৮) ভূমির প্রকৃত মালিক অথবা তার প্রকৃত উত্তরাধিকার নিরূপণ করা (বিক্রেতার মালিকানা নিশ্চিত না হয়ে রেজিস্ট্রেশন না করা; জাল দলিল নিরূপণ করার ব্যবস্থা করা)।

(৯) মাঠপর্যায়ের বস্তুনিষ্ঠ তদন্ত ছাড়া *মিউটেশন* (নামজারি অথবা জমা-খারিজ) না করা।

(১০) ভূমি মামলার রায় প্রভাবিত করতে রাজনীতিক বা স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরত রাখা—বিষয়টি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা (সে অনুযায়ী আইন প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করা)।

(১১) জমির জাল দলিল/ কাগজপত্র করা এবং অবৈধ জমি দখলের সাথে যারা সম্পৃক্ত, তাদের জন্য কঠোর শাস্তির আইন প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করা (এক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের ভূমিকা বিধিবদ্ধ করা)।

(১২) এমন আইন করা, যাতে জমি-জমার জাল দলিলকরণের সাথে সম্পৃক্তরা তাদের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়।

(১৩) সার্ভেয়াররা যেন ভূমির রেকর্ড এবং সেটেলম্যান্টের কাজ সঠিক এবং প্রভাবমুক্তভাবে করতে সক্ষম হন—সরকারকে এই দায়িত্ব নেওয়া।

(১৪) আইনজ্ঞ ও সংশ্লিষ্টদের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও পেশার মানবিকীকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা (প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; মামলার শ্রেণিভিত্তিক ফি নির্ধারণ; ম্যালপ্র্যাকটিস দূর করা ইত্যাদি)।

৪.১৩ ভূমি আইন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, নীতিমালা

(১) খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তসংক্রান্ত নীতিবিরুদ্ধ অকৃষি খাসজমি বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত বাতিল করা।

(২) ১৯৯৪ সালের শিকস্তি-পয়স্তি আইনের সংশোধনী বাতিল করা এবং শিকস্তি-পয়স্তির সকল চর-ভূমি খাস হিসেবে ঘোষণা দেওয়া।

(৩) রিয়াল এস্টেট ব্যবসা অথবা তথাকথিত গৃহায়ণের নামে খাসজমি, জলাশয়-জলমহাল দখল ও ভরাট কঠোরভাবে দমন করা।

(৪) খাসজমি-জলা ও উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্ত জমি-সম্পত্তিতে নারীর সম-অধিকার (সংবিধানিক অধিকার) ও ভোগদখল নিশ্চিত করা। এ বিষয়ে অন্যান্যের মধ্যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে সক্রিয় করা।

(৫) অকৃষিজমির সর্বোচ্চ মালিকানা সিলিং নির্ধারণপূর্বক আইন প্রণয়ন করা এবং সিলিং উদ্বৃত্ত অকৃষি জমি সরকারের হাতে নিয়ে বণ্টনমূলক ভূমি সংস্কার করা।

(৬) সকল ভূমি জরিপ কাজ প্রশিক্ষিত, দক্ষ ও স্থায়ী জরিপকারীদের দিয়ে করার ব্যবস্থা নেওয়া।

(৭) ভাগ/বর্গাচাষসহ অন্যান্য ভোগদখল স্বত্বসংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশের আদলে করে তা দ্রুত বাস্তবায়ন করা। বর্গাস্বত্ব আইন যথাদ্রুত সংস্কার ও বাস্তবায়ন করা। এ বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা যেন তা দরিদ্রবান্ধব হয় এবং বর্গাধীন জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অনুকূল হয়।

(৮) কৃষিখাতে কর্মরত দিনমজুরসহ নারী-পুরুষভেদে সবার জন্য বাজারদরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমান নিম্নতম মজুরি হার নির্ধারণ করা এবং তা বাস্তবায়ন করা ।

(৯) ভূমি ব্যবস্থাপনা স্বচ্ছতর করতে রেকর্ড সংরক্ষণ, রেজিস্ট্রেশন ও সেটেলম্যান্ট একই মন্ত্রণালয়ের আওতায় আনা।

(১০) ভূমিপ্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার আদিম পদ্ধতি বাতিল করে সম্পূর্ণ বিষয়টি সমন্বয়পূর্ণ একক কর্তৃত্বে আনার লক্ষ্যে ভূমি মালিকানার একক পদ্ধতির আওতায় সার্টিফিকেট (CLO: Unitary System of Certificate of Land Ownership) প্রদানের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা চালু করা (এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকসমূহ জনগণকে অবহিত করা)।

(১১) ভূমি ও জলার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও সংশ্লিষ্ট দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য একটি "জাতীয় ভূমি-জলা ব্যবহার নীতি" (National Land-Water Use Policy; National Land Use Policy) প্রণয়ন করা।

(১২) সরকারিভাবে ভূমি-জলা ব্যাংক (Land-Waterbodies Bank) প্রতিষ্ঠা করা, যে ব্যাংকে ভূমি-জলাসংক্রান্ত নিম্নলিখিত বিষয়াদির হালনাগাদ তথ্য কম্পিউটার সিস্টেমে রাখা যাবে এবং যখন যেভাবে প্রয়োজন যে-কেউ তথ্য পেতে পারেন: খাসজমি ও জলার (চরের জমিসহ) ধরন, পরিমাণ, স্থান, মৌজা, বিতরণ-বন্দোবস্ত অবস্থা, বিরোধ, নিষ্পত্তি-অবস্থা; সব অর্পিত সম্পত্তির ধরন, পরিমাণ, স্থান, মৌজা, বর্তমান মালিকানা অবস্থা, বন্দোবস্ত, অন্যান্য; আদিবাসী মানুষের জমি-জলা-বনভূমির পরিমাণ, বেদখলের পরিমাণ, স্থান, মৌজা, জবরদখলকারীর পরিচয়, বিবাদ-বিরোধ, নিষ্পত্তি-অবস্থা প্রভৃতি; চিংড়িঘেরের জমি-জলার পরিমাণ, স্থান, মৌজা, মালিকানা, জবরদখলের পরিমাণ (স্থানসহ), বিরোধ, ক্ষতির পরিমাণ ও প্রকৃতি, বিরোধ নিষ্পত্তির অবস্থা; সব ভূমি মামলার ধরন, পরিমাণ, স্থান, মৌজা, বিরোধের কারণ, নিষ্পত্তির অবস্থা; বাণিজ্যিক চাষের আওতাধীন সবধরনের জমি-জলার হালনাগাদ অবস্থা; নারী-পুরুষভেদে কৃষি দিনমজুরদের জীবন-জীবিকাসংশ্লিষ্ট হালনাগাদ অবস্থা; সব বর্গাদারের বর্গাস্বত্বসংশ্লিষ্ট তথ্যের হালনাগাদ অবস্থা প্রভৃতি।

(১৩) কৃষি খাসজমি, অকৃষি খাসজমি, চরের জমি, আদিবাসীদের ভূমি, জলমহাল, বালুমহাল, পাথরমহাল, চিংড়িমহাল, চা-বাগানের জমি, ওয়াক্‌ফ, ট্রাস্ট, দেবোত্তর সম্পত্তি, জমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল, পরিত্যক্ত সম্পত্তি, অর্পিত সম্পত্তি, ভূমি ব্যবহার, ভূমি জরিপ, ভূমি সংস্কার, ভূমি রেজিস্ট্রেশন, ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন—এসব নিয়ে যেসব আইনি পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন প্রয়োজন তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা।

(১৪) ভূমি সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তন করে ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সমানাধিকারসহ একক উত্তরাধিকার আইন (unitary law of inheritance) প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা।

৪.১৪ শিক্ষা—শোভন মানুষ সৃষ্টির সূতিকাগার

শিক্ষাকে শোভন মানুষ সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে বিবেচনার নিরিখে শিক্ষা, শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসমূহ নিম্নরূপ:

'শিক্ষা' নিয়ে মূল প্রস্তাব

(১) (প্রধান প্রস্তাব) সরকারে যে বা যারাই থাকুন না কেন প্রথমেই নিঃশর্ত স্বীকার করে নিতে হবে যে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো—জ্ঞানসমৃদ্ধ বিচার-বোধসম্পন্ন নৈতিক দৃষ্টিতে উন্নত ও সৌন্দর্যবোধ চেতনায় সমৃদ্ধ পূর্ণাঙ্গ মানুষ সৃষ্টি করা—যে মানুষ ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে মেলবন্ধন সৃষ্টি করতে সহায়ক হবেন; যে মানুষ তার আত্মিক গভীরতার বিকাশের মাধ্যমে প্রকৃতির সাথে যোগসূত্র স্থাপন করতে সক্ষম; যে মানুষ তার সৃজনপ্রতিভার প্রস্ফুটন

ঘটাবেন এবং একই সাথে অন্যদের সৃজনশীল ভাবনা-চিন্তা বিকাশে সহযোগী হবেন; যে মানুষ মানুষে-মানুষে বৈষম্য-অসমতা হ্রাসে উদ্যোগী হবেন; যে মানুষ সমাজ ও প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নিজের ও অন্যের জ্ঞানভিত্তিক কল্পনাশক্তির বিকাশ, প্রসারণ ও কর্ষণে প্রভাবক হবেন; যে মানুষ নীতি-নৈতিকতা ও মানবিকতার নিরিখে অন্য সকল মানুষের প্রতি সমান আচরণে অভ্যস্ত হবেন; যে মানুষ হবেন প্রগতিচিন্তার সচেতন বাহন; যে মানুষ জ্ঞানকে খণ্ডিত আকারে দেখবেন না, দেখবেন বড় পর্দায়—সমগ্রকতার নিরিখে।

(২) উল্লিখিত প্রধান প্রস্তাবের ভিত্তিতেই বিনির্মিত হতে হবে জাতীয় শিক্ষা নীতি।

(৩) 'শিক্ষা'কে কোনোভাবেই 'ব্যয়' (expenditure) হিসেবে দেখা যাবে না। শিক্ষাকে দেখতে হবে শোভন মানুষ সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক বিনিয়োগ (social investment) হিসেবে।

(৪) 'শিক্ষার' মূল শাখা যেটাই হোক না কেন—প্রকৃতিবিজ্ঞান অথবা সামাজিক বিজ্ঞান, হার্ড সায়েন্স অথবা সফট্ সায়েন্স—শিক্ষা হতে হবে 'বহুশাস্ত্রীয়' (multidisciplinary)। কারণ, বাস্তব জীবন যেমন কোনো এক শাস্ত্রে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা নয়, তেমনি তা স্থির নয়—গতিময় (not static but dynamic)। যিনি এটম বোমা বানানোর শিক্ষা গ্রহণ করে তা বানিয়ে বলেন—"আমি জানতাম না যে এটম বোমা মেরে হিরোশিমা-নাগাসাকি উড়িয়ে দেওয়া হবে"—তিনি ইতিহাস শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষায় দীক্ষিত নন—তার শিক্ষার সামাজিক মূল্য নেই। আর যিনি অর্থনীতির কোনো এক তত্ত্ব দিয়ে বলেন—"বুঝিনি, এ তত্ত্বের প্রয়োগে যে নিজের দেশের বা বিশ্বের এত বড় ক্ষতি হয়ে যাবে"—তিনি ক্ষতির দায় এড়াতে পারেন না। সুতরাং আমাদের সুস্পষ্ট প্রস্তাব হলো—শিক্ষা হতে হবে 'বহুশাস্ত্রীয়', যেখানে সকল শাখার শিক্ষার্থীকে যথাযোগ্য মাত্রায় কমপক্ষে যা জানতে হবে, তা হলো— প্রকৃতিসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, জীববিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, ইতিহাস, মানুষের চিন্তা ও মনস্তত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, রাজনীতি। আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হলো—জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়নে বিষয়টি যথাযোগ্য গুরুত্বসহ বিবেচনা করতে হবে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের বেশকিছু মিথ্ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে পাশ্চাত্যভিমান, ভৌগোলিক কর্তৃত্ব-আধিপত্য, অশুভ বিদ্যাভিমান, শ্বেতাঙ্গতা, জ্ঞানজগতের সচেতন কর্তৃত্ববাদী-আধিপত্যবাদ। আমরা অন্য-সবার জ্ঞান থেকে শিখব কিন্তু 'কপি' করব না।

(৫) একদিকে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মূলধারাসমূহ ক্রমাগত অধিক হারে বৈষম্য, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের কাছে জিম্মি, আর অন্যদিকে বহুধারার শিক্ষাব্যবস্থাসহ ধর্মভিত্তিক শিক্ষাব্যয় প্রকৃত অর্থেই শিক্ষার্থীদের জ্ঞানালোকিত করে না। দেশে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে এখন ১১ ধরন/ধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আর মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ৪ ধরন/ধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে—এসবই শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের নির্দেশক। সাম্প্রতিক বাংলাদেশের সরকারগুলো মুক্তবাজার অর্থনীতির দর্শন অনুসরণ করে শিক্ষাকে বাজারের পণ্যে রূপান্তরের আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিক্ষা ও জ্ঞান এখন সমার্থক নয়।

শিক্ষা এখন 'বিদ্যাবস্তু'। শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যমান বৈষম্য সমাজজীবনকে প্রগতিবিমুখ করছে। শুধু তা-ই নয়, ১৯৭৫-পরবর্তী বিগত ৪৭ বছরে অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে, এখন বাংলাদেশে প্রতি ৩ জন ছাত্রের ১ জন মাদ্রাসাগামী—এটা শিক্ষা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ব্যর্থতার প্রত্যক্ষ ফল। এ ধরনের অবৈজ্ঞানিক ও বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থা একদিকে যেমন দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য উৎপাদন-পুনরুৎপাদন করছে, অন্যদিকে তা—ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা পরিপুষ্ট করছে। প্রবণতাটি মারাত্মক। কাজেই, আসন্ন বাজেটসহ রাষ্ট্র-সরকারের সকল দলিলে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট উত্থাপিত প্রধান প্রস্তাবটি (প্রস্তাব ১) সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বাস্তব বিষয়াদি নিয়ে গভীর বিশ্লেষণসহ সমাধান-উদ্দিষ্ট পথনির্দেশনা থাকতে হবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ ও শিক্ষা আইন ২০১৬ বাস্তবায়ন

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ ও শিক্ষা আইন ২০১৬ বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ চূড়ান্ত বাজেটে উল্লেখ থাকা যুক্তিযুক্ত। তবে ভবিষ্যৎ শিক্ষা নীতি প্রণয়নে আমাদের প্রথম প্রস্তাবটি (প্রধান প্রস্তাব) সক্রিয় বিবেচনায় রাখতে হবে। সেইসাথে শিক্ষার স্তরভেদে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ, বিশেষায়িত, ভোকেশনাল প্রভৃতি, এবং মূলধারা ও মাদ্রাসা শিক্ষার বাজেট বরাদ্দ ভিন্নভাবে দেখানো উচিত। এ বরাদ্দের অন্তঃখাত অনুপাত নির্ধারণে মূলধারার শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে যৌক্তিক করতে হবে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকেই শুরু করা যৌক্তিক।

শিক্ষাখাতে বরাদ্দ জিডিপির ৬%

(১) দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, জিডিপির অনুপাতে শিক্ষাখাতে সরকারি বরাদ্দ সবসময় নিম্নগামী। লজ্জার বিষয়, তবে সত্য যে—শিক্ষাখাতে সরকারি বরাদ্দের নিরিখে আমাদের অবস্থান পৃথিবীর ১৮৯টি দেশের মধ্যে ১৮৮তম (জিডিপির ১.৫%; আমাদের তলায় আছে যুদ্ধবিধ্বস্ত দক্ষিণ সুদান)।[৫] আমরা যেখানে স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল হয়ে ভবিষ্যতে উন্নত দেশের তালিকায় প্রবেশ করতে চাই, সেখানে মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষাখাতে ব্যাপক সরকারি বিনিয়োগ করতেই হবে। এ লক্ষ্যে, আমরা যৌক্তিকভাবে আসন্ন বাজেটে শিক্ষাখাতে (আসলে সরকারি বাজেটে খাতটির নামকরণ "শিক্ষা ও প্রযুক্তি") বরাদ্দ (উন্নয়ন ও পরিচালন মিলিয়ে) এখনকার তুলনায় ১.৪০ গুণ বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি। **আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে আমরা শিক্ষা ও প্রযুক্তিখাতে মোট ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৪৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। একই সাথে এই বাজেটে নতুন উপখাত হিসেবে 'নারীর বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগ'-এর জন্য ২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করছি** (দেখুন, সারণি ৪)।

(২) সরকারি দলিলে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট খাতটির বাজেটীয় নাম 'শিক্ষা ও প্রযুক্তি'। আমরা মনে করি, এর পরিবর্তন দরকার। বাজেটে এখন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন নামে দুটি খাত আমরা প্রস্তাব করছি—প্রথম খাত হবে 'শিক্ষা ও গবেষণা', আর দ্বিতীয় খাত হবে 'প্রযুক্তি'।

---

[৫] দেখুন, UNDP 2020. Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st Century, পৃ. ৭-১৫, ২-৩৭

(৩) 'শিক্ষা ও প্রযুক্তি' খাতে 'কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ' নামে যে উপখাত আছে, তা 'কারিগরি শিক্ষা বিভাগ' এবং 'মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ' নামে আলাদা করা দরকার। সে অনুযায়ী আসন্ন বাজেটে বরাদ্দ ভিন্ন ভিন্নভাবে 'পরিচালন' ও 'উন্নয়ন' নামে থাকতে হবে। এ লক্ষ্যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য আমাদের বরাদ্দ প্রস্তাব 'কারিগরি শিক্ষা বিভাগে' ১৪ হাজার কোটি টাকা আর 'মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে' ৪ হাজার কোটি টাকা (দেখুন, সারণি ৪)।

শিক্ষা বাজেটে গতানুগতিকতার বাইরে বেরিয়ে চিন্তা

(১) এ যাবৎ বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি হয়েছে মূলত পুঁজি সঞ্চয়ন (capital accumulation) এবং শ্রমিক উপকরণের সম্প্রসারণ ও গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রগতিমুখী উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের কৌশল ও নীতির অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তবায়ন, মানবসম্পদের উন্নয়ন ও শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। এ জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ নিতে হবে, যার মধ্যে থাকবে:

(ক) সরকারগৃহীত "জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধাস্বত্ব নীতি-২০১৮"-এর আশুবাস্তবায়নে 'রোডম্যাপ' প্রণয়ন এবং তা কার্যকর করা।

(খ) প্রতিটি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে আবশ্যিকভাবে বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনমূলক গবেষণার জন্য সায়েন্স এবং ইনোভেশন ল্যাব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ এবং পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ প্রদান।

(গ) R & D এবং Innovation-এর ওপর গুরুত্ব দিয়ে নতুন প্রযুক্তি যথাযথভাবে ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানবসম্পদ উন্নয়ন। এ জন্য শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি।

(ঘ) চতুর্থ শিল্প বিপ্লব গভীরভাবে পর্যালোচনাপূর্বক শিক্ষানীতিসংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো।

(২) শিক্ষা বাজেটে অন্যান্য বরাদ্দের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য খেলার মাঠ, সাঁতার শেখার পুকুর, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দুপুরের খাবার, বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি, মেয়েদের বিজ্ঞান শিক্ষা, প্রযুক্তিঘর ইত্যাদি বিষয়ে অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে।

(৩) শিক্ষাসহ মানুষের স্বাস্থ্য, পরিবেশ-প্রতিবেশ—এসব নিয়ে গতানুগতিক বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এ লক্ষ্যে আমরা আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরে **"গবেষণা, উদ্ভাবন, বিচ্ছুরণ ও উন্নয়ন"** নামে সম্পূর্ণ নতুন একটি **মন্ত্রণালয়** গঠনের প্রস্তাব করছি, যে মন্ত্রণালয়ের জন্য ৩০ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করছি (দেখুন, সারণি ৪)।

শিক্ষাব্যবস্থার বিদ্যমান বৈষম্য, দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও মানের অবক্ষয় রোধ

শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যমান বৈষম্য, দুর্নীতি এবং মানের অবক্ষয় রোধের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ নিতে হবে:

(ক) শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা এমনভাবে বাড়াতে হবে, যাতে করে শুধু যোগ্য ও মেধাবী মানুষ শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট হন;

(খ) বেসরকারি সকল স্কুল (প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক) ও কলেজে—সরকারের এমপিওভুক্তি নির্বিশেষে—শিক্ষকদের বেতন-ভাতা-বোনাস প্রদানে কোনো ধরনের বৈষম্য করা যাবে না;

(গ) মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রগতিমুখী সংস্কারের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থার সাথে একীভূত করার কর্মসূচি গ্রহণ;

(ঘ) ক্যাডেট কলেজ পরিচালনায় প্রদত্ত সরকারি ভর্তুকি ধাপে ধাপে প্রত্যাহার এবং পর্যায়ক্রমে মূলধারার সাথে একীভূত করা;

(ঙ) নোটবই মুদ্রণ, বিক্রয় ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করা;

(চ) প্রাইভেট সেক্টরের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা; এবং

(ছ) কোচিং সেন্টার নিষিদ্ধ করা।

সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, নারীর জন্য কর্মমুখী বৃত্তিমূলক শিক্ষায় গতি বৃদ্ধি

সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, নারীর জন্য কর্মমুখী বৃত্তিমূলক শিক্ষায় গতি বৃদ্ধিতে জাতীয় বাজেটে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এসবের পাশাপাশি, বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে, কন্যা শিশুদের স্কুলমুখী করার জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি হবে যৌক্তিক।

প্রশিক্ষণব্যবস্থা

উন্নত-বৈষম্যহীন শোভন বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। বর্তমান সরকারি কর্মচারীদের প্রশিক্ষণব্যবস্থা বিদেশনির্ভর। অহেতুক বিদেশ ভ্রমণ ও প্রমোদের পরিবর্তে দেশেই সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যকর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে বাংলাদেশেই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা জরুরি। সাধারণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সব মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভাগ একই ছাতার নিচে প্রশিক্ষিত হতে পারে। প্রশাসনিক বিভাগীয় বিশেষজ্ঞ কাজের জন্য বিভাগীয় প্রশিক্ষণে স্থানীয় ও বিদেশি বিশেষজ্ঞের ব্যবহার স্থানীয় পর্যায়ে করা যেতে পারে।

বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, উপবৃত্তি, স্কুল ফিডিং কর্মসূচি

বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ২,০০০-৩,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন; ভৌগোলিকভাবে পিছিয়ে পড়া ও বস্তি এলাকা এবং নদী ভাঙ্গন ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় উপবৃত্তির সুবিধাভোগীর হার ১০০ শতাংশে উন্নীত করা এবং অতি দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি সার্বজনীনকরণের পদক্ষেপ এ বছরের বাজেটে থাকতে হবে।

বাংলা ভাষায় জ্ঞান চর্চা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়

মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চা মাতৃদুগ্ধসম (কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ)। একজন মানুষ যে 'ভাষায়' ভাবনা-চিন্তা করেন, যে ভাষায় স্বপ্ন দেখেন, যে ভাষায় দৈনন্দিন একে অপরের সাথে যোগাযোগ করেন ওই ভাষার সমৃদ্ধি ছাড়া দেশ ও জাতির সার্বিক সমৃদ্ধি, উন্নয়ন, প্রগতি, চিন্তাজগতের বিকাশ কোনোটিই সম্ভব নয়। আমাদের জন্য ভাষাটি 'বাংলা'। সুতরাং শিক্ষার সব স্তরে বাংলা ভাষাকে জ্ঞান-চর্চার মূল ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সে অনুযায়ী সমগ্র শিক্ষাকাঠামোকে ঢেলে সাজাতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে আমরা অন্য কোনো ভাষা শিখব না। অবশ্যই শিখব এবং উচ্চশিক্ষা স্তরে সব শিক্ষার্থীর জন্য কমপক্ষে দুটি বিদেশি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে। বলা প্রয়োজন যে পৃথিবীতে একটি দেশও পাওয়া যাবে না যে দেশটি কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় উন্নতি করেছে নিজের মাতৃভাষা বাদ দিয়ে ভিন্ন ভাষায় জ্ঞান চর্চা করে। বিষয়টি জাতির সামগ্রিক উন্নয়নে নীতিগত বিষয়। বিষয়টি বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি এবং সেক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর পরে আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে যেসব উপখাত-ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ উল্লেখ থাকা কাম্য, তা হলো: জাতীয় অনুবাদ ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা (যার প্রধান কাজ হবে বাংলা ভাষার বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারকে বিদেশি ভাষায় অনুবাদ এবং বিদেশি ভাষার জ্ঞানভাণ্ডারকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ এবং এসব জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়া), বাংলা উন্নয়ন বোর্ড গঠন (যার প্রধান কাজ হবে উচ্চশিক্ষাপর্যায়ে বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ, তবে বাংলা একাডেমি থাকবে), ব্যাপক হারে গণ-পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও তার বিস্তৃতি, সারা দেশে শিশুদের মন-মনন-স্বাস্থ্য বিকাশের জন্য বড় ক্যাম্পাসভিত্তিক শিশু একাডেমি প্রতিষ্ঠা, গ্রন্থ প্রকাশনাকে শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান ও সংশ্লিষ্ট প্রণোদনা দেওয়া, ছাপার কাগজের একচেটিয়া ব্যবসার খপ্পর থেকে প্রকাশকদের মুক্তি দেওয়া, লেখক চিকিৎসা তহবিল গঠন করা, সরকারি অর্থায়নে বই ক্রয় বৃদ্ধি এবং ক্রয়প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

৪.১৫ স্বাস্থ্যখাত: শোভন সমাজ বিনির্মাণে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ খাত

আমাদের দৃষ্টিতে মানুষের স্বাস্থ্য-সুস্বাস্থ্য—শোভন সমাজ বিনির্মাণে সবচেয়ে মৌলিক-গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ জন্য আমাদের দেশে মানুষের স্বাস্থ্য বৈষম্য-অসমতা-বঞ্চনা দূর করা জরুরি। আর মানুষের স্বাস্থ্য বৈষম্য-অসমতা দূর করার উদ্দেশ্যে আমাদের প্রধান-মৌলিক প্রস্তাব, জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে রাষ্ট্রের দায়দায়িত্ব এবং স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নসহ আসন্ন বাজেটসহ সরকারের উন্নয়নসংশ্লিষ্ট সব দলিলে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাবসমূহ নিম্নরূপ:

জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতে মৌলকরণীয়

(১) প্রধান-মৌলিক প্রস্তাব: রাষ্ট্রের পক্ষে সরকারকে (সরকারে যে-ই থাকুক না কেন) স্বীকার করতে হবে যে তারা সংবিধানের বিধি মোতাবেক জনগণকে কাঙ্খিত মাত্রায় স্বাস্থ্যসেবা—স্বাস্থ্য সুরক্ষা দিতে পারেননি।

(২) জনগণের স্বাস্থ্যকে বাজারের হাতে, বাজার অন্ধত্বের হাতে, বিকৃত মুক্তবাজারের হাতে—নির্বিচারে হস্তান্তর—করা ঠিক নয়।

(৩) জনগণের স্বাস্থ্যসহ পুরো জনস্বাস্থ্যব্যবস্থাকে বাজারের হাতে সোপর্দ করার যুক্তি থাকলে, সে যুক্তি জনসমক্ষে উপস্থাপন করতে হবে এবং একই সাথে এ নিয়ে নাগরিক সমাজের সাথে সিরিয়াস তর্ক-বিতর্ক-সংলাপ করতে হবে।

(৪) সরকার যদি প্রমাণ করতে পারেন যে জনগণের স্বাস্থ্য বাজারের হাতে সোপর্দ করা যুক্তিযুক্ত হয়েছে, সেক্ষেত্রে সংবিধানের সেইসব অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করতে হবে, যেখানে স্পষ্ট লেখা থাকবে যে "স্বাস্থ্য—মৌলিক অধিকার নয় এবং জনগণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান রাষ্ট্রের দায়িত্ব নয়। এ দায়িত্ব বাজারের ইত্যাদি"। তবে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে রাষ্ট্রের দায়িত্বসংশ্লিষ্ট বর্তমান সংবিধানের বিধানসমূহ সাধারণ কোনো বিধান নয়, তা *"রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি"*র অংশ, বিধায় তা পরিবর্তন করতে হলে জনগণের সম্মতি নিতে হবে।

(৫) স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দকে ব্যয় হিসেবে নয়, বিনিয়োগ হিসেবে ঘোষণা দিতে হবে। স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বরাদ্দকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যখন উৎপাদনশীল বিনিয়োগের সাথে তুলনা করছে, তখন আমাদের দেশে এই খাত উত্তরোত্তর অধিক হারে বাজারের হাতে সমর্পণ করার মহাবিপজ্জনক প্রবণতা যথেষ্ট মাত্রায় জোরদার হচ্ছে—রাষ্ট্রীয় আয়োজনে কিংবা রাষ্ট্রের সহায়তায়। সমাজের বিত্তশালী অংশ এবং মধ্যবিত্তরা সুচিকিৎসার আশায় বিদেশে ছুটছেন কিংবা ব্যয়বহুল প্রাইভেট ক্লিনিকে আশ্রয় নিচ্ছেন। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো স্বল্প বরাদ্দ, দুর্নীতি, অব্যবস্থা, অবহেলা, অসদাচরণ ও জরাজীর্ণতার প্রতীক হয়ে আছে—যা বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণের জন্য মারণাঘাতের শামিল। এ অবস্থায় একবিংশ শতকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এখন শুধু প্রাইমারি হেলথ কেয়ার অর্থাৎ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার কথা বললে হবে না, বলতে হবে দ্বিতীয় স্তর (secondary health care) ও উচ্চতর ও বিশেষায়িত (tertiary and specialized) স্বাস্থ্যসেবার কথা। আসন্ন বাজেটসহ ভবিষ্যতের সব বাজেটে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাতের অগ্রাধিকার এবং বেসরকারি-প্রাইভেট স্বাস্থ্যখাতের যৌক্তিক সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি গুরুত্বসহ বিবেচনা করে সুর্নিদিষ্ট পথনির্দেশনা আমরা আশা করছি।

(৬) **কভিড-১৯ প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা বিচার-বিশ্লেষণ করে স্বাস্থ্যখাতে "জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা" নামে নতুন একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠার জন্য ৮ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করছি (৫ হাজার কোটি টাকা উন্নয়ন বরাদ্দ ও ৩ হাজার কোটি টাকা পরিচালন বরাদ্দ) (দেখুন, সারণি ৪)। প্রস্তাবিত 'জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা বিভাগ' যেসব বিষয় নিয়ে কাজ করবে, তার মধ্যে থাকবে: জীবজন্তু প্রাণিবাহিত রোগ, বায়োসিকিউরিটি, বায়োসেফটি, রোগ নির্ণয় ও রিপোর্টিং, সমন্বিত ডেটাবেজ, র‍্যাপিড রেসপন্স, জনস্বাস্থ্য সিস্টেম প্রতিষ্ঠা, জীবাণু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও যন্ত্রপাতি, জনস্বাস্থ্য ইমারজেন্সি মোকাবিলায় দক্ষতা এবং সবধরনের টিকাসংশ্লিষ্ট গবেষণা ও উৎপাদন, প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা, মানসিক স্বাস্থ্য।**

(৭) স্বাস্থ্যখাতকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিচারে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনা করে এ খাতে সরকারি ব্যয়-বরাদ্দ চলতি বছরের বাজেটের তুলনায় আমরা ১.৬০ গুণ বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি। স্বাস্থ্যখাতে আমাদের প্রস্তাবিত বরাদ্দ ৪৭ হাজার কোটি টাকা (দেখুন, সারণি ৪)। উল্লেখ্য, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যখন বলছে যে একটি মানসম্মত স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্য

স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ হওয়া উচিত জিডিপির ৫ শতাংশ, সেখানে গত বছর এই খাতে সরকারের বরাদ্দ ছিল জিডিপির মাত্র ০.৪৭ শতাংশের সমপরিমাণ (অর্থাৎ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশের চেয়ে ৫ গুণ কম)।

দারিদ্র্যের রোগ নির্ণায়ক উপখাতসমূহে বরাদ্দে প্রাধান্য প্রদান

আমাদের প্রস্তাব হলো, স্বাস্থ্যখাতে "দারিদ্র্যের রোগ" (diseases of poverty) নির্ণায়ক উপখাতসমূহে বরাদ্দ প্রাধান্য দেওয়া হোক। এসব রোগের অন্তর্ভুক্ত যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, প্রজননতন্ত্রের রোগ, জন্মদানপ্রক্রিয়ায় মা ও শিশুর রোগ, শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, ডায়েরিয়া, হাম, এবং আর্সেনিকোসিস। বিষয়টি ভবিষ্যৎ জনস্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, অনতিবিলম্বে দারিদ্র্যের রোগ হ্রাস করতে না পারলে ভবিষ্যৎ সরকার ও পরিবার—উভয়েই স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে বাধ্য হবে। ফলে দরিদ্র মানুষ দরিদ্রতর হবে, আর মধ্যবিত্ত মানুষের বিত্তের অধোগতি হতে বাধ্য। এসবের ফলে সমাজে বৈষম্যও বাড়বে।

মাতৃমৃত্যু হ্রাস

মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন-এর লক্ষ্যে আমাদের দেশে মাতৃমৃত্যু সংখ্যা ১৯৯০ সালের ৫৭৪ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ১৪৩-এ (প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে/ প্রসবে) নামিয়ে আনার কথা। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী আমাদের দেশে ২০১৭ সালে মাতৃমৃত্যু হার ছিল ১৭৩ (প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে)। সংশ্লিষ্ট এই খাতে সরকারের সর্বশেষ বাজেট বরাদ্দ ছিল আনুমানিক ২৮৬ কোটি টাকা। কিন্তু মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নসহ মাতৃমৃত্যু কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কমিয়ে আনার জন্য প্রয়োজন বছরে কমপক্ষে আনুমানিক ৫০০ কোটি টাকা। সে জন্য আমাদের প্রস্তাব এ খাতে সরকারি চলমান বরাদ্দের তুলনায় তিনগুণ বেশি বরাদ্দ দেওয়া হোক। বিকল্প বাজেটে আমরা সেটাই প্রস্তাব করছি।

মাতৃদুগ্ধের অপরিহার্যতা

(১) শিশুদের জীবনসমৃদ্ধির জন্য মায়ের দুধের কোনোই বিকল্প নেই। যে কারণে একদিকে যেমন নবজাতক শিশুদের জন্য "শুধু মায়ের দুধ" (exclusive breast feeding) নিশ্চিত করতে সবধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে, তেমনি অন্যদিকে মায়ের দুধের বিকল্প হিসেবে যেসব গুড়ো দুধ বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়, আমরা তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার পক্ষে—প্রাকৃতিক কারণেই।

(২) মায়ের দুধের কোনোই বিকল্প থাকতে পারে না এবং মায়ের দুধ (শালদুধসহ) একজন নবজাতক শিশুকে প্রায় সবধরনের রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখার প্রতিরোধ ক্ষমতা নিশ্চিত করে—এ কথা সরকারিভাবে স্বীকার করতে হবে এবং সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বাজেট খাতে তা প্রতিফলিত হতে হবে।

শিশুর অকাল মৃত্যু রোধ

(১) আমাদের দেশে শিশুর জন্মের ১ দিনের মধ্যে, জন্মের ৭ দিন এবং জন্মের ২৮ দিনের মধ্যে মৃত্যুহার তুলনামূলক অত্যুচ্চ। অথচ এই অতি-অকাল মৃত্যু রোধ করা শুধু যে সম্ভব তা-ই

নয়, তা স্বল্প ব্যয়েই সম্ভব। আর শিশুদের এই অতি-অকাল মৃত্যু রোধ করতে পারলে ওই শিশু সুস্থ-দীর্ঘ জীবন পাবে। স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট এই উপখাতে আমরা ২৫০ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করছি।

(২) শিশুর অকাল মৃত্যু রোধ-উদ্দিষ্ট বরাদ্দের গন্তব্যস্থল হতে হবে প্রধানত জেলাশহরের হাসপাতাল, উপজেলা হাসপাতাল, ইউনিয়নপর্যায়ের হাসপাতাল এবং কমিউনিটি ক্লিনিক।

নবজাতক শিশুর স্ক্রিনিং সেবা

নবজাতক শিশুদের অনেকেই হাইপোথাইরয়েডইজম-এ আক্রান্ত হয়ে শেষপর্যন্ত পঙ্গুত্ব বরণ করে এবং তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথচ নিউবর্ন স্ক্রিনিং সেবা একদিকে যেমন সাশ্রয়ী, তেমনি অন্যদিকে এই সেবা (পরীক্ষা) প্রদানে তেমন প্রশিক্ষিত কর্মীরও প্রয়োজন হয় না। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতে কর্মরত মাঠকর্মীরাই এই সেবা প্রদানে সক্ষম। নবজাতক শিশুর থাইরয়েড স্ক্রিনিং খাতে এ বছর প্রাথমিকভাবে আমরা ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করছি। সেইসাথে বিষয়টির গুরুত্বের কারণে আমাদের প্রস্তাব হলো নবজাতক শিশুর স্ক্রিনিং সেবা বিষয়টি স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ করা হোক।

পুষ্টি

এতদিন ধরে মোট খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ-এর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং তদনুযায়ী মোট ক্যালরি হিসেব করা হয়েছে এবং তারই ভিত্তিতে দরিদ্র-অদরিদ্র পরিমাপ করা হয়েছে (যেমন একজন ব্যক্তি যদি প্রতিদিন ২১২২ কিলোক্যালরির কম খাদ্য গ্রহণ করেন তিনি হবেন দরিদ্র, অন্যথায় অদরিদ্র)। এসব হিসেবে পুষ্টিগুণের বিচার নেই। খাদ্য গ্রহণের এসব হিসেবপত্তর বিজ্ঞানসম্মত নয়। আমাদের প্রস্তাব:

(১) খাদ্য গ্রহণের নিরিখে একজন ব্যক্তির প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ করতে হবে পুষ্টি দিয়ে। বিষয়টি বাজেটে প্রতিফলিত হতে হবে এবং সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট খাত-উপখাতে ব্যয় বরাদ্দ দিতে হবে।

(২) পুষ্টি বিষয়ে বিশেষভাবে জোর দিতে হবে দরিদ্র-বঞ্চিত-অবহেলিত মা, বিশেষত গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে (গর্ভকালীন ও প্রসবপরবর্তী—উভয় সময়েই) এবং দুর্যোগের সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত সবার ক্ষেত্রে।

(৩) শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য বিষয়টি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট খাত-উপখাতে যথেষ্ট পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

নিরাপদ-ভেজালমুক্ত খাদ্য

ভেজালহীন, নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য সরকারিভাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান গড়া, জোরদার করা এবং তা প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। গবেষণায় প্রমাণিত যে, দীর্ঘদিন বিষাক্ত-ভেজাল খাদ্য গ্রহণের ফলে গর্ভবতী মা ও তার গর্ভে ভ্রূণের ক্ষতি হয়, সন্তানও ক্যানসার-কিডনি-লিভারসহ মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, জন্ম হয় বিকলাঙ্গ শিশু, গর্ভস্থ শিশুর

স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ও প্রতিবন্ধী হওয়ার আশঙ্কা বাড়ে—এসব ঝুঁকি হতে পারে ভয়াবহ ও বংশপরম্পরা। গবেষণা এও বলছে, খাদ্য বিষমুক্ত-ভেজালমুক্ত করা গেলে ক্যানসার রোগীর সংখ্যা ৫০ শতাংশ কমানো সম্ভব। ভেজাল খাদ্য, অনিরাপদ খাদ্য ও গুণমানহীন খাদ্য একদিকে যেমন বহু ধরনের অসুখ-বিসুখের প্রধান কারণ, তেমনি তা ক্রমবর্ধমান আয়ুষ্কালে অসুস্থ-জীবন ও সমৃদ্ধিহীন দীর্ঘায়ুরও প্রধান কারণ। নিরাপদ, ভেজালমুক্ত, মানসম্মত খাদ্যপ্রাপ্তির বিষয়টি বাজেটে যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা

(১) সুপেয় পানি (খাওয়ার) ও স্যানিটেশন (স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনসহ) জনস্বাস্থ্যের অন্যতম প্রধান নির্দেশক। এ দুই উপখাতে বরাদ্দ চলতি অর্থবছরে আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। তা অনেক বাড়াতে হবে। এ দুই উপখাতের জন্য বাজেটে ভিন্ন লাইন-আইটেম থাকা জরুরি।

(২) সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের দলিলই বলছে, বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ আর্সেনিকোসিস রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কার মধ্যে থাকেন। আর খাবার পানির অর্ধেক (৫০%) আর্সেনিক অথবা ই-কোলাই ব্যাকটেরিয়াযুক্ত। ভূগর্ভস্থ পানির আর্সেনিকদূষণ একটি নীরব ঘাতক এবং অত্যন্ত বড় মাপের জনস্বাস্থ্য বিপর্যয়মূলক ইস্যু। কিন্তু, সে তুলনায় আর্সেনিকমুক্ত সুপেয় পানি সরবরাহের কর্মসূচি এ পর্যন্ত তেমন গুরুত্ব পায়নি। আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের লক্ষ্যে আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকাসমূহে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. আবুল হুসসাম আবিষ্কৃত সনোফিল্টারের সহজলভ্যতাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বাজেটে উল্লেখ এবং সে অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

(৩) দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে খাওয়ার পানির লবণাক্ততা সমস্যা সমাধান না করতে পারলে এসব অঞ্চলের মানুষের সুস্বাস্থ্য ও জীবনসমৃদ্ধি কোনো দিনই উন্নত হবে না। এ সমস্যা সমাধানে বাজেটে সময়-নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনাসহ প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

৪.১৬ শিল্পখাত

এ কথা সত্য যে মুক্তিযুদ্ধের পরপরই আমরা শিল্পায়নমুখী হওয়ার চেষ্টা করেছি এবং সেটাও প্রচলিত পন্থার শিল্পায়ন নয়—রাষ্ট্রায়ত্ত জাতীয়করণকৃত খাতের ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যার পরবর্তীকালে (১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের পরে) বৈশ্বিক আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির কাছে আত্মসমর্পণ করে (যে জন্য মুক্তির মতাদর্শসহ বঙ্গবন্ধুকেই হত্যা করা হলো) নব্য-উদারবাদী মতাদর্শের সামনে নতজানু হয়ে সবকিছু বিরাষ্ট্রীকরণ ও ব্যক্তিমালিকানা ব্যবস্থার হাতে সোপর্দ করেও শিল্পায়নপ্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে পারিনি। যাও বা হয়েছে তা আবার শিল্পের নামে ধনী দেশ থেকে স্থানান্তরিত ও উচ্ছেদিত প্রকৃতি-পরিবেশবিধ্বংসী কিছু শিল্প, স্বাস্থ্য বিপর্যয়কর কিছু শিল্প, উচ্ছিষ্ট শিল্প, সস্তা শ্রম শোষণভিত্তিক অতিশোষণকারী কিছু শিল্প—যা ক্রমবর্ধমান হারে বৈষম্য উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করে এবং যার স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদি কোনো

ধনাত্মক সামাজিক মূল্যই নেই। তাহলে সম্ভবত এ কথা বলা যায় যে বঙ্গবন্ধু হত্যাপরবর্তীকালে বিগত ৪৭ বছরে বাংলাদেশে যতটুকুই শিল্প গড়ে উঠেছে, তা কোনো অর্থেই 'কল্যাণ শিল্প নয়' তা মানুষের জীবনের জন্য "বিপর্যয়কর শিল্প" এবং খুব ভালো হয়েছে যে ওই শিল্প এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট সংখ্যায় ও মাত্রায় গড়ে ওঠেনি। এর অর্থ এই নয় যে আমরা শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ার বিরোধী, উল্টো আমরা শিল্প চাই—চাই শিল্পায়ন-জনকল্যাণকামী পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন। আর সে লক্ষ্যেই আমাদের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

শিল্পায়নের মৌলভাবনা ও করণীয়

(১) (প্রধান মৌলিক প্রস্তাব) আমরা এমন শিল্পায়ন চাই না, যা ব্রিটেনে শিল্পায়নের মতো গ্রাম থেকে মানুষ খেদিয়ে সেখানে ভেড়ার দল পুষবে (ব্রিটিশ শিল্পায়নে ঘেরাও মুভমেন্ট, enclosure movement, ম্যানর পদ্ধতি)। আমরা চাই মানবকল্যাণকামী শিল্পায়ন, যা মানুষকে উচ্ছেদ করবে না—মানুষকে তার শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করবে না এবং একই সাথে যা কখনও কোনো অবস্থাতেই প্রকৃতিবিধ্বংসী হবে না, মানুষের শরীর-স্বাস্থ্য-মন-মনন বিধ্বংসের কারণ হবে না, বৃহত্তর ও সম্ভাব্য দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক স্বার্থবিরোধী হবে না।

(২) শিল্পায়ন হতে হবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে অথবা শ্রমিকদের সমবায়ী উদ্যোগে—যৌথ উদ্যোগে। অর্থাৎ শিল্পের মালিক হবেন তারা, যারা শিল্পে শ্রম দেবেন—মেহনত করবেন। শিল্পকারখানার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়দায়িত্ব কাকে দেওয়া হবে তা নির্ধারণ করবে শ্রমিকদের পক্ষে রাষ্ট্র এবং/ অথবা শ্রমিকদের সমবায়ী-যৌথ উদ্যোগ।

(৩) যেকোনো পথ-পদ্ধতি-পন্থা অবলম্বনে বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতার কোনো প্রয়োজন নেই। এ প্রতিযোগিতা প্রকৃতিকে ক্ষয় করে, ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তাকে বিনষ্ট করে, সমাজকে ক্ষয় করে, বিশ্বে মানুষে-মানুষে ভেদ সৃষ্টি করে—এ প্রতিযোগিতা অন্যায্য, অনৈতিক, অন্যায় ও অশুভ।

(৪) শিল্পায়নের শুরুটা হালকা শিল্প দিয়ে হলেও যথাসম্ভব দ্রুত ভারী শিল্পের দিকে (অর্থাৎ যন্ত্র দিয়ে যন্ত্র বানানোর শিল্প) যেতে হবে।

(৫) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা artificial intelligence-সংশ্লিষ্ট সবধরনের শিল্প (জ্ঞানচর্চা ও গবেষণাগার থেকে শিল্প উৎপাদন পর্যায় পর্যন্ত) উদ্যোগ হতে হবে বুদ্ধিদীপ্ত সৃজনশীল এবং ভবিষ্যৎ সামাজিক সুফল-বিবেচনা উদ্ভূত।

(৬) সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যেন মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য উৎপাদনসহ হালকা শিল্প ও ভারী শিল্পের মধ্যে ভারসাম্য ঠিক থাকে। এ জন্য নিয়মিত-ক্রমাগত-লাগাতার "গবেষণা, উদ্ভাবন, বিচ্ছুরণ ও উন্নয়ন বিনিয়োগ" (RID & D investment) বাড়াতে হবে। কারণ ভারসাম্যকরণ বিষয়টি জটিল, যার সুনির্দিষ্ট কোনো ফর্মুলা নেই এবং একই সাথে সমাজ বিকাশপ্রক্রিয়া স্থির বিষয় নয়—তা নিয়তগতিশীল।

(৭) মানবকল্যাণ-উদ্দিষ্ট শিল্পায়ন শুধু শিল্পজনিত বৈষম্য-অসমতা-দারিদ্র্যই দূর করবে না—তা দূর করবে সংশ্লিষ্ট বহুমুখী বৈষম্য-অসমতা-দারিদ্র্য।

(৮) মানবকল্যাণ-উদ্দিষ্ট শিল্পায়ন শিল্পপণ্য ও কৃষিপণ্যের মধ্যে মূল্যের ভারসাম্য নিশ্চিত করবে (যে ভারসাম্য কখনও ছিল না), যা সমান শ্রমের সমান মূল্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে কৃষি-অকৃষি কৃত্রিম ভেদ দূর করবে।

(৯) প্রাথমিকপর্যায়ের শিল্পায়ন হতে হবে দেশের অভ্যন্তরীণ মোট চাহিদা (domestic aggregate demand) মেটানোর লক্ষ্যে, আর যে চাহিদা হবে মূলত মানুষের বিকাশমান যৌক্তিক মৌলিক চাহিদা। এখানে মনে রাখা জরুরি যে বাংলাদেশের (এখনকার) ১৭ কোটি মানুষের (ভবিষ্যতে আরো কয়েক কোটি বাড়বে) মৌলিক চাহিদা কম নয়– 'প্রকৃতিকে না ঘাঁটিয়ে' প্রত্যেকের জন্য গুণমানসম্মত অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কাজ, বিশ্রাম, বিনোদন, অবকাশ, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যের শিল্পায়ন। এসবই যথেষ্ট বড় মাপের নিরন্তর সৃজনশীল কর্মকাণ্ড।

(১০) শিল্পায়নপ্রক্রিয়ায় "নির্বিচার প্রবৃদ্ধি" (indiscriminate growth) বিষয়টি মুখ্য বিষয় বলে বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই। কারণ 'প্রবৃদ্ধি' কোনো কিছুরই কারণ (cause) নয়, তা পরিণাম (effect)। 'পরিণামের' ভালো-মন্দ, শুভ-অশুভ, মঙ্গল-অমঙ্গল সবকিছুই নির্ধারিত হয় 'কারণ' দিয়ে—নীতি প্রণয়নে এ কথা মাথায় রাখতে হবে।

(১১) শিল্পায়নপ্রক্রিয়ায় দেশজ কৃষিভিত্তিক (জমি-কৃষি, জলা-কৃষি ও জঙ্গল-কৃষি, শস্য-কৃষি সৃষ্টি, প্রাণিসম্পদ) বিষয়াদি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

(১২) শিল্পায়নপ্রক্রিয়ায় দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ—জমি-জলা-জঙ্গলসহ তেল-গ্যাস-কয়লা, সূর্যের আলো-তাপ, বাতাস, আকাশ, মহাকাশ—সবকিছুর সুবিবেচনাপ্রসূত ব্যবহার নিয়ে (ক্ষয় নয়) ভাবতে হবে।

(১৩) শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় এমন কোনো নীতি গ্রহণ করা যাবে না, যার দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক অভিঘাত ঋণাত্মক।

(১৪) শিল্পায়ন হতে হবে দেশজ, আর দেশজ শিল্প সুরক্ষার জন্য যত ধরনের সংরক্ষণবাদী-সুরক্ষাবাদী নীতি আছে, তা গ্রহণ করতে হবে।

(১৫) উল্লিখিত প্রধান মৌলিক প্রস্তাবের (প্রস্তাব-১) ভিত্তিতে অন্য ১৩টি প্রস্তাব মেনে 'শিল্পায়ন নীতি' (industrialization policy) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এসবই রাষ্ট্রের মতাদর্শগত বিষয়, যা "মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও আলোকিত সমাজ বিনির্মাণ" নীতি-আদর্শ না মেনে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। (এখনও যেহেতু রাষ্ট্র এসব খুব মান্য করে না এবং নীতিনির্ধারকেরা এসব আমলে নেন না, সেহেতু বর্তমান অবস্থাতেই যত দূর সম্ভব—সেসব বিষয়ে আমরা এর পরে সুপারিশ প্রস্তাব করছি)।

শিল্পনীতির সংস্কার

রূপকল্প ২০২১, রূপকল্প ২০৪১, এসডিজি ২০১৫-৩০, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে বিবেচনায় রেখে শিল্প নীতি ঢেলে সাজিয়ে তা উপরোল্লেখিত দেশজ শিল্পায়ন নীতিতে রূপান্তরিত করতে হবে।

আমদানীমুখী উন্নয়ন কৌশলের বিপরীতে উৎপাদন ও রপ্তানীমুখী উন্নয়ন কৌশল

(১) মুক্তবাজার ও অসম বিশ্বায়নের তোড়ে জাতীয় অর্থনীতি রক্ষার জন্য আমদানিমুখী উন্নয়ন কৌশলের বিপরীতে উৎপাদন ও রপ্তানিমুখী উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা যৌক্তক। এ কৌশল কীভাবে আরো শক্তপোক্ত করা যায়, সে বিষয়ে আসন্ন বাজেটসহ উন্নয়ন দলিলে নিদের্শনা দরকার।

(২) কভিড-১৯ এবং ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ উদ্ভূত সাপ্লাই চেইন চ্যালেঞ্জ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে, বাস্তবতার নিরিখে, রপ্তানিমুখী উন্নয়ন কৌশলের সাথে শিল্পের ব্যাকওয়ার্ড-ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজ বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হবে।

(৩) আমাদের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৪০ শতাংশ আমদানিনির্ভর। আর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, যুদ্ধবিগ্রহ, টাকার বিনিময় হারের নিম্নগামিতাসহ অনেক কারণেই আমদানি ব্যয় বাড়ছে। রপ্তানি আয়ে আমদানিনির্ভরতা কমাতে হবে। এ জন্য আমদানি-রপ্তানি শুল্ক নিয়ে বাজেটে সংশ্লিষ্ট ভাবনা ও নির্দেশনা জরুরি।

শিল্পায়ন ত্বরান্বয়নে বিদ্যুৎ ও জ্বালানিখাত

(১) শিল্পায়নসহ অর্থনীতির কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে বিদ্যুৎখাতের অবকাঠামো নির্মাণ ও তা চলমান রাখা জরুরি। এ খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণব্যবস্থা টেকসই রাখার লক্ষ্যে বিদ্যমান সমস্যাগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে অনেক বিনিয়োগ প্রয়োজন। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় তুলনামূলকভাবে কম (তবে এক্ষেত্রে পরিবেশগত সমস্যা ব্যাপক), তেলভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ এবং গ্যাসভিত্তিক অনেক কম। যেহেতু গ্যাসের মজুদ কম, কয়লাভিত্তিক বড় আকারের বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন অর্থনৈতিকভাবে সাশ্রয়ী হবে (তবে, পরিবেশগত ঋণাত্মক প্রভাব বিবেচনা না করে কিছু করা সমীচীন হবে না)। পরিবেশগত বিবেচনায় রিনিউয়েবল এনার্জি সবচেয়ে কাম্য। এ বিষয়ে সরকারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

(২) বাংলাদেশ বিদ্যুৎসঞ্চালন অবকাঠামো দুর্বল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ (ঘূর্ণিঝড়) ও দুর্ঘটনাপ্রবণ বাংলাদেশে সঞ্চালনব্যবস্থা প্রতিনিয়ত ঝুঁকির মধ্যে থাকে। এক্ষেত্রে তুলনামূলক ব্যয়বহুল হলেও আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক সঞ্চালন ব্যবস্থা গড়ে তোলা দীর্ঘ মেয়াদে সুফল বয়ে আনবে। সঞ্চালন ব্যবস্থা শক্তিশালী ও টেকসই করার জন্য সংশ্লিষ্ট খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ এখনকার তুলনায় যুক্তিসংগতভাবে বাড়াতে হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রিড লাইনের উন্নয়ন-বিনিয়োগ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(৩) দেশের সার্বিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনার আর্থিক ও কারিগরি প্রক্ষেপণ এবং অডিট প্রচলন জরুরি। একদিকে গ্রিড বিপর্যয়ে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ এবং অন্যদিকে সমাজ-অর্থনীতির ওপর এর প্রভাব নির্ণয় অপরিহার্য। অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততর করতে আমরা বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিদ্যুৎ বিতরণ খাতে আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট ৩০ হাজার

১২২ কোটি টাকা বরাদ্দের সুপারিশ করছি (সারণি ৪)। তবে বরাদ্দসমূহ কীভাবে কাজে লাগানো হবে বাজেটে তার দিকনির্দেশনা থাকতে হবে।

(৪) তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে বাপেক্স-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্যাস-উন্নয়ন তহবিল গঠনের হাল অবস্থা বাজেটের মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করা প্রয়োজন।

শিল্প উদ্যোক্তা, অর্থায়ন, বিনিয়োগ

(১) স্থানীয় শিল্প উদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে সহায়তায় রাজধানী ও শহরাঞ্চলের ওপর জনসংখ্যার চাপ কমানোর লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে "অর্থনৈতিক অঞ্চল" প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। এ পদক্ষেপ দেশে সামাজিক ও ভৌগোলিক—আঞ্চলিক বৈষম্য নিরসনে সহায়ক হতে পারে, যদি শিল্পায়ন নীতি জনগণের কল্যাণে প্রণয়ন করা হয় (যেটা আমাদের **প্রধান প্রস্তাব**)।

(২) দেশের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নের স্বার্থে আমাদের প্রধান প্রস্তাবের আলোকে সরকারের প্রতিশ্রুত ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগের পাশাপাশি পরিকল্পিতভাবে দক্ষ শ্রমিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্র প্রাধিকারভিত্তিক বিবেচনায় নিতে হবে।

(৩) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি করা জরুরি এ জন্য প্রয়োজনে পরিকল্পিতভাবে শিল্পপার্ক গড়ে তোলা যেতে পারে।

(৪) শিল্পপার্কে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনে অগ্রাধিকার যৌক্তিক হবে।

(৫) দেশে শিল্প অর্থায়নের প্রতিষ্ঠানসমূহকে সরকারি বাজেট বরাদ্দ থেকে দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প অর্থায়নের ব্যবস্থা করা জরুরি। বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড দেশের শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

(৬) বিনিয়োগ উন্নয়ন অথরিটির (বিডা) বর্তমান কাঠামো দেশে বিনিয়োগ আকর্ষণে কত দূর পারঙ্গম, তা খতিয়ে দেখা জরুরি। বাস্তবতার নিরিখে বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য বিনিয়োগ উন্নয়ন অথরিটি ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার নিয়ে ভাবতে হবে।

(৭) ব্যাংকিং ব্যবস্থায় দেশের ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে বর্তমানে আইএমএফতাড়িত নব্য-উদারবাদী মুদ্রানীতি চালু আছে। আমাদের মতে, বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কার, বিনিয়োগবান্ধব মুদ্রানীতি ও বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা বিনিয়োগবান্ধব করা দেশের উন্নয়নের স্বার্থে জরুরি।

৪.১৭ নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশুর বিকাশ

নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশুর বিকাশসম্পর্কিত গভীর গবেষণার ভিত্তিতে আমরা কয়েকটি সুপারিশ উত্থাপন করছি। এসব সুপারিশ একদিকে যেমন দীর্ঘমেয়াদি নীতি পরিবর্তনমূলক ও সংস্কারমূলক, অন্যদিকে আশু-স্বল্পমেয়াদি আসন্ন বাজেটসহ নীতিনির্ধারণী দলিলে অন্তর্ভুক্তিযোগ্য। আমাদের বেশকিছু প্রস্তাব এক

বাজেটে বাস্তবায়ন হওয়ার নয়—কিন্তু আমরা মনে করি, কভিড-১৯-এর মহাবিপর্যয়টি আমাদের সমাজ-অর্থনীতিতে যে বহু ধরনের পরিবর্তন সাধন করেছে এবং করবে, সেসব বিবেচনায় রাখতে হবে—

নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশুর বিকাশ—মৌলভাবনা ও করণীয়[৬]

(১) প্রধান মৌলিক সুপারিশ: নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশুর বিকাশসম্পর্কিত মৌলনীতি হিসেবে স্বীকার করতে হবে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টি সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, নৈতিক মানদণ্ডে যুক্তিযুক্ত হলেও প্রধান যুক্তি হলো—প্রাকৃতিক (natural reasoning), এবং একই সাথে স্বীকার করে নিতে হবে যে, জীবনে শিশুর বিকাশের সুযোগ থাকে মাত্র একবার—শিশুর বিকাশ শুরু হয় মাতৃগর্ভে, শিশুর বিকাশ নির্ভর করে নারীর ক্ষমতায়নের ওপর। মায়ের পুষ্টিমান বৃদ্ধির কোনোই বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে নীতি প্রণয়ন ও যথেষ্ট বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

(২) রাষ্ট্রকে স্বীকার করতে হবে যে নারীর বহুমুখী ক্ষমতায়ন বিষয়টি সার্বজনীন; তবে দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্ন মধ্যবিত্ত নারী যেহেতু সবচেয়ে ভঙ্গুর ও অরক্ষিত, সেহেতু এই বর্গে নারীর ক্ষমতায়ন সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকারযোগ্য ক্ষেত্র।

(৩) রাষ্ট্রকে স্বীকার করতে হবে যে বিদ্যমান আর্থসামাজিক কাঠামোতে পিতৃতান্ত্রিক ও সামন্ত মানসিকতার পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নে শক্তিশালী প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে সম্পদ-সম্পত্তিতে নারীর কার্যকর অধিকারহীনতা।

(৪) নারীর সকল গৃহস্থালি কর্মকাণ্ডকে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। নির্মোহ হিসেব করে স্বীকার করতে হবে যে দেশজ উৎপাদনে নারীর অবদান ২০-২৫ শতাংশ নয়, তা কমপক্ষে ৪৮-৫০ শতাংশ। এ বিষয়ে হিসেবপত্তরের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে দায়িত্ব দেওয়া সমীচীন (কারণ তারাই আদমশুমারিসহ খানার আয়-ব্যয় জরিপকাজ করে থাকে)। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পক্ষ থেকে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এ জন্য যে, তিনি ইতিমধ্যে নারীর কর্মযজ্ঞকে মোট দেশজ উৎপাদনে অন্তর্ভুক্তির নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশনার নৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

(৫) কভিড-১৯-এর মহামন্দা-মহাবিপর্যয়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন দেশের দরিদ্র-চরম দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত খানার নারী—এ কথা স্বীকার করে সব আর্থসামাজিক উন্নয়ন দলিলে (আসন্ন বাজেটসহ) সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মপদ্ধতির পথনির্দেশনা থাকতে হবে।

(৬) বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং কিশোরী গর্ভধারণের হার কমাতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। এ দুই খাতে পৃথক বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

---

৬ এসব সুপারিশ-করণীয়র উৎস: বারকাত, আবুল (২০২০), বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে, ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা। পৃ. ৪০৬-৪১২।

(৭) উল্লিখিত ৬টি মৌলভাবনা ও উত্থাপিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে 'শোভন জীবনব্যবস্থা'র লক্ষ্যে প্রণয়ন করতে হবে নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশুর বিকাশের জাতীয় নীতি। এবং সময়নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

নারীর ক্ষমতায়ন-উন্নয়ন কর্মসূচি

(১) জাতীয় উন্নয়ন বাজেটে নারীর সার্বিক উন্নয়নের বিষয়াদি সুস্পষ্ট উল্লেখপূর্বক নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় একীভূত করতে হবে। এ লক্ষ্যে সবার আগে নারীর মৌলিক অধিকারসমূহ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ জাতীয় বাজেটেসহ সব উন্নয়ন দলিলে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তার বাস্তবায়নপ্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। এই প্রয়াসে দরিদ্র নারী ও শিশুর অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান, পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তা, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিসহ জীবনধারণের সব মৌলিক চাহিদার সরবরাহ নিশ্চিত হবে। নারীর সামাজিক নিরাপত্তা, সমতা এবং ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে উদ্দেশ্য-নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট-সহজবোধ্য বড় মাপের বরাদ্দসহ সময়-নির্দিষ্ট পথনির্দেশনা থাকতে হবে।

(২) নারী-উদ্দিষ্ট (gender sensitive) কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে তা সবিস্তার উন্নয়ন বাজেটে উল্লেখ করতে হবে। এ ধরনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নারীদের শোভন কর্মসংস্থান, ন্যায্য মজুরি-ভাতা-ছুটি-অবসর-বিনোদন, কর্মজীবী নারীর আবাসন, রেশন, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, নারীর জন্য পলিটেকনিক ও ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, আশ্রয়, বিধবা ভাতা, সন্তানদের শিক্ষা ও সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত, দুঃস্থ নারী ভাতা, স্কুলশিক্ষকদের ৬০ শতাংশ নারী, নারীর নিরাপত্তা, গণপরিবহনে নারীর নিরাপত্তা, যোগাযোগ সুবিধা, ডে-কেয়ার সেন্টার, বিশেষ চিকিৎসা সুবিধা প্রভৃতি।

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন: নারীশ্রম, মজুরি বৈষম্য দূর, শ্রমের স্বীকৃতি, জীবনমান উন্নয়ন, আয়-রোজগারের ওপর নিয়ন্ত্রণ

(১) মজুরি বৈষম্য দূর করে সমান কাজের জন্য সমান মজুরি নিশ্চিত করা, ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করা, ন্যূনতম মজুরি আইন বাস্তবায়ন, চুক্তিপত্র, পদোন্নতি বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা-জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সরকারের মনিটরিং পদ্ধতি চালু, পছন্দমতো পেশা নির্বাচনের অধিকার নিশ্চিত করা, অর্জিত আয় এবং সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত নারীর সমস্যা সমাধানে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ—এসবই নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত করতে জরুরি।

(২) কৃষিকাজে নিয়োজিত নারীদের স্বীকৃতিস্বরূপ 'কৃষক কার্ড' দিতে হবে।

(৩) চা-বাগানের শ্রমিকদের ৬৫ শতাংশ এবং চায়ের পাতা সংগ্রহকারীদের ১০০ শতাংশই নারী। এসব শ্রমিকের জীবন দুর্বিষহ। এদের জীবনমান উন্নত করতে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে (এদের জন্য কল্যাণমূলক কাজে বাংলাদেশ চা বোর্ডকে সংবেদনশীল করতে হবে)।

(৪) শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ হার বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

(৫) নারীর সবধরনের শ্রমের স্বীকৃতি, মজুরি বৈষম্য দূর, ন্যূনতম মজুরিসংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক বিষয়ে নারীদের অংশগ্রহণে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য আইন প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন জরুরি।

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ নীতির পরিবর্তন

(১) সকল শ্রেণির নারী উদ্যোক্তাদের অধিকতর উৎসাহিত করার জন্য ঋণ নীতির পরিবর্তন করতে হবে। একই সাথে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের জন্য বাজেটে বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং সংবিধানের ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদে প্রতিশ্রুত "সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার" এবং ২৭ (৪) অনুচ্ছেদে প্রতিশ্রুত নাগরিকদের যেকোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশেষ ক্ষেত্রে বিনাসুদে দরিদ্র-চরম দরিদ্র-প্রান্তিক নারীদের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রবর্তন করতে হবে। আমাদের দেশে ক্ষুদ্র স্কেলে কৃষকদের জন্য বিনাসুদে ঋণ কর্মসূচি বেশ সফলতা দেখিয়েছে, যেমন আইলা-সিডর-মঙ্গা-চর-হাওর-বাঁওর এলাকায় ভূমিহীন-প্রান্তিক কৃষকদের জন্য জনতা ব্যাংকের সুদবিহীন ঋণ কর্মসূচি ২০১০-১৪। বিনাসুদের এই ঋণ কর্মসূচি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সারা দেশে চালু করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

(২) ক্ষুদ্র ঋণের ফাঁদ (trap of micro credit) থেকে দরিদ্র নারীদের মুক্তি দিতে সরকারিভাবে ক্ষুদ্র অনুদানের (micro-grant) মাধ্যমে প্রশিক্ষণসহ স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ গ্রহণের কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

দরিদ্র-প্রান্তিক নারীদের দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা দূরীকরণ

(১) গতানুগতিকতার বিপরীতে আসন্ন বাজেটসহ সামনের কয়েক বছরের বাজেটে নারীর জন্য বিশেষত দরিদ্র-প্রান্তিক নারীদের দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা দূরীকরণে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচিতে বরাদ্দ কয়েক গুণ বাড়াতে হবে।

(২) বাজেটে গ্রামের নারীদের জন্য কোনো ভিন্ন বরাদ্দ থাকে না। আমাদের হিসাবে চলতি বাজেটে (২০২৩-২৪ অর্থবছরের) বিভিন্ন প্রকল্পে (মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয়ের ১৫টি প্রকল্পে আংশিক, এডিপিতে আরো ৬টি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পে এবং সামাজিক সুরক্ষা খাতের বরাদ্দে) গ্রামীণ নারীদের জন্য মোট বরাদ্দ (উন্নয়ন ও পরিচালন) হবে আনুমানিক ৩৮ হাজার ৭৯৪ কোটি টাকা[৭]। হিসেবপত্তর বলে যে বাজেটে গ্রামীণ নারীর এ বরাদ্দ তাদের জনসংখ্যানুপাতিক ন্যায্য বরাদ্দের তুলনায় মাত্র ৩০%।[৮] এ হিসেবে চলমান অর্থবছরের বাজেটে গ্রামীণ নারীর জন্য ন্যায্য বরাদ্দ হওয়া উচিত ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৩১৩ কোটি টাকা।

---

[৭] দেখুন, আবুল বারকাত, ওয়ালিউল ইসলাম ও আতাউর রহমান (২০২৩), প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে অংশীদারিত্ব এবং বাজেট ভাবনা। ঢাকা: এইচডিআরসি ও এএল আর ডি।

[৮] বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত (২০২৩), "অ-জনগণকরণের" রাজনৈতিক অর্থনীতি: বাংলাদেশে ৫০ বছরের রাষ্ট্রীয় বাজেটে পরিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ ও ভূমি সংস্কার, ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, পৃ.২৩৪।

নারী-উদ্দিষ্ট কর্মসূচির বরাদ্দ স্পষ্টীকরণ

(১) জেন্ডার বাজেট বিষয়টি জটিল ও এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট গোঁজামিলে। জেন্ডার বাজেটকে বিচ্ছিন্ন-অসংলগ্ন-জাহেরি দলিল না করে সুনির্দিষ্ট স্বচ্ছ নারীর ক্ষমতায়ন-উদ্দিষ্ট কর্মসূচি প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন জরুরি।

(২) বাজেটে নারী-উদ্দিষ্ট কর্মসূচিতে অন্যান্যের মধ্যে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করতে হবে: অশনাক্ত নারী যক্ষ্মা রোগীর শনাক্তকরণ ও চিকিৎসায় বরাদ্দ (গত বাজেটের তুলনায়) দুইগুণ বাড়াতে হবে; ১০০ শতাংশ নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ চারগুণ বাড়াতে হবে; ক্রীড়াখাতে মেয়েদের জন্য বরাদ্দ চারগুণ বাড়াতে হবে। মাধ্যমিক স্কুলে মেয়েদের বিজ্ঞান শিক্ষায় পর্যাপ্ত বরাদ্দ (যে খাতে আলাদা কোনো বরাদ্দ নেই) দিতে হবে; আসন্ন বাজেটে "নারীর বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগ"-এ ২ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করছি; নারীর প্রতি সহিংসতা রোধসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ এখনকার তুলনায় কমপক্ষে ২০ গুণ বাড়াতে হবে।

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার প্রকৃত মাত্রা ও তার অভিঘাত

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার প্রকৃত মাত্রা ও তার অভিঘাত সম্পর্কে আমরা যা জানি প্রকৃত অবস্থা তার চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় অসহনীয়। এ দেশে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে সভা-সেমিনার অনেক হলেও এসবের প্রকৃত মাত্রা ও অভিঘাত সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত।

(১) নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধ-উদ্দিষ্ট কোনো বরাদ্দ বাজেটে সুনির্দিষ্ট কোনো খাতে দেখানো হয় না। এ বিষয়ে বাজেটে বরাদ্দ দেখানোসহ মনিটরিং, ফলোআপ ও সমন্বয় কর্মপদ্ধতি উল্লেখ করতে হবে।

(২) আমাদের প্রস্তাব এবারের বাজেটে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ কমপক্ষে ২০০ কোটি টাকা করা হোক।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়ন

(১) মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১" বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।

স্থানীয় সরকারে নারী

(১) স্থানীয় সরকারপর্যায়ে নারী জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব পালনের জন্য বাজেটে সুনির্দিষ্ট এবং পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।

(২) স্থানীয় সরকারের নারী জনপ্রতিনিধিদের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ দেশ-বিদেশে স্থানীয় সরকারের সফল ও শিক্ষণীয় কর্মসূচি-প্রকল্প দেখা ও বোঝার জন্য শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে হবে।

আদিবাসী নারী

(১) আদিবাসী নারীদের নিজস্ব ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি রক্ষার জন্য বাজেটে বরাদ্দসহ তাদের সাথে যৌথভাবে প্রণীত কর্মপরিকল্পনা থাকতে হবে।

জেন্ডার সমতাবিষয়ক গবেষণা

(১) নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতা বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা পরিচালনের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট সব গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে নারী উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন এবং নারী ও শিশুদের অধিকারসম্পর্কিত বিষয়ে জরিপ ও গবেষণা পরিচালনায় উৎসাহিত করা, পৃথক জেন্ডার গবেষণা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং সেখান থেকে নীতিনির্ধারকদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা। এ জন্য বাজেটে প্রয়োজনীয় স্টার্ট-আপ বরাদ্দ রাখতে হবে।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষায় নারীর জন্য বরাদ্দ

(১) মানসম্মত প্রযুক্তিসহায়ক কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারীদের অংশগ্রহণ ৫০ শতাংশে উন্নীত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে যুগোপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন, প্রযুক্তিনির্ভর মানসম্পন্ন অংশগ্রহণমূলক মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনে এবং জাতীয় দক্ষতা নীতি-২০১১ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষাসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারী উন্নয়নে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা ভূমিকা পালন করতে পারে।

(২) বাজেটে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষাকে ভিন্ন করে দেখানো উচিত। আসন্ন বাজেটে কারিগরি শিক্ষা বিভাগে ১৪ হাজার কোটি টাকা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে ৪ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করছি (সারণি ৪)।

জেন্ডার সংবেদনশীল প্রযুক্তিবান্ধব নীতি বাস্তবায়ন

প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশের মাধ্যমে বিশ্ব আজ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশও তার বাইরে নয়। ইতিমধ্যে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে অটোমেশন অর্থাৎ জনশক্তির স্থলে প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে। ২০৪০ সালের মধ্যে প্রায় অর্ধেকের বেশি জনশক্তি প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে প্রতিস্থাপিত হবে, যা কর্মনিয়োজন কাঠামোতে একুশ শতকের অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

(১) জেন্ডার সংবেদনশীল প্রযুক্তিবান্ধব নীতি এবং পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে বর্তমানের জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ কর্মক্ষম তরুণ-তরণীকে প্রযুক্তি ব্যবহারে পারদর্শী করতে হবে। এ লক্ষ্যে জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন এবং বাজেট বরাদ্দে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

(২) পেশাগত ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা আবশ্যক।

জেন্ডার বাজেটের লক্ষ্য বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

নারী উন্নয়নে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের প্রভাব যাচাইয়ের জন্য ১৪টি মানদণ্ড ব্যবহৃত হয়। এসব মানদণ্ডে আছে নারীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ, নিরাপত্তা, ক্ষমতায়ন, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, আইন ও ন্যায়বিচার ইত্যাদি। প্রতিটি প্রকল্প এবং কর্মসূচির মাধ্যমে সরাসরি নারী উন্নয়নে কত অংশ ব্যয় হবে তা এ মানদণ্ড ব্যবহার করে উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জন্য ১৪টি মানদণ্ডের ভিত্তিতে নারী উন্নয়নে মোট প্রকল্প ব্যয়ের কত শতাংশ ব্যবহার হবে তা নির্ধারণের বিধান আছে। পরিচালন ও উন্নয়ন উভয় বাজেটে নারী উন্নয়নে বরাদ্দের পরিমাণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোতে উপস্থাপন করা হয়। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১-এর আর্থিক ব্যবস্থাপনার ৪৭.২ অনুচ্ছেদে বলা আছে—"জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে এবং মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় তথা রাষ্ট্রীয় বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটপ্রক্রিয়া অনুসরণ অব্যাহত রাখা হবে। বাজেটকৃত অর্থের সর্বোত্তম ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করার কাঠামো শক্তিশালী করা হবে"। এই পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের জানার বিষয় প্রতিটি প্রকল্প শেষে মানদণ্ড ব্যবহার করে নিরীক্ষণ করা হয় কি-না এবং প্রকল্পসমূহের বিভিন্ন মানদণ্ডের ভিত্তিতে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়, তা যথাযথ ব্যবহৃত হয় কি-না। কারণ আমরা প্রকল্পের বরাদ্দ দেখতে পাই, কিন্তু বছরওয়ারি প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দের কতটুকু এবং কী উদ্দেশ্যে বাস্তবায়ন হয়েছে প্রতিবেদনে তা উল্লেখ থাকে না। এ বিষয়ে সরকারের নজর দেওয়া কাম্য।

নারী ও শিশুর বিকাশে বাজেট বরাদ্দ

(১) যেসব প্রান্তিক গ্রামীণ ভূমিহীন, খামারি, কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র অকৃষি কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত নারী কভিড-১৯ সংকটের শিকার হয়ে দুরবস্থায় রয়েছেন, তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে;

(২) নারী কৃষকদের তালিকা প্রণয়ন ও স্বীকৃতি এবং তাদের জন্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করতে হবে;

(৩) কৃষিক্ষেত্রে গৃহীত প্রকল্পগুলোয় নারীর জন্য সুনির্দিষ্ট কোটা রাখতে হবে;

(৪) গ্রামীণ নারী যাতে খামার এবং খামারবহির্ভূত কর্মকাণ্ডের জন্য দ্রুত এবং ঝামেলাহীনভাবে ঋণ পেতে পারেন, তার জন্য পৃথক বাজেটীয় পদক্ষেপ নিতে হবে;

(৫) নারী-কৃষক ও নারী কৃষি-শ্রমিকদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্যমূল্যে বিপণনের জন্য জয়িতা নামের বিপণনকেন্দ্রের মতো প্রকল্প বেশি করে নিতে হবে;

(৬) নারী—সামন্ততান্ত্রিক-পিতৃতান্ত্রিক গ্রামবাংলায় আবহমানকাল থেকে শোষণ-নির্যাতন-বৈষম্য-অবদমনের শিকার। নারীর প্রতি বৈষম্য হ্রাসে এবং তাদের ক্ষমতায়নে বাজেটে গ্রামীণ নারীর মাথাপিছু গড় বরাদ্দ জাতীয় বাজেটে মাথাপিছু **গড়ের তুলনায় কমপক্ষে তিনগুণ বেশি নির্ধারণ যৌক্তিক;**

(৭) আমরা আমাদের প্রস্তাবিত বাজেটে বিভিন্ন খাত-ক্ষেত্রে যেসব বরাদ্দ প্রস্তাব করেছি, তার বেশিরভাগই পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য–বরাদ্দ শুধু ভিন্ন। তবে নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশুর বিকাশ ত্বরান্বয়নে এ বছর আমরা কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বাজেট প্রস্তাব করছি—

(ক) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে **"নারীর ক্ষমতায়ন বিভাগ"** প্রতিষ্ঠা করা, যে বিভাগের জন্য আগামী ৫ বছরে বরাদ্দ হবে **৬৫ হাজার** কোটি টাকা অর্থাৎ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে **১৩** হাজার কোটি টাকা,

(খ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে **"নারীর বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগ"** প্রতিষ্ঠা করা, যে বিভাগের জন্য আগামী ৫ বছরে বরাদ্দ হবে **১০** হাজার কোটি টাকাসহ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২ হাজার কোটি টাকা;

(গ) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে **"শিশুবিকাশ বিভাগ",** যে বিভাগের জন্য আগামী ৫ বছরে বরাদ্দ হবে ৮০ হাজার কোটি টাকাসহ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে **১৬** হাজার কোটি টাকা (সারণি ৪)।

নারীর ক্ষমতায়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

(১) নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা এবং অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তি বিনিময়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক, সহযোগিতাকে উৎসাহিত করার জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নারীবান্ধব কূটনীতি ও রাজনীতি শক্তিশালী করা।

(২) কভিড-১৯ মহাবিপর্যয় থেকে উত্তরণে পৃথিবীর অনেক দেশেই নারীরা অগ্রগামী ভূমিকা রাখতে সংগঠিত হচ্ছেন। এ ধরনের সংগঠিত প্রয়াসে সক্রিয় কর্মী ও অংশগ্রহণকারী হিসেবে যোগ দিয়ে পারস্পরিক সংহতি প্রকাশ করলে বিশ্বব্যাপী নারী অধিকার-শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

৪.১৮ প্রতিবন্ধী মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি

(১) দেশে প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা এবং প্রতিবন্ধিতার হার (prevalence of disability) প্রকৃত হারের তুলনায় (কয়েক শত কোটি টাকা ব্যয়ের আদমশুমারিতে) কয়েক গুণ কম দেখানো হচ্ছে। মনে রাখা দরকার, প্রতিবন্ধী মানুষ এ দেশের নাগরিক এবং তাদের জীবনসমৃদ্ধি উন্নয়নে রাষ্ট্র সংবিধানিকভাবেই দায়বদ্ধ।

(২) সকল সরকারি হিসেবপত্তরে প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য সরকারি ব্যয়-বরাদ্দ নির্ধারণ ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে দেশে প্রতিবন্ধীর হার ১%-২% নয়, কমপক্ষে ১০.৬% ধরে নিতে হবে (ততদিন, যতদিন প্রতিবন্ধী মানুষ নিয়ে সঠিক আদমশুমারি না হচ্ছে)।

(৩) দেশে মোট প্রতিবন্ধী মানুষ, প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী দেশের প্রত্যেক প্রতিবন্ধী মানুষের আর্থসামাজিক শ্রেণিগত অবস্থা এবং গ্রাম-শহর (ঠিকানাভিত্তিক) অনুযায়ী অবস্থান নির্মোহ জরিপ করে বের করতে হবে। এবং জরিপকাজ অব্যাহত রাখতে হবে যেন নিয়মিত প্রতিবন্ধীসংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়। দায়িত্বটা সংবিধান অনুযায়ী জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রকে এবং রাষ্ট্রের পক্ষে সরকারকেই পালন করতে হবে। এ দায়িত্ব পালনে কোনো ধরনের অবহেলা বা সময়ক্ষেপণ হবে অপরাধতুল্য। একই সাথে প্রস্তাব করছি যে মানুষসংশ্লিষ্ট শুমারি (census) এবং/ অথবা জরিপকাজে সরকার যেন বিদেশি কোনো পরামর্শক নিযুক্ত না করেন এবং দেশীয় পরামর্শক যিনি/ যারা নির্মোহ-বস্তুনিষ্ঠ সত্য উদ্‌ঘাটনে অপারগ অথবা যিনি/ যারা সরকারের ইচ্ছা/ অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করতে অভ্যস্ত, হয়েছে তাদের কোনোভাবেই নিযুক্ত না করা (সরকারই ভালো জানেন যে তারা এসব কীভাবে করবেন)।

(৪) এ দেশে প্রতিবন্ধী মানুষকে সাংবিধানিক নির্দেশের প্রতি পূর্ণ সম্মান রেখে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে বিবেচনায় আনতে হলে তাদের জন্য সরকারি উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ কত দেওয়া উচিত? এ প্রশ্নের সহজ উত্তর নেই। হিসাবটি জটিল—তবে ইচ্ছে থাকলে হিসাব কষা সম্ভব। এ হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে প্রতিবন্ধীর ধরন অনুয়ায়ী সহায়ক উপকরণ ব্যয়, প্রতিবন্ধীর ধরন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা-স্বাস্থ্য ব্যয়, প্রতিবন্ধীর ধরন অনুযায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহায়ক ব্যয়, প্রতিবন্ধিতা রোধসংক্রান্ত (অর্থাৎ এখন থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত কমপক্ষে ১ কোটি ৩৮ লক্ষ মানুষকে প্রতিবন্ধী হওয়া থেকে রক্ষাসংশ্লিষ্ট) ব্যয়, এবং অবশ্যই ১ কোটি ২৫ লক্ষ প্রতিবন্ধী, যারা দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে আগত তাদের জন্য খাদ্য অনুদানসংশ্লিষ্ট ব্যয় (শেষোক্ত ব্যয়টি কভিড-১৯-এর মহামন্দার মহামারির এই বাজারে করতেই হবে এবং তা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় ধরে চালিয়ে যেতে হবে)।

প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য সহায়ক উপকরণ হিসেবে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ধরনভেদে প্রয়োজন হুইলচেয়ার, ক্রাচ, কৃত্রিম পা; দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য প্রয়োজন সাদাছড়ি ও চশমা; এবং বাক্-শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রয়োজন শ্রবণযন্ত্র। বিভিন্ন তথ্য-উৎস এবং সংশ্লিষ্ট জ্ঞানাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে এসব সহায়ক-উপকরণের বর্তমান মোট চাহিদা হবে এ রকম: ১ কোটি ৮০ লক্ষ প্রতিবন্ধীর মধ্যে ৫০ লক্ষ প্রতিবন্ধী মানুষের সহায়ক-উপকরণ প্রয়োজন, যার মধ্যে আছে ৯ লক্ষ হুইল চেয়ার, ৯ লক্ষ ক্রাচ, ৪ লক্ষ কৃত্রিম পা, ৯ লক্ষ সাদাছড়ি, ১০ লক্ষ চশমা এবং ৯ লক্ষ শ্রবণযন্ত্র। বর্তমান বাজারমূল্যে ৫০ লক্ষ প্রতিবন্ধী মানুষের উল্লিখিত সহায়ক উপকরণের নিম্নতম চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন মোট কমপক্ষে ১ হাজার কোটি টাকা। প্রতিবন্ধী মানুষের সহায়ক উপকরণের এ হিসাবটি অসম্পূর্ণ। কারণ, এর মধ্যে নেই বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীদের জন্য বিভিন্ন সহায়ক উপকরণাদি, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল পুস্তক, বহুমুখী প্রতিবন্ধীদের জন্য সহায়ক উপকরণাদি। এই সবকিছুর পাশাপাশি কভিড-১৯ ও পরবর্তী অর্থনৈতিক মন্দাবস্থার সম্ভাব্য অভিঘাত বিবেচনা করলে প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য সহায়ক উপকরণবাবদ নিম্নতম প্রয়োজনীয় ব্যয় বরাদ্দ হওয়া উচিত উল্লিখিত হিসেবের কমপক্ষে দ্বিগুণ বেশি অর্থাৎ ২ হাজার কোটি টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে প্রতিবন্ধী মানুষের জীবনমান উন্নয়নে আমরা ১ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করছি?।

৪.১৯ প্রকৃতি-জলবায়ু-পরিবেশ ভাবনা

(১) আমাদের পরিবেশ ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু হতে হবে এখানেই যে প্রকৃতির ক্ষুদ্র অংশ হিসেবে আমরা বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রকৃতিকে কীভাবে দেখব? আমরা কি প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল-আস্থাবানভিত্তিক উন্নয়ন-প্রগতিপ্রক্রিয়া গ্রহণ করব, না-কি পুঁজিবাদী শিল্পায়ন গত ২০০-২৫০ বছর যা করেছে—সেটাই অনুসরণ করব? আমরা কি বায়ু-পানি-পরিবেশ-প্রতিবেশ দূষণকারী শিল্পায়নের পথে পা বাড়িয়ে "শ্বসনতন্ত্রের রোগের মহামারি"কে (respiratory pandemic) আমন্ত্রণ জানাব? আমরা যদি প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল-আস্থাশীল উন্নয়ন-প্রগতিপ্রক্রিয়া গ্রহণ করি, তাহলে একদিকে যেমন প্রকৃতির ক্ষতিতে আমাদের অবদান কমবে আর অন্যদিকে কিন্তু দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতাও কমবে। কারণ, অতিমাত্রায় জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত বিষয় হলো মুনাফা, আরো মুনাফা, যেকোনো কিছুর বিনিময়ে মুনাফার সর্বোচ্চকরণ।

(২) মুক্তবাজার-উন্নয়ন মতাদর্শের আওতায় নব্য-উদারবাদী পরামর্শদাতারা (প্রধানত বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল-আইএমএফ এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা) মনে করে (যা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত-বিভ্রান্তিকর ধারণা) যে—'অর্থনীতি' (economy) এবং 'ইকোলজি' অথবা 'জীবমণ্ডল-প্রাণিমণ্ডল (biosphere) সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়, বিচ্ছিন্ন বিষয়; তারা এও মনে করে যে—'প্রযুক্তি' (technology) সব সমস্যার সমাধান দিয়ে দেবে। এ-এক ফাঁদ। এ ফাঁদে পা দিলে মহাবিপদ অবশ্যম্ভাবী।

(৩) "প্রযুক্তি" সব রোগের ওষুধ— এ কথা শতভাগ ভ্রান্ত। কারণ, আমরা– মানবসমাজ হলাম প্রকৃতিরই একটি সাবসেট বা অধীন অঙ্গমাত্র (উল্টোটা নয়)। মানুষের সাথে প্রকৃতির (পরিবেশ, প্রতিবেশ, জলবায়ু যা-ই বলা হোক না কেন) সম্পর্কটা একটা বৃহত্তর সিস্টেমের (= প্রকৃতি) সাথে একটা ক্ষুদ্র সাব-সিস্টেমের (মানবসমাজ) সম্পর্ক, যেখানে বৃহত্তর সিস্টেমকে অর্থাৎ প্রকৃতিকে ইলাস্টিকের মতো কিছু ভাবা ঠিক নয় যে তাকে টেনে বাড়ানো যাবে—(প্রকৃতিকে বাড়ানো যাবে না) আর সাব-সিস্টেম হিসেবে মানবসমাজ বাড়ছে তো বাড়ছেই।

(৪) জলবায়ু পরিবর্তন হোক অথবা পরিবেশ বিপর্যয় হোক—সবই আসলে 'বর্জ্যের' সমস্যা (problem of wastes), যা আমরা প্রতিনিয়তই জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারে সৃষ্টি করছি। সুতরাং পরিবেশসংশ্লিষ্ট উন্নয়ন-প্রগতির যেকোনো বিষয়ের ভাবনা প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ সম্মান-শ্রদ্ধা ও আস্থা রেখেই হতে হবে। নব্য-উদরবাদী মুক্তবাজারীয় মতবাদীদের কথা শুনলে বিপদ হবে অনিবার্য। এসবের অন্যথা হবে মহাবিপর্যয়কর।

(৫) দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রয়োজন আছে কি-না ভেবে দেখা দরকার।

(৬) সচেতনভাবে আমাদের এমন কোনো কিছুই করা ঠিক হবে না, যা প্রকৃতির ক্ষতির কারণ হতে পারে। এসব বিবেচনার নিরিখেই বিনির্মিত আমাদের নিম্নলিখিত প্রস্তাব (যা প্রধানত দিকনির্দেশনামূলক, যেসব প্রস্তাবের প্রতিফলন আমরা আশা করব এ দেশের আসন্ন বাজেটসহ সকল উন্নয়ন দলিলে):

নদ-নদী দখল ও দূষণ প্রতিকার

(১) নদীর নাব্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ বরাদ্দ দেওয়া প্রয়োজন। উল্লেখ্য, নৌপথে মালামাল ও যাত্রী পরিবহন উভয়ই যথেষ্ট সাশ্রয়ী ও নিরাপদ।

(২) বিগত পাঁচ অর্থবছরের বাজেটে পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হলেও পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি সামগ্রিকভাবে অগ্রাধিকার পায়নি। নদীর দখল-দূষণ প্রতিকারে 'জাতীয় নদী কমিশন' গঠনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করা উচিত। পরিবেশবান্ধব বাজেটের জন্য প্রয়োজন প্রভাবশালী স্বার্থগোষ্ঠীর পরিবেশবিরোধী অন্যায় কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে রাজনৈতিক অঙ্গীকার। বিষয়টি চূড়ান্ত বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হওয়া জরুরি।

(৩) নদ-নদীসহ বিভিন্ন জলাশয় অবৈধ দখলমুক্ত করতে সরকারের 'জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের' 'শূন্য সহিষ্ণুতা' নীতি বাস্তবায়নপ্রক্রিয়া জোরদার করতে হবে। এ লক্ষ্যে বাজেটে সমন্বিত উদ্যোগসংশ্লিষ্ট কর্মকৌশল থাকতে হবে।

পরিবেশ দূষণবিরুদ্ধ ব্যবস্থা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

(১) পরিবেশদূষণকারীদের জন্য বিশেষ কর ব্যবস্থা প্রণয়ন ও তা কার্যকর করতে হবে। এক্ষেত্রে "যে যতটুকু পরিবেশদূষণ করে সে ততটুকু দূষণ রোধ কর প্রদানে বাধ্য থাকবে"—নীতিটি (polluters pay principle) বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ নীতি একদিকে যেমন সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে, অন্যদিকে দীর্ঘ মেয়াদে পরিবেশদূষণ কমাবে এবং কমাবে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যহানি। 'সবুজ উন্নয়ন'-এর ক্ষেত্রে এটা হতে পারে অন্যতম বাহন। তবে পরিবেশদূষণ রোধের এই নীতি স্বল্প মেয়াদে গ্রহণযোগ্য হতে পারে দীর্ঘ মেয়াদে নয়। কারণ, পরিবেশদূষণের অর্থনৈতিক ব্যয়-লাভ (cost-benefit) হিসাব 'নৈতিক দুর্নীতি' (moral hazard) বাড়ায়। কারণ, ওই হিসাবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-পরিবেশগত ব্যয়-লাভ আদৌ বিবেচনা করা হয় না। এসব বিবেচনা করলে সংশ্লিষ্ট হিসেবপত্র স্পষ্ট দেখাবে যে দূষণকারীর ওপর দূষণমাত্রা অনুযায়ী দূষণ রোধ কর আরোপ আসলে শেষপর্যন্ত "দূষণকেই জায়েজ করে"।

(২) বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে (waste management) বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রে তরল ও কঠিন/ শক্ত বর্জ্য (liquid and solid waste)—উভয় বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে। এসব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বাজেটে এই কথা স্পষ্ট উল্লেখ করতে হবে যে বর্জ্য যেন 'Regenerated' হয়; অর্থাৎ বর্জ্য যেন বর্জ্য থেকে স্বাভাবিক উৎপাদনপ্রক্রিয়ার অংশ হয়। বিষয়টি আধুনিক প্রযুক্তিগত। এর ফলে মানুষের স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধি ঘটবে, পরিবেশ রক্ষা পাবে এবং একই সাথে বিকশিত হবে 'সবুজ অর্থনীতি'।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা

(১) সরকারের গৃহীত শতবর্ষমেয়াদি 'ব-দ্বীপ-পরিকল্পনা'—ধারণাগতভাবে সুদূরচিন্তাপ্রসারী। 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা'কে সমগ্রক প্রকৃতির সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে দেখা দরকার। প্রকৃতির সাথে

ভারসাম্য রেখে 'ব-দ্বীপ-পরিকল্পনা'র অন্তঃস্থ মৌল উপাদানসমূহ প্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা দরকার।

(২) পূর্ণাঙ্গ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বিনির্মাণে কারিগরি-প্রযুক্তিগত বিষয়ের ওপর জোর দিতে হবে। তবে তার চেয়ে বেশি জোর দিতে হবে দীর্ঘ মেয়াদে প্রকৃতির এবং মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর প্রভাব-অভিঘাতের।

(৩) ব-দ্বীপ পরিকল্পনা সম্পর্কে জনগণকে যথাসম্ভব বিস্তারিত অবহিত করা জরুরি।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দক্ষিণাঞ্চলের জলাবদ্ধতা নিরসন, সেচ সম্প্রসারণ ও হাওর এলাকার উন্নয়ন

(১) বিগত পাঁচটি বাজেটে প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্থানচ্যুত মানুষের পুনর্বাসন, দক্ষিণাঞ্চলের জলবদ্ধতা নিরসন, সেচ সম্প্রসারণ ও হাওর এলাকার উন্নয়নের জন্য কিছু বরাদ্দ ছিল। গত বছর ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে ফসলের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এ জন্য বাজেটে থোক বরাদ্দসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। আমরা এ সমস্ত কর্মসূচির অগ্রগতি জানানোসহ ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধির সুপারিশ করছি।

(২) দক্ষিণাঞ্চলসহ সারা দেশে জলাবদ্ধতা যে প্রকট রূপ নিয়েছে, তার কারণগুলো খতিয়ে দেখে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৩) নগর জলাবদ্ধতা দূরীকরণে মৌলিক ভাবনা জরুরি।

(৪) হাওর এলাকায় উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা প্রকৃতিবান্ধব হওয়া জরুরি। হাওরের দায়দায়িত্ব হাওরবাসীদের ওপর ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবা দরকার।

(৫) এ বছর আমাদের প্রস্তাব হলো (কৃষি ও পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে) **"হাওর-বাঁওর-বিল-চর-উপকূল উন্নয়ন বিভাগ"** প্রতিষ্ঠা করা এবং এ জন্য আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া (আগামী ৫ বছরে ৮০ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দসহ; দেখুন, সারণি ৪)।

সাইক্লোন ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজন নতুন ভাবনা

সাইক্লোন আমাদের জীবনের অংশ। ঠিক এ কারণেই সাইক্লোনের পূর্বাভাস থেকে শুরু করে সমগ্র ব্যবস্থাপনা হতে হবে বিজ্ঞানসম্মত। এ নিয়ে আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব নিম্নরূপ:

(১) মান্ধাতার আমলের "cyclone signal system"-এর পরিবর্তে আধুনিক সিস্টেমে আসতে হবে (যা হবে মানুষ রক্ষার লক্ষ্যে; বন্দর হবে যার অংশ, উল্টোটা নয়)।

(২) প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে আমাদের 'relief approach' পাল্টে "দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস অ্যাপ্রোচে" যেতে হবে।

(৩) বাঁধের মালিকানা হতে হবে স্থানীয় জনগণের।

(৪) আবহাওয়া বিভাগকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতায় আনার কথা ভাবতে হবে।

(৫) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ দিয়ে করতে হবে (বিদেশি ঋণ দিয়ে নয়)।

৪.২০ গবেষণা ও বিজ্ঞান চর্চা: ব্যয় নয় বিনিয়োগ

গবেষণা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা উৎসাহিত করতে সরকারি বরাদ্দ যথাসম্ভব সর্বোচ্চ পরিমাণে বাড়াতে হবে। তবে গবেষণা ও বিজ্ঞান চর্চার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কোনোভাবেই প্রকৃতিবিরুদ্ধ হতে পারবে না, তা হতে হবে প্রকৃতির বিধি-বিধানের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ এবং সর্বসাধারণের জন্য মঙ্গলজনক। গবেষণা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা সংশ্লিষ্ট আমাদের ধারণা ও সুপারিশ নিম্নরূপ:

(১) মানবকল্যাণ-উদ্দিষ্ট গবেষণা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকে ব্যয় নয় বিনিয়োগ হিসেবে দেখতে হবে (not expenditure but investment)।

(২) কোনো গবেষণা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় বিনিয়োগ করা যাবে না, যা শেষপর্যন্ত মানুষে-মানুষে বৈষম্য বৃদ্ধির কারণ হতে পারে অথবা যা হতে পারে সমাজবিধ্বংসী।

(৩) গবেষণা ও বিজ্ঞান চর্চায় বিদেশি বিনিয়োগ অথবা ধনী দেশের বিনিয়োগ অথবা কর্পোরেট বিনিয়োগ উৎসাহিত করার প্রয়োজন নেই, অথবা বলা যেতে পারে নির্বিচার উৎসাহিত করা ক্ষতিকর। কারণ, ওরা বিনিয়োগ করে মুনাফার স্বার্থ দেখে। কিন্তু মুনাফা ও জনকল্যাণ সাংঘর্ষিক। এ ধরনের বিনিয়োগ এজেন্ডা এড়িয়ে যাওয়া উচিত।

(৪) গবেষণা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে জনগণের সম্মতি নেওয়া প্রয়োজন।

(৫) গবেষণা ও উন্নয়নের গুরুত্ব বিবেচনায় আমরা আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে "গবেষণা, উদ্ভাবন, বিচ্ছুরণ ও উন্নয়ন" (Research, Innovation, Diffusion and Development, RID & D) নামক একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করছি। RID & D মন্ত্রণালয়ের জন্য আগামী ৫ বছরের জন্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাবসহ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩০ হাজার কোটি টাকার প্রস্তাব করছি (দেখুন, সারণি ৫)।

মেধার স্বীকৃতি ও মেধাস্বত্ব অধিকার

(১) বিদেশে অবস্থানরত/ কর্মরত কৃতি গবেষকেরা যাতে স্বদেশেই তাদের গবেষণাকর্ম ও বিজ্ঞান চর্চা চালিয়ে যেতে পারেন অথবা বিদেশে বসেই দেশের মানুষের কল্যাণে গবেষণা ও বিজ্ঞান চর্চা করতে পারেন এবং উৎসাহিত বোধ করেন, সে লক্ষ্যে প্রণোদনার (বস্তুগত ও নৈতিক উভয়ই) বিষয়টি যথামাত্রা গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

(২) যদিও আজকের ধনী দেশের ধনী হওয়ার প্রক্রিয়ায় মেধাস্বত্ব বলে কিছু ছিল না, তথাপি বিশ্বায়নের যুগে মেধাস্বত্ব অধিকার (Intellectual Property Right) চলমান বিষয়। অন্যেরা মেধাস্বত্ব অধিকারের সুযোগ গ্রহণ করছে; কিন্তু বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে। এক্ষেত্রে পেছনে থাকার তেমন কোনো যুক্তি নেই—যখন দাবি করার মতো বাংলাদেশের অনেক

কিছুই আছে। যেমন আমাদের লোকজ শিল্প-সাহিত্য-কৃষ্টির অনেক কিছুই আছে (লালনগীতি-হাছন রাজাসহ অনেকে) যার 'কপিরাইট' নিশ্চিত করে আমরা একদিকে উপার্জন করতে সক্ষম, অন্যদিকে আমাদের কৃষ্টিকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে পারি। সেক্ষেত্রে দেশজ-সৃজনশীল প্রতিভার মানুষেরা পাবেন তাদের সৃজনশীল প্রতিভার স্বীকৃতি এবং একই সাথে আর্থিক সচ্ছলতা; অন্যদিকে দেশ পাবে উজ্জ্বল এক ভাবমূর্তি। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনের দেশে পরিণত হতে সক্ষম। সাম্প্রতিককালে কয়েকজন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত গবেষক তাদের বিশ্বস্বীকৃত সৃজনশীল কর্মকাণ্ড আমাদের দেশের জন্য উৎসর্গ করেছেন। যেমন অধ্যাপক ড. আবুল হুসসামের খাওয়ার পানি আর্সেনিক মুক্ত করার প্রযুক্তি 'সনো ফিল্টার' (যে উদ্ভাবনের জন্য তিনি ২০০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় অ্যাকাডেমি অব ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মিলিয়ন ডলারের গ্রেইঞ্জার চ্যালেঞ্জ অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হন) এবং পুরস্কার হিসেবে পাওয়া অর্থের অধিকাংশই তিনি এ দেশে দরিদ্র মানুষের ঘরে সনো ফিল্টার পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনুদান দিয়েছেন; (অকালপ্রয়াত) অধ্যাপক ড. মাকসুদুল আলম-এর পাটের জিন রহস্য উদ্‌ঘাটন মৌলিক আবিষ্কার। বিশ্বায়নের যুগে মেধাস্বত্ব অধিকার এবং সুরক্ষার এসব সুবিধা নেওয়ার বিষয়ে ভাবতে হবে। বিষয়টি যেমন সরকারি সংশ্লিষ্ট দলিলপত্রে স্বীকৃত হওয়া জরুরি, তেমনি এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

(৩) সরকার ২০১৮ সালে 'বাংলাদেশ উদ্ভাবন নীতি' প্রণয়ন করেছে। আসন্ন বাজেটে 'বাংলাদেশ মেধাস্বত্ব কমিশন' গঠন করার প্রস্তাব থাকলে ভালো হয়। বিশ্বায়ন ও মেধাস্বত্ব নিয়ে যেহেতু ভাবনা জরুরি, সেহেতু বলা প্রয়োজন যে বিশ্বে এখন চলছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব—তথ্য ও প্রযুক্তি মধ্যস্থতাকারী উন্নয়নধারা। এ বিপ্লবে সক্রিয় অংশীদারি নিশ্চিত করতে হলে বাংলাদেশকে 'উদ্ভাবন নীতি-কৌশল' (Innovation Policy and Strategy) বাস্তবায়নে রোডম্যাপ তৈরি করে দ্রুততার সাথে এগুতে হবে।

৪.২১ দেশরক্ষা-আত্মরক্ষা-প্রতিরক্ষা ধারণা

শোভন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে দেশরক্ষা-আত্মরক্ষা-প্রতিরক্ষা ধারণা নিয়ে আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। ভাবতে হবে বড় পর্দায় এবং ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে হবে দেশের মানুষ—জনগণ এবং হতে হবে তা সামগ্রিক উন্নয়ন-প্রগতির শর্তাধীন।

(১) দেশরক্ষার ধারণা বিনির্মিত-পুনর্নির্মিত হতে হবে। আর সে নবনির্মিত ধারণাটি হতে হবে "জনগণ প্রজাতন্ত্রের মালিক" ধারণার ভিত্তিতে "জনগণের দ্বারা, জনগণ কর্তৃক, জনগণের জন্য" জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র কর্তৃক।

(২) দেশরক্ষা-প্রতিরক্ষার প্রচলিত ধারণাটি গণ-ভীতিকর, বিধায় তা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। প্রকৃতিবিরুদ্ধ সবকিছুই শেষ বিচারে প্রগতিবিরুদ্ধ। সুতরাং দেশরক্ষা-প্রতিরক্ষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ-ভীতিকর ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে তাকে গণ-আস্থাশীল গণ-শ্রদ্ধাশীল ধারণা দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে হবে।

(৩) দেশরক্ষা করবে জনগণ। আর জনগণের সম্মতি নিয়ে প্রজাতন্ত্রের চালক রাষ্ট্র সিদ্ধান্ত নেবে দেশ রক্ষার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ কোনটা—দেশরক্ষা-শক্তি বাড়ানোর জন্য ট্যাঙ্ক, না-

কি মানুষের সুস্থ আয়ুষ্কাল বাড়ানোর লক্ষ্যে মায়ের পুষ্টি বাড়ানো এবং শিশুমৃত্যু কমানো? একটি মিগ যুদ্ধবিমান ক্রয়, না-কি সেই টাকায় দেশ থেকে কুষ্ঠরোগ-যক্ষ্মারোগ চিরতরে নির্মূল করা? বিনিয়োগপছন্দ নির্ধারণে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী বিভাগ (সরকার) জনগণের স্বার্থের অনুকূলে সিদ্ধান্ত নেবে, কোনটা ভালো—অনেক ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, না-কি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংককে আরো প্রসারিত করে জনগণের আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালী করা?

(৪) দেশরক্ষা-আত্মরক্ষা-প্রতিরক্ষার ভিত মজবুত করতে শিশুকাল থেকে উচ্চমান নীতি-নৈতিকতা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুদের দিতে হবে অনেক খেলনা; তবে একটিও যুদ্ধ-খেলনা নয়। শিশুকাল থেকেই অনেক বৈচিত্র্যপূর্ণ খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকতে হবে, তবে খেয়াল রাখতে হবে—একটি খেলাও যেন যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা না-হয়। অসুস্থ প্রতিযোগিতার সকল পথ রুদ্ধ করতে হবে—শিশুকাল থেকে শেষকাল পর্যন্ত।

(৫) শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে আত্মরক্ষা-দেশরক্ষার জন্য প্রকৃত দেশপ্রেম চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

(৬) মানুষের মধ্যে জীবনের সর্বস্তরে আলোকিতকরণ-উদ্দিষ্ট শিক্ষা (education for enlightenment), মানুষের অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা বোধ ও আশ্রয় বোধ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাষ্ট্র কর্তৃক নিরন্তর প্রচেষ্টা—এসবই হতে পারে দেশরক্ষা-আত্মরক্ষা-প্রতিরক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন। এ ধারণায় বিশ্বাস এবং তা বাস্তবজীবনে অনুশীলন-প্রয়োগই হতে হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অন্যতম ভিত্তি।

(৭) দেশরক্ষা-প্রতিরক্ষা মানে যুদ্ধ নয়—এ কথা দেশের সব মানুষকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(৮) মানুষের আচার-আচরণ পোশাক-পরিচ্ছদ তার সুসংস্কৃতির পরিচায়ক। এ ধারণা মাথায় রেখে প্রচলিত প্রতিরক্ষাসংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের ধ্যান-ধারণা আচার-আচরণগত দিক থেকে শুরু করে পোশাক-পরিচ্ছদ বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে ভাবতে হবে।

৪.২২ সরকার টাকা পাবে কোথায়?

সম্পদ আহরণে মৌল দিগ্‌দর্শন

(১) শোভন সমাজ-অর্থনীতি ব্যবস্থা বিনির্মাণের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণে রাষ্ট্র-সরকারকে সেসব উৎসে হাত দিতে হবে, যেসব উৎসে অতীতে কখনও হাত দেওয়া হয়নি অথবা প্রয়োজনমতো হাত দেওয়া হয়নি। অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণে এসব উৎসের অন্যতম হলো সম্পদ কর (Wealth tax), অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর (Tax on excess profit), অর্থ পাচার উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি (Laundered money recovery), কালোটাকা উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি (Black money recovery), বিদেশি নাগরিকদের ওপর কর, বিভিন্ন কমিশন ও বোর্ড কর্তৃক আহরণ বৃদ্ধি, এবং সরকারের সম্পদ আহরণের প্রচলিত বিভিন্ন উৎসে আদায়ের যৌক্তিক বৃদ্ধি (যেমন আয়কর, মুনাফার ওপর কর,

মূলধনের ওপর কর, আমদানি শুল্ক, মাদক শুল্ক, ভূমি রাজস্ব, যানবাহন কর, জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ থেকে প্রাপ্তি প্রভৃতি)। এসবই হবে শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্ব-সংঘাত উদ্ভূত ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতা-বিচ্ছিন্নতা দূর করার প্রাথমিক শর্ত। এ শর্ত পূরণ না করে প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ আনুগত্যকেন্দ্রিক মানবিক উন্নয়নপ্রক্রিয়াটা শুরু করাও সম্ভব নয়।

(২) অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যে এখন পরোক্ষ করের ওপর তুলনামূলক বেশি জোর দেওয়া হয়, যা মানুষে মানুষে বৈষম্য বাড়ায়। এখন থেকে পরোক্ষ করের তুলনায় প্রত্যক্ষ করের ওপর বেশি জোর দিতে হবে।

(৩) মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণি পর্যন্ত সবাইকে (অর্থাৎ দরিদ্র, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্য-মধ্যবিত্ত) সামনের কয়েক বছর আয়করবেষ্টনীর (income tax net) বাইরে রাখতে হবে।

(৪) সম্পদ কর, অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর, পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার, কালোটাকা উদ্ধার থেকে প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদের সাথে দেশে যত প্রাকৃতিক সম্পদ আছে (যেমন জমি, জলা, কয়লা, গ্যাস, তেল, খনিজসম্পদ) সেসবের সমন্বয়ে গড়ে তুলতে হবে 'জাতীয় সম্পদ তহবিল' (National Wealth Fund), যে তহবিল বাংলাদেশের সংবিধানের বিধান অনুযায়ী 'প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণের' বৃহত্তর কল্যাণে নিয়োগ করতে হবে।

(৫) ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রভুদের প্রায় ২০০ বছর শোষণ, পাকিস্তান উপনিবেশ প্রভুদের ২৪ বছর শোষণ এবং বিশ্ববাজারে মুক্তবাজার বিশ্বায়নের অন্যায্যতার ফলে বিগত ৪০-৪৫ বছরে আমরা যেভাবে ঠকেছি সেসবের হিসেবপত্তর করে ন্যায্য হিস্যা জায়গামতো চাইতে হবে। এ নিয়ে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কূটনীতি জোরদার করতে হবে।

(৬) বিশ্বব্যাপী আর্থিক লেনদেনের ওপর কর (টবিন ট্যাক্স) ও আন্তর্জাতিক পণ্য বাণিজ্যের ওপর করের (টেরা ট্যাক্স) সমন্বয়ে 'বৈশ্বিক সম্পদ তহবিল' ('Global Wealth Fund') গঠন এবং তা কার্যকর করার পথ-পদ্ধতি নিয়ে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার উন্নয়নশীল-স্বল্পোন্নত দেশসমূহের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে সম্মিলিত উদ্যোগ নিতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কূটনীতি জোরদার করতে হবে।

কর রাজস্ব: আয়কর

(১) ব্যক্তি ও কর্পোরেট পর্যায়ে ব্যাপক কর-রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া হয়। এ লক্ষ্যে কর-প্রশাসনের সংস্কারসহ বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। এখানে উল্লেখ্য, আমাদের দেশের কর-শুল্ক আদায়কারী প্রশাসন-প্রতিষ্ঠান ঐতিহাসিকভাবেই শুধু দুর্নীতিগ্রস্ত নয়, এসব প্রতিষ্ঠান অশুভ স্বার্থসংশ্লিষ্ট রেন্টসিকিং গোষ্ঠীর ভিত্তি খুবই শক্ত, জটিল, গভীর, সুদূরবিস্তৃত। কোনো দুর্বল সরকারের পক্ষে কর-শুল্ক প্রশাসন-প্রতিষ্ঠানে জনস্বার্থমুখী সংস্কার প্রায় অসম্ভব।

(২) বর্তমান পদ্ধতিতে 'কস্ট প্রাইস'-এর ভিত্তিতে সম্পত্তির যে কর নির্ধারণ করা হয়, তা নিতান্তই কম। প্রতি তিন বছর পরপর সম্পত্তির পুনর্মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। পুনর্মূল্যায়িত

সম্পদের ওপর কর ধার্য করা উচিত। সঠিকভাবে পুনর্মূল্যায়িত সম্পত্তির ওপর সম্পদ কর হার প্রয়োগ করলে সরকারের আয় বৃদ্ধি পাবে।

(৩) কভিড-১৯-এর লকডাউন এবং অর্থনৈতিক মন্দার কারণে দরিদ্রদের তো বটেই নিম্নবিত্ত-নিম্ন-মধ্যবিত্ত এমনকি মধ্য-মধ্যবিত্তদের ব্যাপকাংশ শ্রেণি মইয়ের নিচের দিকে নামতে বাধ্য হয়েছে। এখনও নামছে। দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি আর মানুষের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি না হবার কারণে এহেন দুর্দশা বাড়ছে। এরই মধ্যে ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের দামামা—যার প্রভাব এখন আমাদের প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষ পর্যন্ত টের পাচ্ছেন। অবস্থা যা তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে শ্রেণি মইয়ের নিচের দিকের এসব মানুষ সম্পদ খুইয়েছেন, কাজ হারিয়েছেন, নিঃস্বায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন, মানসিক-মনস্তাত্তিকভাবে বিপন্ন-অবসাদগ্রস্ত। এসব মানুষ হলেন ১৭ কোটি মানুষের বাংলাদেশে মোট ১৩ কোটি ৯ লক্ষ (মোট জনসংখ্যার ৭৭%)। আমরা মনে করি, আগামী অন্তত তিন বছর এসব মানুষকে আয়কর মুক্ত রাখা প্রয়োজন (তিন বছর পরে অবস্থা বুঝে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে)। সেক্ষেত্রে আয়কর প্রযোজ্য হবে শুধু ধনী এবং উচ্চ-মধ্যবিত্তদের জন্য, যাদের সংখ্যা হবে ৯৬ লক্ষ খানায় ৩ কোটি ৯১ লক্ষ মানুষ (দেশের মোট জনসংখ্যার ২৩%), যাদের মধ্যে আয়কর প্রদানকারীর সম্ভাব্য সংখ্যা হবে ১ কোটি ১৫ লক্ষ মানুষ। এই ১ কোটি ১৫ লক্ষ সম্ভাব্য করদাতার মধ্যে ধনী শ্রেণিভুক্ত হবেন আনুমানিক ৫০ লক্ষ (৪৩.৫%), আর উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত হবেন ৬৫ লক্ষ (৫৬.৫%)। এদের মধ্যেই আছেন উচ্চহার করদাতা, বৃহদাঙ্ক করদাতা, ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের কর্পোরেট করদাতা।

(৪) দেশে সম্ভবত ১০০ জন ব্যক্তি (অথবা তার চেয়ে কম) বছরে ১ কোটি টাকা বা তদূর্ধ্ব ব্যক্তিগত আয়কর (personal income tax) প্রদান করেন। আমাদের হিসাবে দেশে মোট **অতিধনী খানার** সদস্যসংখ্যা আনুমানিক **৮৫ লক্ষ** (খানার সদস্যসহ, গড় খানার আকার ৪.০৬ জন) আর তাদের **খানার** সংখ্যা **২০** লক্ষ ৯৪ হাজার। এসব **অতিধনী** খানার মধ্যে ২০% (প্রতি ৫টি অতিধনী খানার ১টি) খানা আছে, যেখানে কমপক্ষে ১ জন ব্যক্তি পাওয়া যাবে, যার বছরে ব্যক্তিগত আয়কর হওয়ার কথা কমপক্ষে ১ কোটি টাকা। সে হিসাবে দেশের অতিধনী শ্রেণিভুক্ত ২০ লক্ষ ৯৪ হাজার খানার মধ্যে (২০২০ সালের হিসাবে) কমপক্ষে ৪ লক্ষ ১৮ হাজার খানা পাওয়া যাবে, যে খানাতে কমপক্ষে ১ জন ব্যক্তি আছেন যার বছরে কমপক্ষে ১ কোটি টাকা আয়কর দেওয়ার কথা। এর অর্থ হচ্ছে, **দেশে অতিধনী খানা থেকেই বছরে আনুমানিক ৪ লক্ষ ১৮ হাজার কোটি (ব্যক্তিগত) টাকা আয়কর আসার কথা (এখন আসে বড়জোর ২০০ কোটি টাকা)**। এই অর্থ আহরণ প্রয়োজন এবং সম্ভব। **এ অর্থ ব্যয় হতে হবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য হ্রাস-উদ্দিষ্ট খাতসহ 'সবুজ প্রযুক্তি' উন্নয়নে। বিষয়টি জরুরি এ জন্য যে সম্পদ আহরণের এ উৎসটি এমনই যে এ থেকে আহরিত অর্থ দিয়ে যে বিনিয়োগই করা হোক না কেন** (ধরা যাক বড় ধরনের অবকাঠামো যেমন পদ্মা সেতু অথবা জাতীয়ভিত্তিক ব্যাপক পাবলিক ওয়ার্কস অথবা মেগা স্বাস্থ্য-শিক্ষা কর্মসূচি), **তা হবে বিনিয়োগে সুদমুক্ত বা সুদবিহীন উৎস।**

(৫) অতিধনী (ধনীদের মধ্যে ধনী), ধনী (অতিধনী নয়), আর উচ্চ-মধ্যবিত্ত—এই তিন গ্রুপের জন্য আয়কর আরোপে তিন ধরনের স্লাব ব্যবহারের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

(৬) এখন আয়কর রিটার্নধারী (TIN: Tax Identification Number) মানুষের মোট সংখ্যা ৪০ লক্ষ ৫৩ হাজার, যাদের মধ্যে আনুমানিক ১৮ লক্ষ মানুষ আয়কর প্রদান করেন (যাদের আবার ১০ লক্ষ সরকারি চাকরিজীবী এবং অন্যান্য বিভিন্ন চাকরিতে নিয়োজিত)। কিন্তু আমাদের হিসাবে দেশে ধনী ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত মানুষের মোট সংখ্যা ৩ কোটি ৯১ লক্ষ (৩ নম্বর আইটেমে বলেছি)। এই ৩ কোটি ৯১ লক্ষ ধনী ও উচ্চ-মধ্যবিত্তদের বাস ৭৮ লক্ষ ৩২ হাজার খানায়; এসব খানার প্রতিটিতে কমপক্ষে ১ জন করে আয়কর প্রদান করলেও তো ধনী ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণিতেই তো মোট কর রিটার্নকারীর সংখ্যা হবে ৭৮ লক্ষ ৩২ হাজার। উপরে যে এখন দেশে মোট ৪০ লক্ষ ৫৩ হাজার আয়কর রিটার্নধারীর সংখ্যা বলা হয়েছে যার মধ্যে আনুমানিক ১৮ লক্ষ মানুষ আয়কর প্রদান করেন, তাদের ৪০%-৫০% হবেন মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত (হুবহু হিসেব দেওয়া দুষ্কর)। অর্থাৎ ধনী ও উচ্চ-মধ্যবিত্তদের মধ্যে আয়কর প্রদানকারীর সংখ্যা হবে বড়জোর ৯-১০ লক্ষ; অথচ এ সংখ্যাটাই হওয়ার কথা ৭৮ লক্ষ ৩২ হাজার। এর অর্থ দাঁড়ায় এ রকম যে **ধনী ও উচ্চ-মধ্যবিত্তদের ৮৭% কোনো ধরনের আয়কর প্রদান করেন না**। বিষয়টি ভাবনার—দুর্ভাবনার। কভিড-১৯ যে ধরনের মহামন্দা সৃষ্টি করে অর্থনীতি ও সমাজকে বিকল করেছে, আর ইউরোপের রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের যে ঋণাত্মক প্রভাব ইতিমধ্যে দৃশ্যমান—তাতে উত্তরণের অন্যতম পথ হিসেবে ধনী ও উচ্চ-মধ্যবিত্তদের থেকে আয়কর আদায়ের বিষয়টি সক্রিয়ভাবে ভাবতে হবে এবং সে অনুযায়ী পুরো কর আদায় ব্যবস্থাকে সাজাতে হবে।

(৭) দেশের সম্পদ, ভোগ ও আয়গত অবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণার জন্য প্রযোজ্য সবার আয়কর রিটার্ন নম্বর (TIN কার্ড) থাকা দরকার। TIN-নামধারীদের আয়কর প্রদান প্রযোজ্য হোক অথবা না-হোক সবাইকে নির্দিষ্ট ফি প্রদানের মাধ্যমে TIN নবায়ন ও রিটার্ন জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকা যুক্তিসংগত।

(৮) আয়কর রিটার্ন ফরম হতে হবে সহজবোধ্য এবং ফরমটি হবে বড়জোর ২ পৃষ্ঠার, যেখানে থাকবে নাম, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা, সম্পদের (জমি, বাড়ি-ফ্ল্যাট, অর্থ, সোনাদানা, শেয়ার-বন্ড-সঞ্চয়পত্র ইত্যাদি) স্বচ্ছ বিবরণ, মোট বার্ষিক আয় ও ব্যয়, সঞ্চয় ও উদ্বৃত্ত, প্রদেয় কর (সঞ্চয় ও উদ্বৃত্তের ওপর)।

(৯) মানুষকে কর প্রদানে উৎসাহিত করতে এবং একই সাথে কর রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর হার কমানো উচিত। ব্যক্তিপর্যায়ে কর হার হতে হবে 'প্রগেসিভ', বিভিন্ন স্লাবভিত্তিক, বেশি আয় বেশি কর হার নীতিভিত্তিক—আপাতত অতিধনী, ধনী ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত মানুষের জন্য।

(১০) কর প্রদান ব্যবস্থা হতে হবে অনলাইন (যে শ্রেণির কথা বলছি তারা অনলাইনে মোটামুটি অভ্যস্ত। প্রয়োজনে শিক্ষিত বেকার যুবকেরা এ কাজে সম্পৃক্ত হতে পারেন)।

(১১) কর আদায় কর্মকর্তারা যেন কর প্রদানকারীদের কোনো রকম হেনস্থা করতে না পারেন, সে বিষয়ে কার্যকর মেকানিজম থাকতে হবে (বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ)।

কর-রাজস্ব: ভ্যাট ও ট্যাক্স

(১) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (National Board of Revenue, NBR) ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (Bureau of Statistics) তথ্যমতে, বাংলাদেশে ভ্যাট লাইসেন্সধারীর সংখ্যা প্রায় ৯ লক্ষ। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে বড়জোর ১ লক্ষ লাইসেন্সধারীর কাছ থেকে (মোট ভ্যাট লাইসেন্সধারীর ১১%) বর্তমানে ভ্যাট আদায় হয়। এটি সুসংবাদ নয়। আমরা মনে করি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) পর্যায়ক্রমে ভ্যাট প্রদানকারীর প্রকৃত সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সক্ষম।

(২) সমগ্র অর্থনীতিতে **প্রাইভেট সেক্টরের** যে অবস্থান, তার সাথে বর্তমান কর আদায় কাঠামো সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ভ্যাটের আদায় বিশ্লেষণে দেখা যায়, বর্তমানে মোট আদায়কৃত ভ্যাটের ৬৫ শতাংশ আদায় হয় সরকারি খাত থেকে উৎসে কর্তন (Tax-at-source), আর মাত্র ৩৫ শতাংশ বেসরকারি খাত থেকে উৎসে কর্তন। সরকারি খাত থেকে উৎসে কর্তন মানেই জনগণের অর্থের কর্তন। আমাদের অর্থনীতিতে কাঠামোগত যে পরিবর্তন হয়েছে সে অনুযায়ী এই আদায়ের অনুপাতটা ঠিক উল্টো হওয়া যুক্তিসংগত, অর্থাৎ উৎসে কর্তনকৃত মোট আদায়ের ৩৫ শতাংশ হওয়া উচিত সরকারি (যা এখন ৬৫%), আর ৬৫ শতাংশ হওয়া উচিত বেসরকারি-প্রাইভেট (যা এখন ৩৫%)। অর্থনীতির কাঠামোগত এই পরির্বতন আমলে নিয়ে ভ্যাট আদায় করতে সক্ষম হলে একদিকে সরকারের মোট রাজস্ব কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাবে, আর অন্যদিকে জনগণের ওপর করের বোঝা কমবে এবং কর বৈষম্য হ্রাস পাবে—এসব নিয়ে কোনো সন্দেহই নেই।

(৩) ভ্যাট ও ট্যাক্স আদায়ের বর্তমান কাঠামো অর্থনীতির পরিবর্তিত কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ভ্যাট-ট্যাক্সের হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে মোট আদায়ের মধ্যে উৎসে কর্তন সূত্রে ৪৫.৫০ শতাংশ, পণ্য খাতে ৪৭ শতাংশ এবং সেবা খাতে ৮.১৫ শতাংশ। আবার ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষণে দেখা যায় আয়কর খাতে উৎসে কর্তন ৬৪.৩২ শতাংশ, ব্যক্তি খাতে ৯.৯৩ শতাংশ এবং প্রতিষ্ঠান খাতে ২৫.৭৩ শতাংশ। ভ্যাট এবং কর আদায়ের কাঠামোগত পরিবর্তন জরুরি। ভ্যাট আদায়ে সেবাখাত ও পণ্যখাতের অংশ তুলনামূলক বাড়ালে সার্বিক রাজস্ব আয় বাড়বে। গবেষণার ভিত্তিতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি। তবে গবেষণাটি হতে হবে নির্মোহ-বস্তুনিষ্ঠ (বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ)।

(৪) ভ্যাট-ট্যাক্স আদায়ের সংস্কৃতি পরিবর্তন করতে পারলে পরোক্ষ কর এবং প্রত্যক্ষ কর—উভয়েরই আদায় পরিমাণও ব্যাপক বৃদ্ধি পাবে। এক্ষেত্রে বিবেচনার বিষয় হতে পারে—ভ্যাট হার ও ট্যাক্স হার পুনর্ভাবনা এবং একই সাথে সমগ্র বিষয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং সেইসাথে "দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতা" নীতি বাস্তবায়ন করা। এসবে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি জরুরি।

কর রাজস্ব: তামাকজাত পণ্যে বর্ধিত হারে আবগারি শুল্ক

(১) বাংলাদেশে তামাকের অর্থনীতি ও কর রাজস্ব বিষয়ে নিরবচ্ছিন্ন ও নিবিড় গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে সবধরনের ধোঁয়াযুক্ত ও ধোঁয়াহীন তামাকজাতীয় পণ্যের ওপর উচ্চ হারে কর বসিয়ে তামাকজাত পণ্যের মূল্য বেশ পরিমাণে বাড়াতে পারলে দেশের আনুমানিক ৪ কোটি তামাক ব্যবহারকারীর বহু ধরনের স্বাস্থ্যহানিসহ অকালমৃত্যু কমবে এবং একই সাথে সরকার তামাক খাত থেকেই কয়েক হাজার কোটি টাকার অতিরিক্ত রাজস্ব আয় করতে পারবে।

(২) ধোঁয়াযুক্ত (সিগারেট ও বিড়ি) ও ধোঁয়াহীন (আলাপাতা, জর্দা, গুল) তামাকজাত পণ্যের ওপর শুল্ক বিষয়ে আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হলো নিম্নরূপ:

(ক) সিগারেটের ওপর প্রচলিত জটিল মূল্য স্তরভিত্তিক কর কাঠামো বাতিল করে এর পরিবর্তে সবধরনের সিগারেটের প্রতি ১০ শলাকার প্যাকেটের ওপর ৩৪ টাকা হারে একক কর (specific tax) আরোপ করলে সিগারেটের ওপর এক্সাইজ ট্যাক্সের (সম্পূরক শুল্ক) পরিমাণ দাঁড়াবে গড়ে খুচরা মূল্যের ৭০ শতাংশ (যা এ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ)। সবধরনের সিগারেটের ওপর ৭০ শতাংশ হারে একক সম্পূরক শুল্ক (specific excise tax) আরোপ করতে হবে। এর ফলে সিগারেটের দাম বাড়বে গড়ে ১৩০ শতাংশ, ধূমপান কমবে ৬৬ শতাংশ, প্রায় ৭০ লক্ষ ধূমপায়ী সিগারেট সেবন ছেড়ে দেবেন, প্রায় ৭১ লক্ষ তরুণ ধূমপান শুরু করা থেকে বিরত থাকবেন, প্রায় ৬০ লক্ষ অকালমৃত্যু রোধ করা যাবে (বর্তমান ধূমপায়ীর মধ্যে) এবং সেইসাথে সরকারের অতিরিক্ত কর রাজস্ব আহরণ হবে কমপক্ষে ১ হাজার ৭০০ কোটি টাকা।

(খ) বিড়ির ক্ষেত্রে প্রতি ২৫ শলাকার প্যাকেটের খুচরা মূল্যের ওপর ৪.৯০ টাকা হারে কর আরোপ করা হলে (গড় খুচরা মূল্যের ৪০%) এবং প্রকৃত মূল্যের ওপর ভ্যাট ধার্য করলে (সম্ভাব্য ফলাফল হবে) প্রায় ৩৪ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক বিড়ি সেবনকারী বিড়ি সেবন ছেড়ে দেবেন, প্রায় ৩৫ লক্ষ তরুণ নতুন করে বিড়ি সেবন শুরু করবেন না, প্রায় ২৫ লক্ষ অকাল মৃত্যু রোধ সম্ভব হবে (বর্তমান বিড়ি সেবনকারীর মধ্যে) এবং সেইসাথে সরকারের অতিরিক্ত কর রাজস্ব আহরণ হবে কমপক্ষে ৮০০ কোটি টাকা।

(গ) ধোঁয়াবিহীন তামাক যেমন জর্দা, গুল, সাদাপাতা-আলাপাতাসহ সবধরনের তামাকজাত পণ্যের ওপর ৭০ শতাংশ হারে কর আরোপ করতে হবে, যা এসব দ্রব্যের ব্যবহার কমাবে।

(ঘ) তামাকের মূল্য প্রতিবছর বাড়াতে হবে এবং কোনো অবস্থাতেই প্রকৃত মূল্য কমতে পারবে না—এ নীতি মেনে তামাকের ওপর কর-শুল্ক আরোপ করতে হবে।

(৩) তামাকপণ্যের খুচরা মূল্যের ওপর ৩ শতাংশ হারে সারচার্জ আরোপ করতে হবে। এই সারচার্জ থেকে বছরে আনুমানিক ১ হাজার কোটি টাকার বাড়তি রাজস্ব আয় সম্ভব। এই বাড়তি রাজস্ব আয় সরকার যেসব কাজে ব্যবহার করতে পারে, তার মধ্যে অন্যতম হতে পারে—তামাক ব্যবহারের ক্ষতি হ্রাসে জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন, মহামারি রোধসংশ্লিষ্ট জনস্বাস্থ্য খাত, শিক্ষার উন্নয়ন, তামাক চাষে নিয়োজিত কৃষক এবং তামাক পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমিকদের বিকল্প কর্মসংস্থান, তামাক নিয়ন্ত্রণসম্পর্কিত কর্মসূচি (গবেষণা ও প্রচার)।

(৪) তামাকের কর ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে হবে এবং কর সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে।

(৫) কর ফাঁকি রোধে শুল্কমুক্ত তামাক পণ্যের বিক্রি বন্ধ করতে হবে।

শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর হ্রাস অথবা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারকে যা বিবেচনায় রাখতে হবে

(১) বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন ও সামাজিক সংগঠন প্রাক্-বাজেট পর্যালোচনায় সরকারের কাছে করছাড়-হ্রাস-মওকুফ ও অন্যান্য সুবিধা দাবি করে থাকে। করোনাপরবর্তী এ বছরও তার ব্যত্যয় তো ঘটেইনি বরঞ্চ এবার তারা সবাই বেশি বেশি চাইছে। সার্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিচারে এসব দাবির যৌক্তিকতা যাই-ই হোক না কেন শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর হ্রাস অথবা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারের বিবেচ্য বিষয় হতে হবে: প্রকৃতিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস, অসমতা হ্রাস, ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য নিরসন ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করা।

রাজস্ব আয়ের নতুন উৎস

(১) কভিড-১৯-এর মহামন্দা আক্রান্ত সমাজ ও অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনে সরকারের নতুন নতুন আয়ের উৎস খুঁজে বের করা দরকার। এ অনুসন্ধানে আমরা বাজেটে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোট ২৭টি নতুন উৎস নির্দিষ্ট করেছি, যা অতীতে ছিল না। আমাদের প্রস্তাবিত সরকারি আয় বৃদ্ধির নতুন এসব উৎসের মধ্যে থাকবে (১) কালোটাকা উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি, (২) অর্থ পাচার উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি, (৩) সম্পদ কর, (৪) অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর (tax on excess profit) (অনলাইন ব্যবসা-বাণিজ্যসহ), (৫) বিলাসী দ্রব্য/পণ্যের ওপর কর (tax on luxury goods), (৬) সংসদ সদস্যসহ অন্যদের ওপর গাড়ির শুল্ক মওকুফ বাতিল-উদ্ভূত আহরণ, (৭) বিদেশি নাগরিকদের ওপর কর, (৮) সেবা থেকে প্রাপ্ত কর, (৯) বিমান পরিবহন ও ভ্রমণ কর, (১০) রয়্যালটি ও সম্পদ থেকে আয়, (১১) প্রতিরক্ষাবাবদ প্রাপ্তি, (১২) রেলপথ, (১৩) ডাক বিভাগ, (১৪) সরকারের সম্পদ বিক্রয়, (১৫) সেচবাবদ প্রাপ্তি, (১৬) তার ও টেলিফোন বোর্ড, (১৭) টেলিকম রেগুলেটরি কমিশন, (১৮) এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, (১৯) ইনস্যুরেন্স রেগুলেটরি কমিশন, (২০) সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, (২১) বিআইডাব্লিউটিএ, (২২) পৌর হোল্ডিং কর, (২৩) ডিজি হেলথ: বেসরকারি হাসপাতাল-ক্লিনিক-ডায়গনস্টিক সেন্টার অনুমতি ও নবায়ন ফি (permission and renewal

fees), (২৪) ডিজি ড্রাগস: ঔষধ প্রস্তুতকারী কোম্পানি লাইসেন্স এবং নবায়ন ফি, (২৫) বিউটিপার্লার সেবালব্ধ কর, (২৬) আবাসিক হোটেল/গেস্টহাউস ক্যাপাসিটি কর (capacity tax), (২৭) বিদেশি পরামর্শক ফি।

(২) উল্লিখিত ২৭টি উৎসের সবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় ভবিষ্যতের জন্য (বৈষম্য হ্রাসে রেন্টসিকিং সিস্টেমকে দুর্বল করার লক্ষ্যে) ৪টি উৎসে বিশেষ জোর দেওয়া শুরু করা প্রয়োজন: কালোটাকা উদ্ধার, পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার, সম্পদ কর এবং অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর।

বাজেট প্রণয়ন, কর প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

(১) সরকারি বাজেট আসলে কে প্রণয়ন করেন, কোথায় প্রণীত হয়—বাজেট প্রণেতারাই এসব ভালো বলতে পারবেন। তবে জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত বার্ষিক বাজেট বক্তৃতা শুরু হয় বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলসহ বিভিন্ন ঋণ জোগানদারদের সার্টিফিকেট দিয়ে। এ কথা নির্দ্বিধায় সত্য যে মুক্তবাজারের আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির আওতাধীন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থবাহী ত্রিরত্ন—বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার জাতীয় অর্থনীতির সামষ্টিক বিষয়াদির নীতিগুলোতে হস্তক্ষেপ ও চালকের আসনে বসাটা বাজেটে স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়। দেশের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতে এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ জরুরি।

(২) আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের বাজেট তৈরি করা হয় সব মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে এবং অর্থ বিভাগ তা চূড়ান্ত করে। বাজেট প্রণয়নের পুরো প্রক্রিয়াটা যেভাবে কাঠামোবদ্ধ, তাতে সৃজনশীল চিন্তা প্রয়োগের সুযোগ কম। প্রক্রিয়াটি মেকানিক্যাল বা যান্ত্রিক, যেখানে অতীতের খাতওয়ারি সংখ্যার শতকরা হার হ্রাস-বৃদ্ধি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এবং তা করা হয় নব্য-উদারবাদী অর্থনীতির মতাদর্শের ফর্দ অনুযায়ী। এ পদ্ধতিতে বড়জোর খাতভিত্তিক আয়-ব্যয়ের প্রবণতা দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যে প্রবণতাটি নিজেই সমস্যা—সমস্যার সমাধান নয়। এতে সমস্যার দোরগোড়ায় পৌঁছানো যায় না এবং বাজেট সামগ্রিক আর্থসামাজিক পরিবর্তনকামী হয় না। রাষ্ট্রীয় বাজেটের এ দুর্দশা কভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে আরো বাড়বে—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই এ অবস্থার নিরসনে আমরা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি 'রাজস্ব কমিশন' গঠনের প্রস্তাব করছি। এই 'রাজস্ব কমিশন' স্থায়ীও হতে পারে। কমিশনের কাজ হবে প্রতিবছর বাজেট প্রণয়নের আগে দেশে বৈষম্য-অসমতার ক্রমবৃদ্ধি ও একই সাথে ঘুষ-দুর্নীতি-কালোটাকা-অর্থ পাচার বৃদ্ধির কারণ-পরিণাম বিবেচনায় রেখে জনগণকে কম কষ্ট দিয়ে সরকারের আয় বৃদ্ধির পথ-পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি, ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম গতিশীল করা, দুর্নীতি দমন কমিশনকে সহায়তা প্রদান, পর্যাপ্ত রাজস্ব সংগ্রহ, সরকারি ব্যয় ও অপচয় হ্রাস—এসব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দেওয়া।

(৩) জ্ঞানভিত্তিক-পেশাদার রাজস্ব প্রশাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা—বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজস্ব বিভাগের প্রধান ব্যক্তিরা রাজস্ব প্রশাসনের দক্ষ-অভিজ্ঞ-সৎ ব্যক্তিদের মধ্যে

থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। বাংলাদেশের স্বাধীনতাত্তোরকালে সেটাই ছিল। কিন্তু ১৯৭৯ সালে সামরিক শাসনে জারিকৃত ফরমানে সাধারণ প্রশাসনের আমলাদের স্বার্থে তা বাতিল করা হয়। এ বিষয়ে আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হলো—জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট অন্য সকল ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পদে (চেয়ারম্যান) রাজস্ব প্রশাসনে দক্ষ-অভিজ্ঞ-সৎ ব্যক্তিদের পদায়ন করতে হবে।

(৪) অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে কর প্রশাসনের আওতা জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়নপর্যায় পর্যন্ত নেওয়া যেতে পারে। তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগে কাজটি তুলনামূলক সহজ। কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং/ অথবা যোগ্য পরামর্শক সংস্থা নিয়োগ করে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়নপর্যায়ে 'করদাতা শুমারি' সম্পন্ন করা জরুরি। সুনির্দিষ্ট টার্মস-অব-রেফারেন্সের ভিত্তিতে নিয়োজিত সংস্থার মাধ্যমে প্রতিবছর ডিসেম্বরের মধ্যে সারা দেশে 'করদাতা শুমারি' এবং 'সম্পদ শুমারির' কাজ সম্পাদন করে পরবর্তী অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নসহ আনুষঙ্গিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তা ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

(৫) ভ্যাট ও ট্যাক্স আদায় বৃদ্ধিসহ স্থানীয় সম্পদের পূর্ণাঙ্গ ইনভেন্টরি এবং একই সাথে স্থানীয় সম্পদের স্থানিক ব্যবহার-সম্ভাবনা বিচার-বিশ্লেষণের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে দেশের সব উপজেলায় (৫৪৪টি উপজেলা) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে থানা/ উপজেলা রাজস্ব অফিস প্রতিষ্ঠা উপকারী হবে। এর ফলে একদিকে যেমন সরকারের রাজস্ব আদায় বাড়বে, অন্যদিকে বাড়বে শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থান। আবার ভ্যাট-ট্যাক্সসংক্রান্ত বিষয়াদি এবং স্থানীয় সম্পদের মজুদ হালনাগাদসহ জাতীয়পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট তথ্যভাণ্ডারও গড়ে উঠবে। দেশকে প্রকৃতির প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধাভিত্তিক শোভন সমাজ-অর্থনীতি ব্যবস্থার পথে উত্তরণের ক্ষেত্রেও এসব প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম।

(৬) ১৯৮৪ সালের আইন অনুযায়ী বিদেশি নাগরিকেরা বাংলাদেশে ট্যাক্স প্র্যাকটিস করতে পারেন না। কিন্তু এই আইন পাশ কাটিয়ে বৈধ ওয়ার্ক পারমিট ছাড়াই বিদেশিরা এখানে কর এবং ভ্যাট অফিসে প্র্যাকটিস করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ অভিযোগ গুরুতর এবং তার সত্যতা যাচাইপূবর্ক অবিলম্বে এসব অবৈধ বিদেশির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং এনবিআরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সুপারিশ করছি। বিদেশিরা সরকারের জাতীয় বাজেটের মতো গুরুত্বপূর্ণ সার্বভৌম দলিল প্রণয়নেরও স্বপ্ন দেখেন; এমনকি তারা এ নিয়ে রাজস্ব বোর্ডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করেছেন বলেও অভিযোগ করা হয়। সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনকারী এই অশুভ-অনৈতিক অবস্থার দ্রুত অবসান ঘটাতে হবে।

কালোটাকা

এক হিসাবে ১৯৭২-৭৩ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত ৪৬ বছরে বাংলাদেশে সৃষ্ট মোট কালোটাকার আনুমানিক পরিমাণ হবে ৮৮ লক্ষ ৬১ হাজার ৪৩৭ কোটি টাকা, যা ওই সময়কালের মোট

দেশজ উৎপাদনের (জিডিপির; ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত, যার মোট পরিমাণ ২ কোটি ৬৬ লক্ষ ১০ হাজার ৯২১ কোটি টাকা) ৩৩.৩ শতাংশের সমপরিমাণ (সারণি ২)।

সারণি ২: বাংলাদেশে কালোটাকার আনুমানিক পরিমাণ: অর্থবছর ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১৮-১৯

অর্থবছর	জিডিপি (কোটি টাকায়)		কালোটাকার আনুমানিক পরিমাণ (কোটি টাকায়): জিডিপির ৩৩.৩% এর সমপরিমাণ হলে
	নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে	২০১৮-১৯ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে	
১৯৭২-৭৩	৪,৯৮৫	৫৪,৪০৫	১৮,১১৭
১৯৭৩-৭৪	৭,৫৭৫	৮০,১৬৯	২৬,৬৯৬
১৯৭৪-৭৫	১২,৫৭৪	৭৭,২৯৩	২৫,৭৩৯
১৯৭৫-৭৬	১০,৭৪৬	৬০,৩৫৯	২০,১০০
১৯৭৬-৭৭	১০,৫৩৬	৫৭,০০৯	১৮,৯৮৪
১৯৭৭-৭৮	১৩,০২৯	৭২,৬৯৮	২৪,২০৮
১৯৭৮-৭৯	১৪,৪৭৭	৭৭,৮৩৩	২৫,৯১৯
১৯৭৯-৮০	১৭,২৪৫	৯৭,৯৭৮	৩২,৬২৭
১৯৮০-৮১	১৯,৫৯৬	৯২,৪৫৮	৩০,৭৮৮
১৯৮১-৮২	২৬,৫১৪	১০০,৪৯৬	৩৩,৪৬৫
১৯৮২-৮৩	২৮,৮৪২	৯৯,০০৪	৩২,৯৬৮
১৯৮৩-৮৪	৩৪,৯৯২	১১৬,৮২১	৩৮,৯০২
১৯৮৪-৮৫	৪১,৬৯৬	১২৫,২৬৭	৪১,৭১৪
১৯৮৫-৮৬	৪৬,৬২৩	১২৯,৪২৫	৪৩,০৯৯
১৯৮৬-৮৭	৫৩,৯২০	১৪৬,৩০০	৪৮,৭১৮
১৯৮৭-৮৮	৫৯,৭১৪	১৫৯,৪৪৫	৫৩,০৯৫
১৯৮৮-৮৯	৬৫,৯৬০	১৭১,৪৩৮	৫৭,০৮৯
১৯৮৯-৯০	১০০,৩২৯	২৭৩,২৭৯	৯১,০০২
১৯৯০-৯১	১১০,৫১৮	২৫৯,৮৪৪	৮৬,৫২৮
১৯৯১-৯২	১১৯,৫৪২	২৫৭,৮৯৮	৮৫,৮৮০
১৯৯২-৯৩	১২৫,৩৭০	২৬৫,০২৭	৮৮,২৫৪
১৯৯৩-৯৪	১৩৫,৪১২	২৮৩,৪০৪	৯৪,৩৭৪
১৯৯৪-৯৫	১৫২,৫১৮	৩২০,৪০২	১০৬,৬৯৪

সারণি ২ চলমান...

অর্থবছর	জিডিপি (কোটি টাকায়)		কালোটাকার আনুমানিক পরিমাণ (কোটি টাকায়): জিডিপির ৩৩.৩% এর সমপরিমাণ হলে
	নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে	২০১৮-১৯ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে	
১৯৯৫-৯৬	১৬৬,৩২৪	৩৩৫,৫৬৩	১১১,৭৪৩
১৯৯৬-৯৭	১৮০,৭০১	৩৪৮,৬৬৪	১১৬,১০৫
১৯৯৭-৯৮	২০০,১৭৭	৩৬৪,৪৮৩	১২১,৩৭৩
১৯৯৮-৯৯	২১৯,৬৯৭	৩৮১,৮২৩	১২৭,১৪৭
১৯৯৯-০০	২৩৭,০৮৬	৩৯১,৭৮৬	১৩০,৪৬৫
২০০০-০১	২৫৩,৫৪৬	৩৭৭,০৮৮	১২৫,৫৭০
২০০১-০২	২৭৩,২০১	৩৯৯,৯৪৯	১৩৩,১৮৩
২০০২-০৩	৩০০,৫৮০	৪৪০,০৩০	১৪৬,৫৩০
২০০৩-০৪	৩৩২,৯৭৩	৪৭৫,০১৬	১৫৮,১৮০
২০০৪-০৫	৩৭০,৭০৭	৫০৬,৯৩১	১৬৮,৮০৮
২০০৫-০৬	৪৮২,৩৩৭	৬০৩,৪৯৬	২০০,৯৬৪
২০০৬-০৭	৫৪৯,৮০০	৬৬৮,৯৭৯	২২২,৭৭০
২০০৭-০৮	৬২৮,৬৮২	৭৬৯,৯৭৪	২৫৬,৪০১
২০০৮-০৯	৭০৫,০৭২	৮৬১,১১৪	২৮৬,৭৫১
২০০৯-১০	৭৯৭,৫৩৯	৯৬৮,৬৭৮	৩২২,৫৭০
২০১০-১১	৯১৫,৮২৯	১,০৮০,৬০৯	৩৫৯,৮৪৩
২০১১-১২	১,০৫৫,২০৪	১,১১৯,৪১১	৩৭২,৭৬৪
২০১২-১৩	১,১৯৮,৯২৩	১,২৬০,৩২৯	৪১৯,৬৮৯
২০১৩-১৪	১,৩৪৩,৬৭৪	১,৪৫২,৭৬৫	৪৮৩,৭৭১
২০১৪-১৫	১,৫১৫,৮০২	১,৬৩৯,৮১৮	৫৪৬,০৫৯
২০১৫-১৬	১,৭৩২,৮৬৪	১,৮৬০,৪২১	৬১৯,৫২০
২০১৬-১৭	১,৯৭৫,৮১৭	২,০৯৮,০৮৭	৬৯৮,৬৬৩
২০১৭-১৮	২,২৫০,৪৮১	২,৩০৩,১৬৯	৭৬৬,৯৫৫
২০১৮-১৯	২,৫২৪,৪৮৪	২,৫২৪,৪৮৪	৮৪০,৬৫৩
মোট	**২১,৪২৪,২১৪**	**২৬,৬১০,৯২১**	**৮,৮৬১,৪৩৭**

উৎস: বারকাত, আবুল (২০২০), বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা। পৃ. ৪৯৪-৪৯৫

কালোটাকার বিগত ৪৬ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০১৮/১৯) ইতিহাস থেকে এটাও প্রক্ষেপণ সম্ভব যে সবকিছু যেমন চলছে, তেমনই চলতে থাকলে কালোটাকার মালিকেরা যে উৎপাদনশীল বিনিয়োগ করে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তুলতে সক্ষম ও ইচ্ছুক—এমন ভাবনা অলীক বৈ কিছু নয়। সবকিছু বিচারে কালোটাকার রাজনৈতিক অর্থনীতির মর্মবস্তুসহ কালোটাকার মালিকদের এহেন প্রভাব-প্রতাপ ইতিমধ্যে যেসব মারাত্মক 'স্বাভাবিক অঘটন' ঘটিয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ:

(১) তারা সমগ্র সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্রকাঠামোকেই এমন বিকৃত করে ছেড়েছে, যা বজায় রেখে শোষণমুক্ত-বৈষম্যহীন-অসাম্প্রদায়িক সমাজ—শোভন সমাজব্যবস্থা গড়া অসম্ভব;

(২) কালোটাকার ঋণাত্মক প্রভাব পড়েছে সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতি—সর্বত্র, যে কারণে এখন 'অর্থপূজা' সর্বজনীনতা পেয়েছে, এখন 'অর্থপূজা'র ওপরে আর কোনো পূজা নেই;

(৩) অতীতে দেশে রাজনীতি ও অর্থনীতির মধ্যে যে ভারসাম্য ছিল, সেটি আর নেই। অতীতে সরকার ও ক্ষমতার মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল সেটি বিনষ্ট হয়েছে। অতীতে সরকার-এর (government) হাতে ক্ষমতা (power) ছিল—এখন নেই; এখন সরকার সরকারের জায়গায় আছেন, তবে ক্ষমতাহীন; ক্ষমতা রাজনীতি থেকে অভিবাসিত হয়েছে অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক কালোটাকার মালিক-রেন্ট সিকার-লুটেরা-পরজীবী-অনুৎপাদনশীল নিকৃষ্ট পুঁজির হাতে (power has migrated from politics to rent seeking economics);

(৪) কালোটাকার মালিক গোষ্ঠী/ শ্রেণি 'গণতন্ত্রমুক্ত জোনের বাসিন্দা' (resides in the 'democracy free' zone) এবং গণতন্ত্রকে তারা ভোটের খেলা বানিয়ে ছেড়েছে-ছাড়বে, যেখানে মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগের স্বাধীনতা বা প্রয়োজন কোনোটাই থাকবে না;

(৫) কালোটাকার দেশীয় মালিকেরা বৈশ্বিক কালোটাকা-বৈশ্বিক রেন্টসিকার আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির অধীনস্থ-দোসর;

(৬) কালোটাকার মালিকগোষ্ঠী তাদের কালোটাকা দিয়ে আর যা-ই করুক না কেন দেশের মানুষের 'মোট চাহিদা' (বা aggregate demand) বাড়াতে সক্ষম নয়;

(৭) কালোটাকা এমনকি উৎপাদনশীল অর্থপুঁজিতে রূপান্তরে ভীত অথবা আগ্রহী নয়;

(৮) কালোটাকার বিস্তৃতি সমাজ অর্থনীতিতে বৈষম্য বাড়িয়েছে-বাড়াচ্ছে-বাড়াবে, ফলে উত্তরোত্তর অধিক হারে মানুষ বহুমুখী বিচ্ছিন্নতার শিকার হতে বাধ্য;

(৯) কালোটাকার এহেন বিস্তৃতি সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র-সরকারের চরম ভারসাম্যহীনতা ও অস্থিতিশীলতার কারণ হতে বাধ্য;

(১০) যেভাবে চলছে, সেভাবে চলতে থাকলে—বাংলাদেশে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হতে পারে ফ্যাসিস্ট সরকার, ইসলাম ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী। আর অবস্থা পরিবর্তিত হলে হবে সামাজিক-অর্থনৈতিক মৌলিক পরিবর্তন, যখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও অসাম্প্রদায়িক-আলোকিত মানুষের—শোভন সমাজ বিনির্মাণের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে আমরা কালোটাকা উদ্ধার থেকে ১০ হাজার কোটি টাকা আহরণের প্রস্তাব করছি (দেখুন, সারণি ৭)।

অর্থ পাচার

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশে অর্থ পাচারের পরিমাণ হবে কমপক্ষে ৭৫,৭৩৪ কোটি টাকা, যা একই অর্থবছরের সৃষ্ট মোট কালোটাকার (৮ লক্ষ ৪১ হাজার ৪১৯ কোটি টাকা) ৯ শতাংশের সমপরিমাণ এবং একই অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের ১৬.৩ শতাংশের সমপরিমাণ। আমাদের হিসাবে বিগত ৪৬ বছরে (১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে) দেশের মোট অর্থ পাচারের পরিমাণ হবে কমপক্ষে ৭ লক্ষ ৯৮ হাজার ৩২৭ কোটি টাকা। আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আমরা অর্থ পাচার উদ্ধার থেকে ৫ হাজার কোটি টাকা প্রাপ্তি সম্ভব বলে মনে করি (দেখুন, সারণি ৭)।

দুর্নীতি রোধ, কালোটাকা ও অর্থ পাচার উদ্ধার-উদ্দিষ্ট প্রধান সুপারিশ

(১) "দুর্নীতি, কালোটাকা ও অর্থ পাচার"সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি স্বাধীন কমিশন ("Independent Commission on Corruption, Black Money and Money Laundering") গঠন করা হোক। এই কমিশনের প্রধান কাজ হবে দুর্নীতি, কালোটাকা ও অর্থ পাচারসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড নিরন্তর চালিয়ে যাওয়া এবং অনুসন্ধান-গবেষণাফল প্রতি তিন মাস অন্তর দেশের সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে জনগণকে অবহিত করা। একই সাথে কমিশনের নিজস্ব ভেরিফায়েড ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ করা। প্রস্তাবিত এই স্বাধীন কমিশন পরিচালনের প্রধান নীতি-দর্শন (principle philosophy) হবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের "সংবিধানের প্রাধান্য"—৭ (১) ও ৭ (২) অনুচ্ছেদ: *"(১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবলমাত্র এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে। (২) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয় তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল হইবে।"* প্রস্তাবিত এ কমিশন যেহেতু স্বাধীন, সেহেতু কমিশন তার কাজের জন্য সরাসরি জনগণের কাছেই জবাবদিহি করবে (প্রয়োজনে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের প্রধানের কাছে রিপোর্ট করবে)। মোট ৯ জন সদস্য নিয়ে প্রস্তাবিত এ কমিশন গঠিত হবে, যার মধ্যে ১ জন প্রধান কমিশনার (নারী অথবা পুরুষ) ও ৮ জন কমিশনার (৪ জন নারী ও ৪ জন পুরুষ)। কমিশন তার কর্মসম্পাদনে মোট ১০০ জন গবেষক-গবেষণা সহকারী নিযুক্ত করবে। প্রধান কমিশনারসহ সব কমিশনার নিয়োগ দেবেন রাষ্ট্রের প্রধান; নিযুক্তিকাল হবে ৩-৫ বছর; কমিশনারদের যে-কেউ যেকোনো সময় ইস্তফা দিতে পারবেন (ইস্তফার কারণ উল্লেখ অথবা উল্লেখ না করে); এবং নিযুক্তিকালে ছেড়ে চলে যেতে বলার দায়দায়িত্ব থাকবে রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে। কমিশনের সদস্য হতে পারবেন শুধু তারা, যারা স্ব-গুণাবলি, দেশপ্রেম ও জ্ঞানসমৃদ্ধতার কারণে জনসাধারণ্যে পরিচিত এবং সম্মানিত। এই কমিশনে নিম্নলিখিত ক্যাটেগরির কোনো ব্যক্তি (তিনি ওই ক্যাটেগরিতে বর্তমানে কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত যেটাই হোক না কেন) কমিশনার (কমিশন সদস্য) হতে পারবেন না: আমলা, সামরিক বাহিনীসহ

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, (পেশাগত) ব্যবসায়ী-শিল্পপতি, রাজনৈতিক দলের সদস্য, গণমাধ্যমের মালিক। রাষ্ট্র কমিশনকে এককালীন ১০০ কোটি টাকার ৩ বছরের বাজেট অগ্রিম দেবেন (প্রধান কমিশনার রাষ্ট্রের সাথে বাজেটে স্বাক্ষর করবেন), কমিশন প্রতি ৩ মাস অন্তর কমিশনের আয়-ব্যয় জনসম্মুখে উপস্থাপন করবে; গঠনের ৩ মাসের মধ্যে রাষ্ট্র কমিশনের জন্য বহুতল স্থায়ী কমিশন ভবনের ব্যবস্থা করবে; রাষ্ট্র কমিশনে কর্মরত সবার পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। প্রস্তাবিত এ কমিশন স্বাধীন, বিধায় কমিশনের সাথে বর্তমান দুর্নীতি দমন কমিশনের তেমন কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে স্বাধীন এই কমিশন প্রয়োজনে দুর্নীতি দমন কমিশন সম্পর্কে বলতে পারবে। দুর্নীতির কারণে, কালোটাকার মালিক হওয়ার কারণে, অর্থ পাচার করার কারণে প্রস্তাবিত এই কমিশন কাউকে শাস্তি দিতে পারবে না; শুধু সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশ্লেষণপূর্বক রাষ্ট্রপতি এবং/ অথবা প্রধান বিচারপতির বরাবর শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সুপারিশ প্রেরণ করতে পারবে।

(২) আমাদের প্রস্তাব হলো—আগামী ১ বছরে (অর্থবছর ২০২৪-২৫) ১০ হাজার কোটি কালোটাকা এবং ৫৯ হাজার ৬২৫ কোটি টাকা পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার করতে হবে। এবং পরবর্তী অর্থবছরগুলোতে এই ধারা উত্তরোত্তর জোরদার করতে হবে। এ কর্মকাণ্ডে সম্ভাব্য যাদের সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে, তাদের মধ্যে রয়েছে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি-সম্পর্কিত জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট কমিটি-কমিশন, (প্যারিসভিত্তিক) ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্স, গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি রিপোর্ট প্রণেতাদের সংস্থা (তবে নির্মোহ বিচার-বিশ্লেষণের পরে), প্রধান বিচারপতি, জাতীয় সংসদের স্পিকার, সংসদের সব স্থায়ী কমিটি, অ্যাটর্নি জেনারেল, প্রজাতন্ত্রের মহা হিসাব নিরীক্ষক, দেশের আইনশৃঙ্খলা প্রধান, বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি-সংশ্লিষ্ট অফিস, দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য।

৪.২৩ মন্ত্রণালয়সমূহের ভৌগোলিক বিকেন্দ্রীকরণ (স্থানান্তরকরণ) এবং মন্ত্রণালয়, বিভাগ, স্থানীয় সরকার, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান, সাধারণ প্রশাসন, দাপ্তরিক বিকেন্দ্রীকরণ (স্থানান্তরকরণ)

দেশে যেভাবে সবকিছু এককেন্দ্রিক বা ঢাকামুখী হচ্ছে তা উন্নয়নসহায়ক নয়। এ বিষয়ে অর্থনীতির অনেক মৌলিক কর্মকাণ্ড (শিল্পায়ন, নগরায়ণ প্রভৃতি) থেকে শুরু করে অনেক প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড (দপ্তর, অধিদপ্তর, এমনকি মন্ত্রণালয়) রাজধানী ঢাকার বাইরে স্থানান্তর করা যুক্তিসংগত। এ বিষয়ে আসন্ন বাজেটে দিকনির্দেশনা থাকা জরুরি। আমরা মনে করি, সময় এসেছে মন্ত্রণালয়সমূহের ভৌগোলিক স্থানান্তর-বিকেন্দ্রীকরণ। এই লক্ষ্যে আমাদের সুনির্দিষ্ট সুপারিশসমূহ সারণি ৩-এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৩: কেন্দ্রীভূত (ঢাকাকেন্দ্রিক) মন্ত্রণালয়সমূহের ভৌগোলিক বিকেন্দ্রীকরণ প্রস্তাব

মন্ত্রণালয়ের (বর্তমান) নাম	যে বিভাগে বিকেন্দ্রীকরণের (স্থানান্তরের) প্রস্তাব করা হচ্ছে
(১) প্রতিরক্ষা, (২) পররাষ্ট্র, (৩) অর্থ, (৪) স্বরাষ্ট্র, (৫) জনপ্রশাসন, (৬) শিক্ষা, (৭) আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক, (৮) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, (৯) পরিকল্পনা, (১০) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, (১১) খাদ্য, (১২) সড়ক পরিবহন ও সেতু, (১৩) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ, (১৪) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, (১৫) মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক, (১৬) সংস্কৃতিবিষয়ক, (১৭) ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি	ঢাকা
(১) বাণিজ্য, (২) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন, (৩) পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক, (৪) ধর্ম	চট্টগ্রাম
(১) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন, (২) শিল্প, (৩) বস্ত্র ও পাট, (৪) রেলপথ	খুলনা
(১) স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, (২) যুব ও ক্রীড়া, (৩) মহিলা ও শিশুবিষয়ক, (৪) তথ্য ও সম্প্রচার	রাজশাহী
(১) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, (২) শ্রম ও কর্মসংস্থান	সিলেট
(১) গৃহায়ণ ও গণপূর্ত, (২) সমাজকল্যাণ	রংপুর
(১) পানিসম্পদ, (২) নৌ-পরিবহন, (৩) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ, (৪) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	বরিশাল
(১) কৃষি, (২) ভূমি	ময়মনসিংহ

(১) সকল মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগে স্ব-স্ব আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা প্রয়োজন। বর্তমানে মন্ত্রণালয়গুলো এই আর্থিক বিবরণী প্রণয়ন করে না। এক্ষেত্রে পাইলট ভিত্তিতে একটি মন্ত্রণালয়ে "আর্থিক বিবরণী মডেল" করে তা মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের পরে বাকি ৪২টি মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এ পদ্ধতিতে সব মন্ত্রণালয়ের আর্থিক বিবরণী সংযুক্ত করে কেন্দ্রীয় সরকারের "সংহত আর্থিক বিবরণী" প্রণয়ন করা যেতে পারে। আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তুলনামূলক অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের আর্থিক বিরবণী প্রণয়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। পরবর্তী বছরগুলোতে পরিকল্পিতভাবে সময় বেঁধে দিয়ে অন্য মন্ত্রণালয়সমূহে তা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

(২) দেশের জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে আর্থিক ব্যবস্থাপনার অবস্থা মূল্যায়নে মানসম্মত আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং মডেল প্রণয়ন প্রয়োজন। এ বিষয়ে রুলস অব বিজনেস-এর বাস্তবায়ন দরকার।

(৩) সরকারের সাধারণ প্রশাসনিক ব্যয় যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার-উদ্দিষ্ট নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ বাজেটে প্রতিফলিত হওয়া জরুরি: (ক) জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রামপর্যায়ের স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক করে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতাকে কার্যকরভাবে বিকেন্দ্রীকরণ; (খ) ঢাকাসহ দেশের সব সিটি করপোরেশনে 'সিটি গভর্নমেন্ট' গঠন এবং রাজধানী উন্নয়ন কর্পোরেশন (ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ), চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্পোরেশন, রাজশাহী উন্নয়ন কর্পোরেশন, খুলনা উন্নয়ন কর্পোরেশন, বরিশাল উন্নয়ন কর্পোরেশন, সিলেট উন্নয়ন কর্পোরেশনের মতো আলাদা আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে অবিলম্বে সিটি গভর্নমেন্টের আওতায় আনা; এবং (গ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাজস্ব আহরণের জন্য স্থানীয়পর্যায়ে কর/ ফি আহরণের ব্যবস্থা সম্প্রসারণ এবং তা স্থানীয় উন্নয়নে ব্যবহার করা।

(৪) সরকারের পরিচালন ব্যয় (operating expenditure) কমানো নিয়ে বাজেটে সুস্পষ্ট কোনো দিকনির্দেশনা থাকে না। কভিড-১৯-এর মহাবিপর্যয় আর যুদ্ধসহ অর্থনৈতিক মন্দার কারণে বিষয়টির গুরুত্ব অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি। সরকারের আয়-ব্যয়ের কোন কোন খাত-ক্ষেত্রে কাজের পরিমাণ ও মান অক্ষুণ্ন রেখে কীভাবে কতটুকু পরিচালন ব্যয় কমানো সম্ভব, তার পথনির্দেশ বাজেটে থাকা প্রয়োজন।

(৫) গণতান্ত্রিক শিষ্টাচারের প্রতি সম্মান রেখে সরকারের আয়-ব্যয়সংশ্লিষ্ট 'ফিসক্যাল কর্মকর্তাদের' স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে খর্ব করে ঘুষ-নীতি বিলুপ্তির লক্ষ্যে 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতা' (zero tolerance) দৃশ্যমান করতে হবে। এ বিষয়ে বাজেটে দিকনির্দেশনা থাকা জরুরি। রেন্টসিকার-অধ্যুষিত সমাজ-অর্থনীতিতে বিষয়টি সহজ নয়, তবে তা সমৃদ্ধ জাতি গঠনে আবশ্যিক শর্ত।

(৬) সাধারণ প্রশাসনসংক্রান্ত সরকারি ব্যয়ের খাতসমূহে যুগোপযোগী ও কার্যকর প্রশাসনিক সংস্কারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হলে আধুনিক প্রযুক্তির, বিশেষত তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির সহায়তায় এ দুটো খাতে সরকারি ব্যয় কমিয়ে আনা সম্ভব। আমলাতন্ত্রের বহুমুখী জাল বিস্তারের সহজাত প্রবণতা এবং যত্রতত্র আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা বিস্তারের প্রয়াস বন্ধ করতে হবে। এ প্রবণতা বন্ধ করতে হবে শুধু সরকারি রাজস্ব ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যেই নয়, সেইসাথে তথ্য গোপনের সংস্কৃতি, সর্বগ্রাসী দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, দীর্ঘসূত্রতা, অপ্রয়োজনীয় পদ্ধতিগত জটিলতা এবং অর্থনীতির সকল উৎপাদনশীল খাতের অগ্রগতির পথে বাধা অপসারণের উদ্দেশ্যেও। এসব কর্মকাণ্ড "ব্যবসা ব্যয়" (cost of doing bussiness) হ্রাস এবং "ব্যবসা সহজীকরণ"-এ (ease of doing bussiness) সহায়ক হবে; অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বাড়াবে, বাড়াবে কর্মসংস্থান। সরকারি রাজস্ব ব্যয়ের বহুগুণ বেশি জাতীয় আয় ও সম্পদ বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অবৈধ পথে—কালো পথে উৎপাদনশীল খাত থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছে। দেশীয় উদ্যোক্তারা নিরুৎসাহিত হচ্ছেন। সকল স্তরের জনগণ দুর্নীতির অসহায় শিকারে পরিণত হচ্ছেন। আবার আমাদের এসব কথার অর্থ এই নয় যে—আমরা ক্ষুদ্রায়তন সরকারের পক্ষে; আমরা কোনো অর্থেই রাষ্ট্রকে নেহায়েত 'নৈশপ্রহরী' বানানোর পক্ষে নই। আমাদের মতে, রাষ্ট্র মানে শুধু আইন প্রণয়নকারী (Legislative) এবং নিয়ন্ত্রণকারী (Regulator) নয়, রাষ্ট্র মানে মুক্তিযুদ্ধের

চেতনায় বৈষম্যহীন ও অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণের প্রধান প্রতিষ্ঠান, যা পরিচালিত হবে "জনগণই প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক" নীতির ভিত্তিতে। আমরা মনে করি, বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও অসাম্প্রদায়িক-আলোকিত মানুষের সমাজ বিনির্মাণে রাষ্ট্রকে তার তিনটি বৃহৎবর্গীয় স্বাধীন, দেশপ্রেমিক ও পরস্পরসম্পর্কিত অঙ্গ—আইন প্রণয়ন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগসমূহকে (Legislative, Judiciary, Executive) উত্তরোত্তর অধিকতর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে; এসব বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে করতে হবে আর্থিক বিচারে শক্তিশালী এবং নৈতিকভাবে জনকল্যাণকামী। রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানসমূহ উত্তরোত্তর জনকল্যাণকামী ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বাজেটে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি স্পষ্ট করা জরুরি।

(৭) সরকারপ্রচলিত সংগ্রহ পদ্ধতির দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি। বর্তমান পদ্ধতি দীর্ঘসূত্রতামূলক, ব্যয় বৃদ্ধিমুখী এবং অনেক ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের দ্রব্য ও সেবা প্রদানপ্রবণ। এ অবস্থা প্রশমনে ইতিমধ্যে চালুকৃত ইলেকট্রনিক সরকারি সংগ্রহ (e-GP) ও ইলেকট্রনিক দরপত্র (e-tendering) পদ্ধতিতে অনেক দুর্নীতি-অনিয়ম। কিন্তু প্রযুক্তিনির্ভর এসব পদ্ধতি চালুর আগে বলা হয়েছিল যে এসব চালু হলে দ্রব্য ও সেবার মূল্য ১২ শতাংশ কমে যাবে। এসব হয়নি। আসলে যন্ত্রের পেছনের মানুষ এবং যন্ত্র যে আর্থসামাজিক পরিবেশে কাজ করে—সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি নিয়ে যুক্তিসংগত ভাবনা-কথা সরকারের উন্নয়নদর্শন ও কর্মকাণ্ডে দৃশ্যমান হতে হবে।

(৮) বাজেটে অন্তর্ভুক্তিযোগ্য আরো কয়েকটি গুরুত্বর্পূণ বিষয় উল্লেখ প্রয়োজন। বিষয়গুলো এ রকম: (ক) জনমত যাচাইয়ের লক্ষ্যে বাজেট ঘোষণার অন্তত ছয় মাস আগে বাজেটের মূল বিষয়াদি (প্রধান ব্যয় খাত অনুযায়ী অনুমিত/ সম্ভাব্য ব্যয়-বরাদ্দ, উৎস অনুযায়ী সম্ভাব্য আয়) প্রকাশ করা উচিত; (খ) উন্নয়ন বাজেটে অর্থবছরের মাঝখানে অননুমোদিত কোনো প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হলে তার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি থাকতে হবে; (গ) সবধরনের দুর্নীতি, দুর্নীতির উৎস ও দুর্নীতি নিরসনে সরকারের পরিকল্পনা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার লক্ষ্যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে; এবং (ঘ) বছরের ১ জানুয়ারি (ইংরেজি ক্যালেন্ডার ইয়ার) কিংবা ১ এপ্রিল (বাংলা নববর্ষ) থেকে অর্থবছর গণনার কথা বিবেচনা করা।

৪.২৪ বাজেট বাস্তবায়নসংশ্লিষ্ট বিষয়

বাজেটের উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের স্বল্প হার নিয়ে প্রায়ই বলা হয় যে 'প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যাটাই প্রধান', 'প্রতিষ্ঠান প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত হয়নি', 'সরকারি কর্মকর্তাদের ভার বহনে ক্ষমতা কম'। এসবও সত্য নয়। কারণ—ঘুষ তো ঠিকই প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত হয়েছে, এরা বিদ্যা-বুদ্ধি-মেধা-প্রযুক্তিজ্ঞানেও তো কম যান না, এরা তো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো ছাত্র বলেই পরিচিত ছিলেন, এরা পোশাক-আশাক-আচার-আচরণ-ভাব-ভঙ্গিতেও যথেষ্ট কেতাদুরস্ত—একদম ঔপনিবেশিক আমলের সাদা সাহেবদের মতো 'স্মার্ট'! আসলে সমস্যাটা সেখানে, যা ওদের আগ্রহকাঠামো ও পছন্দকাঠামোর মধ্যে ঘুষ-দুর্নীতিকে দুর্ভেদ্য বাসা বাঁধতে দেয়—অর্থাৎ সমগ্র আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক কাঠামোটাই সমস্যা। এসব থেকে মুক্তির সহজ-সরল পথ নেই। সংস্কার করে দেখা যেতে পারে, তবে ঘুণে ধরা ঘর পেলা দিয়েও খুব বেশি দিন

টেকে না। এখানেও তাই। আমলাসকল মাঝেমধ্যেই অন্যদের সাথে (বিশেষত সামরিকদের সাথে) নিজেদের বেতন-ভাতা-বোনাসসহ অন্যান্য সুবিধার জন্য সরকারের কাছে চাপ দেন। সরকার দেরি করেন না—কারণ, ওরা-ওরাই সরকার। সংসার চলে না অথবা টানাটানি হয়—এসব কারণে আমলাসকলেরা কিন্তু ওসব দাবিদাওয়া পেশ করেন না। ওসব পেশ ও আদায় করার প্রধান লক্ষ্য ট্যাক্স ফাইল ঠিকঠাক রাখা (অনেকটা অর্থ পাচারের ধৌতকরণ প্রক্রিয়ার মতো)।

৪.২৫ শোভন সমাজ বিনির্মাণ-উদ্দিষ্ট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

(১) (প্রধান সুপারিশ ভাবনা) দেশজ মেধা-মননসম্পদ (দেশের ভেতরের এবং বাইরের) ব্যবহার করে বহিঃশক্তির চাপাচাপি অগ্রাহ্য করে প্রকৃতির অধীনস্থতা স্বীকার করে দেশের মানুষের দীর্ঘমেয়াদি জীবনসমৃদ্ধি ও জীবনকুশলতা বিচার করে সবধরনের বৈষম্য হ্রাস ও আলোকিত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে উন্নয়ন বাজেটীয় কর্মসূচি (programme) ও তার অধীনে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ (projects) প্রণয়ন করতে হবে।

(২) বৈষম্য হ্রাস ও আলোকিত সমাজ-উদ্দিষ্ট উল্লিখিত কর্মসূচি ও প্রকল্প বিনির্মাণে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সুস্পষ্ট-পরিচ্ছন্ন ধারণাকাঠামোর মধ্যে কাজটি তৃণমূল থেকে শুরু করতে হবে।

(৩) সম্ভব হলে (যদিও সহজ নয়) পরিবর্তন-পরিবর্ধন-পরিমার্জনের সুযোগ রেখে ৫ বছর মেয়াদি (ক্ষেত্রবিশেষে ১০ বছর মেয়াদি) সুনির্দিষ্ট-সময়ভিত্তিক কর্মসূচি ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন করতে হবে।

(৪) এসব কর্মসূচি ও প্রকল্প প্রণয়নকালে পাশাপাশি বাস্তবায়নের কর্মকৌশলও প্রণয়ন করতে হবে। বাস্তবায়ন কর্মকৌশলে দেখতে হবে যেন সম্পদের অপচয় না হয়।

(৫) এসব কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন (implementation) ও পরিবীক্ষণের (monitoring) কাঠামো বিনির্মাণে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এসব কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

(৬) এসব কর্মসূচি প্রকল্প বাস্তবায়নের সমন্বয় (coordination) নীতি-কৌশল কর্মসূচি প্রকল্প-উদ্দিষ্ট মানুষের অংশগ্রহণে নির্মাণ করতে হবে। এসব নীতি-কৌশলের মধ্যে থাকবে বাস্তবায়নকারী রাষ্ট্রীয়-সরকারের বিভিন্ন অঙ্গের (যেমন আমলা, আইন, বিচার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শাখা) সাথে জনগণের, নির্বাচিত প্রতিনিধির এবং নাগরিক সমাজের সম্পর্ক, আন্তমন্ত্রণালয়-আন্তবিভাগ সম্পর্কসমূহ।

(৭) প্রতিবছর খসড়া বাজেট সংসদে পেশ করার আগে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন প্রতিবেদন কমপক্ষে দুইবার জাতীয় সংসদে পর্যালোচনা এবং তা গণমাধ্যমে জনগণকে অবহিত করা ও পর্যলোচনার বিধান চালু করতে হবে। প্রথম প্রতিবেদনটি হতে পারে অর্থবছরের মাঝামাঝি সময়ে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের দিকে, আর দ্বিতীয়টি মার্চ মাসে (কোনো অবস্থাতেই মে মাসে নয়)

অধ্যায় ৫

২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য বিকল্প বাজেট: উন্নত বাংলাদেশ অভিমুখী বাজেট

৫.১. প্রাক্-কথন

"আমরা এমন একটি বার্ষিক বাজেট প্রস্তাব করতে চাই, যা আমাদের দেশে 'শোভন সমাজব্যবস্থা' বা 'শোভন জীবনব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে এবং একই সাথে ওই বাজেট কাঠামো দিয়েই বিচার হবে যে দেশ শোভন সমাজমুখী কি না? প্রস্তাবিত বাজেটটি কাঠামোগতভাবে এমন হতে হবে, যার মৌলিক নীতিগত বিষয়াদি আগামীতে এমন একশিলা-দৃঢ়বদ্ধ হবে (monolithic অর্থে), যা প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ আনুগত্যভিত্তিক আমাদের জীবনব্যবস্থাকে নিরন্তর শোভনকরণ প্রক্রিয়াভুক্ত করবে। একই সাথে প্রস্তাবিত বাজেটটি কাঠামোগত বিন্যাসের নিরিখে নীতিগতভাবে হবে সর্বজনীন (universal অর্থে) অর্থাৎ অনেক দেশের জন্য প্রযোজ্য—বিশ্বজনীন। আমাদের প্রস্তাবিত বাজেট কাঠামোটি সর্বজনীন এ জন্য যে তার অভীষ্ট—সবুজ বিশ্বে জ্ঞানসমৃদ্ধ আলোকিত মানুষের বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি" (দেখুন বারকাত, আবুল, ২০২০, বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, পৃ. ৫১৩)।

প্রস্তাবিত বাজেটে আমরা একই সাথে সংঘটিত অর্থনীতির কাঠামোগত বিপর্যয়—মহামন্দা ও কভিড-১৯-এর মহাবিপর্যয় থেকে মুক্ত হয়ে আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ বৈষম্যহীন 'শোভন সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র' বিনির্মাণে একটি ধারণাত্মক তত্ত্বকাঠামোর (conceptual theoretical construct) কথা বলছি, যার তিনটি বৃহৎবর্গীয় পরস্পরনির্ভরশীল উপাদান হলো: সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। এই বাজেটে প্রস্তাবিত তত্ত্বকাঠামোর মধ্যে থেকে যুক্তিক্রমানুসারে অপেক্ষাকৃত বড় মাপের যেসব সংশ্লিষ্ট বিষয় উত্থাপন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার মধ্যে আছে: পুঁজিবাদী শোষণভিত্তিক কাঠামোতে অনিবার্য বৈশ্বিক মহামন্দাসহ কভিড-১৯ ও মহামারি-উদ্ভূত পরিবর্তন বিশ্লেষণসহ উত্তরণের পথনির্দেশে প্রচলিত অর্থনীতিশাস্ত্রের অপারগতা এবং 'নতুন একীভূত অর্থনীতিশাস্ত্রের' যৌক্তিকতা এবং আমরা এমনটিও বলতে চেয়েছি যে ভাইরাস মহামারি প্রকৃতি-উদ্ভূত হলেও তা হতে পারে প্রকৃতিকে অতিশোষণমূলক ব্যবস্থা পুঁজিবাদী সিস্টেম-উদ্ভূত, এবং একই সাথে বলেছি যে ভাইরাস-মহামারি হতে পারে প্রকৃতিকে নির্বিচার অত্যাচার-উদ্ভূত, পুঁজিবাদী অন্যায্য-অন্যায় বিশ্বায়ন-উদ্ভূত; রাজনৈতিক অর্থনীতির নিরিখে প্রাক্-কভিড-১৯ বাংলাদেশের সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্রের বিকাশ প্রবণতা; সমাজ ও অর্থনীতিতে কভিড-১৯-এর প্রত্যক্ষ ক্ষতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন এবং ক্ষতি মোকাবিলার পথ-পদ্ধতি অনুসন্ধানের মাধ্যমে শোভন সমাজ অভীষ্ট প্রাথমিক কর্মকাণ্ডসমূহ; শোভন সমাজ-অর্থনীতি সন্ধান প্রক্রিয়া ত্বরান্বয়নের লক্ষ্যে সমাজ সমগ্রকের মৌল উপাদানসমূহের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব-সুপারিশ (দেখুন, বারকাত আবুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৩-৫১৪)। আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নে এসবের সাথে যুক্ত হয়েছে ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের সম্ভাব্য অভিঘাত যা অনিশ্চিত হলেও যুদ্ধের ঋণাত্মক অভিঘাত আমরা অনুভব করছি।

৫.২ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির "উন্নত বাংলাদেশ অভিমুখী" বিকল্প বাজেট: লক্ষ্য-অভীষ্ট ও কয়েকটি পদ্ধতিগত দিক

সমগ্র বিশ্ব এখন মহাবিপর্যস্ত। মানব ইতিহাসে এর আগে কখনও একই সাথে অর্থনৈতিক মহামন্দা ও মহামারি ঘটেনি। বাংলাদেশে আমরাও কভিড-১৯ মহামন্দা রোগে বিধ্বস্ত। মহামারিতে লকডাউনের কারণে আমাদের সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র সবকিছুই বিপর্যস্ত। আর ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ সমগ্র বিশ্ববাসীসহ আমাদের বিপর্যস্ততা ও অনিশ্চিয়তা গুণিতক হারে বাড়িয়েছে। এহেন দুঃসময়-মহাবিপর্যয়ে নির্মোহ বস্তুনিষ্ট বিশ্লেষণভিত্তিক বিকল্প বাজেট সুনাগরিক সমাজসহ দেশের আপামর মানুষ গ্রহণ করবেন—এ আশা অমূলক হবে না। কারণ অনিশ্চিত এই মহাবিপর্যয়ের সামগ্রিক ও বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণভিত্তিক আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটের প্রধান লক্ষ্য হলো আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ বৈষম্যহীন 'শোভন বাংলাদেশ' বিনির্মাণ—যা ছিল '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা। এ বিশ্বাসও অমূলক হবে না যে করোনা-যুদ্ধ উদ্ভূত মহাবিপর্যয় মানুষের (আমাদের) অন্তর্নিহিত শক্তিকে দুর্বল করবে না, উল্টো এ বিপর্যয় কাঙ্ক্ষিত মানবিক উন্নয়ন-প্রগতির গতি বাড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি করবে। আমাদের লক্ষ্য হবে সে সুযোগ উদ্‌ঘাটন-অনুসন্ধান করা এবং তা দেশের মানুষের জন্য কাজে লাগানো। আমরা সম্পূর্ণ অবগত যে এসব এক বাজেটের কাজ নয়।

আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটটি বৈষম্য নিরসন-উদ্দিষ্ট একটি জনগণতান্ত্রিক বাজেট। সেই কারণেই এই বাজেটের **লক্ষ্য-অভীষ্ট** (Goals) এবং **বাজেট প্রণয়ন** পদ্ধতি উভয়ই প্রচলিত-প্রথাসিদ্ধ গতানুগতিক বাজেটের তুলনায় ভিন্ন হবে—এটাই স্বাভাবিক। এসব কারণেই অন্ততপক্ষে দুটো বিষয় স্পষ্টভাবে বলা দরকার: (১) আমাদের প্রস্তাবিত বাজেটের লক্ষ্য-অভীষ্ট (Goals) কী? (২) ওই বাজেট প্রণয়নে আমরা কোন পদ্ধতিতত্ত্ব (Methodology) অনুসরণ করেছি? এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য নিম্নরূপ:

প্রথম: আমাদের প্রস্তাবিত বাজেটের লক্ষ্য-অভীষ্ট (Goals)। আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটের মূল লক্ষ্য-অভীষ্টসমূহ হচ্ছে আগামী ১০ বছরের মধ্যে (অর্থাৎ ২০৩৩ সাল নাগাদ)—

১) দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে (৭০%-৮০%) একটি আলোকিত-শক্তিশালী-টেকসই মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে রূপান্তর করা (transformation towards an enlightened-stable mid-middle class) (দেখুন, ছক-১),

২) দেশে বৈষম্য-অসমতা-বহুমুখী দারিদ্র্য সম্ভাব্য-সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনা (দেখুন, ছক-১),

৩) পরজীবী-লুটেরা ধনীক শ্রেণির সম্পদের যৌক্তিক অংশ দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের কাছে প্রবাহিত করা (দেখুন, অনুচ্ছেদ ৪.২২, ৫.৪, ৫.৭),

৪) অভ্যন্তরীণ (দেশজ) অর্থনীতির (domestic economy) উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া (দেখুন, অনুচ্ছেদ ৪.৫-৪.২১, ৫.৩, ৫.৪, ৫.৬),

৫) অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির মধ্যে কৃষিকে (কৃষিভিত্তিক প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারসহ) সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া (দেখুন, অনুচ্ছেদ ৪.১১-৪.১৩, ৫.৬),

৬) মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক, উদ্ভাবনী শক্তি সঞ্চারিত আলোকিত করার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা (তা অব্যাহত রাখা), যেখানে মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন, নিরাপত্তা-সুরক্ষা—সবই হবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব (দেখুন, অনুচ্ছেদ ৪.২, ৪.৩, ৪.১৪-৪.১৫, ৫.৬),

৭) মানুষের জন্য শোভন কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা (দেখুন, অধ্যায় ৪, ৫)।

দ্বিতীয়: <u>আমাদের প্রস্তাবিত জনগণতান্ত্রিক বাজেট বিনির্মাণের পদ্ধতিগত (Methodological) বিষয়।</u> পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশে যে পদ্ধতি অবলম্বন করে বাজেট প্রণয়ন করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রীয় বইপুস্তকে বাজেট প্রণয়নের যে পদ্ধতি বলা হয় আমাদেরটা এসবের উল্টো। প্রচলিত প্রথায় বাজেট প্রণয়েনের কাজ শুরু হয় "কত টাকাপয়সা আছে" তা দিয়ে (যাকে বলা হয় "resource envelope") অর্থাৎ বাজেট প্রণয়ন শুরুই হয় "টাকাপয়সাকে" মূল অবজেক্ট অথবা লক্ষ্য-অভীষ্ট ধরে নিয়ে। আমরা মনে করি—"শোভন সমাজ বিনির্মাণে"—এই পদ্ধতির শুরুটাই ভ্রান্ত চিন্তাভিত্তিক। এর বিপরীতে আমাদের বাজেট প্রণয়ন কর্মকাণ্ডের শুরুটাই হচ্ছে "কত টাকাপয়সা আছে" দিয়ে নয়, শোভন জীবন বিনির্মাণে দেশের মানুষের জন্য "কী কী প্রয়োজন তা দিয়ে" ("envelope of things to do" অথবা "envelope of things need to be done")—অর্থাৎ সংবিধান প্রতিশ্রুত প্রজাতন্ত্রের মালিক "জনগণের চাহিদা" দিয়ে। আমাদের বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার শুরু যে "envelope of things to do" দিয়ে তার মধ্যে যা যা আছে তা উপরোল্লিখিত বাজেটের লক্ষ্য-অভীষ্ট-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ—এসবের মধ্যে প্রধান মৌল হলো মানুষের স্বাস্থ্য-সুস্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন, কাজ, বিশ্রাম-বিনোদন, সংস্কৃতি চর্চা থেকে শুরু করে মানুষের সমগ্র জীবনকে সুস্থ-সৃজনশীল বিকাশের জন্য যা-কিছু প্রয়োজন সবই। আমাদের কাছে "কত টাকাপয়সা আছে" (resource envelope) তা কোনো অর্থেই অবজেক্ট বা অভীষ্ট বস্তু নয়, তা লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমমাত্র। আমাদের বাজেট বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায় আমরা প্রথমেই দেশের মানুষের উপরোল্লিখিত প্রয়োজন-চাহিদাসমূহ নিরূপণ করেছি। "জনগণের চাহিদা" নিরুপণে আমরা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গবেষণা সাহিত্য, তথ্যভাণ্ডার, জনমত (public opinion)—এসব বিবেচনা করেছি। যেহেতু চাহিদা অসীম, সেহেতু এসবের অগ্রাধিকারক্রম (prioritization) নিরূপণ করতে হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় আমরা দেশের সব বিভাগের বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের সাথে মতবিনিময় ও পরামর্শসভা করেছি (পরিশিষ্ট ২-এসব বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে)। আমরা দেখেছি যে জন-চাহিদা মেটানো এক বাজেটের কাজ নয়; আর এ কারণেই আমাদের বাজেট প্রস্তাবে অনেক কিছুই দেখা যাবে, যা ৫-১০ বছরব্যাপী করতেই হবে (যদিও বাজেট মাত্র একবছরের জন্য প্রণয়ন করা হয়)। আর "মানুষের কী কী প্রয়োজন" সেসব নিরূপণ এবং অগ্রাধিকার বিবেচনার পরেই আমরা খুঁজেছি "টাকাপয়সা"। অর্থাৎ এ প্রক্রিয়ায় সমীকরণটা হলো একদিকে মানুষের জীবনকুশলতা-জীবনসমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যের বিষয়াদি

("envelope of things to do") আর অন্যদিকে এইসব বস্তবায়নে প্রয়োজনীয় "টাকাপয়সা" ("envelope of resources")। এই সমীকরণে হিসেবপত্তর করার সময় ভারসাম্যকরণ (যাকে বলা হয় "budget balancing") প্রশ্ন এসেছে। আর তা করতে গিয়ে কখনও নির্দিষ্ট কোনো জনপ্রয়োজন কাটছাঁট করতে হয়েছে, আবার কখনও সম্পদের উৎস নিয়ে পুনর্বিবেচনা করতে হয়েছে। এসব হিসেবপত্তর করতে হয়েছে ততক্ষণ, যতক্ষণ না হিসেবের ভারসাম্য তৈরি করা গেছে। এসব হিসেবপত্তর করার সময় আমরা তিনটি বিষয় মাথায় রেখেছি: (১) জনস্বার্থ-জনপ্রয়োজন এবং তা মেটাতে অর্থ-সম্পদের উৎসসমূহ; (২) জনস্বার্থ রক্ষায় দীর্ঘমেয়াদি চিন্তা-ভাবনা—যেমন দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক অভিঘাত, সুদ হার (interest rate), মূল্যস্ফীতি, কর্মনিয়োজন হার ইত্যাদি; (৩) এসব জটিল সমীকরণ সমাধানে আমরা বাজেট ব্যালেন্স অথবা অর্থনীতি ব্যালেন্স করাকে গুরুত্বহীন মনে করিনি—তবে অগ্রাধিকার দিয়েছি সামাজিক ব্যালেন্সের বিষয়াদি।

"বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা ২০২৪-২৫: উন্নত বাংলাদেশ অভিমুখী বাজেট" শিরোনামে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বিকল্প বাজেট যৌক্তিক কারণেই কাঠামোগত রূপান্তরের নিরিখে মৌলিক এবং গতানুগতিক নয়। আর সে কারণেই আপাতত বেশকিছু বিষয় শাসকগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মতাদর্শগত কারণেও প্রস্তাবিত 'বিকল্প বাজেট' এর কোনো কোনো (সম্ভবত বেশির ভাগ) ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-প্রস্তাব নীতিনির্ধারকদের কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। কারণ, আগেই বলেছি যে—আমরা আর্থসামাজিক উন্নয়নে "মুক্তবাজার-মুক্তবাণিজ্য-মুক্তকর্মপ্রচেষ্টা-রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণহীনতা"ভিত্তিক নব্য-উদারবাদী মতবাদ (যা আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির স্বার্থবাহী সাম্রাজ্যবাদসহ দাতাগোষ্ঠী আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে) বাতিল ঘোষণাপূর্বক মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-উদ্ভূত আমাদের সংবিধানের মৌল বিধান মোতাবেক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আলোকিত মানুষের বৈষম্যহীন শোভন অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র বিনির্মাণের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ ধারণাত্মক তত্ত্বকাঠামো গ্রহণ করেছি।

বাজেটসহ আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে ধার করা নয়, অথবা (আমাদের ওপর) বহিঃশক্তির চাপিয়ে দেওয়া নয়—"প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ সম্মান ও আস্থাভিত্তিক বৈষম্য হ্রাস-উদ্দিষ্ট উন্নয়নদর্শন"ই সঠিক পথ বলে বিবেচনা করি। কারণ, তাই-ই ছিল ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-ভিত্তি।

'বিকল্প বাজেট ২০২৪-২৫' উত্থাপনের আগে এ কথাও বলে রাখা দরকার যে—দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক কাঠামো এবং নীতি-নির্ধারণে শাসকগোষ্ঠীর শ্রেণিস্বার্থ আর্থসামাজিক উন্নয়নে আমাদের প্রস্তাবিত 'শোভন সমাজব্যবস্থা' দর্শনের ভিত্তিতে প্রণীত বাজেট-দর্শন গ্রহণে কুণ্ঠিত বোধ করবে। এত কিছুর পরেও কভিড-১৯ মহামারিতে মহাবিপর্যস্ত এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দাসহ ইউরোপে যুদ্ধের দামামার অভিঘাত—এ ধরনের অনিশ্চিত সময়ে আমরা "বিকল্প বাজেট" প্রস্তাব করছি নিদেনপক্ষে এ কারণেও যে আমরা বোঝাতে চাই—মুক্তিযুদ্ধের শুভ চেতনায় বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব—যৌক্তিক, নৈতিক, মানবিক সব বিচারেই তা সম্ভব; সম্ভব এ দেশের দ্রুত কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন; সম্ভব উন্নত বাংলাদেশ গড়া; সম্ভব বৈষম্যহীন সমাজ গড়া; সম্ভব অসাম্প্রদায়িক মানবসমাজ সৃষ্টি। আমরা এটিও বোঝাতে চাই যে বৈশ্বিক মহামারি-বিপর্যয় সেই সুযোগ সৃষ্টি করেছে, যা 'শোভন সমাজব্যবস্থা' বিনির্মাণের শ্রেষ্ঠ সময়। এটা হতে পারে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সমগ্র দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার শ্রেষ্ঠ সুযোগ।

এতক্ষণ নীতি-দর্শনগত যে মৌলকথন হলো সেসবের ভিত্তিতে "বিকল্প বাজেট" প্রণয়নের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগতভাবে যেসব বিষয় বা 'অনুসিদ্ধান্তের' ওপর আমরা বিশেষ জোর দেওয়ার ও অগ্রাধিকার প্রদানের কথা ভেবেছি, তা বাজেটের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি (যা তৃতীয় অধ্যায়ে ১৪টি নীতিগত অবস্থান বা মৌল বিধানে বলেছি)। আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ বৈষম্যহীন 'শোভন সমাজ' বিনির্মাণের লক্ষ্যে প্রণীত 'বিকল্প বাজেট'-এ আমরা যেসব পদ্ধতিগত অনুসিদ্ধান্ত ও ভাবনা-ভিত্তি প্রয়োগ করেছি তা নিম্নরূপ:

> *উল্লেখ্য, জাতীয় বাজেটকে আমরা প্রকৃত মানবিক উন্নয়নের "অন্যতম" পথনির্দেশক দলিল মনে করি।* 'অন্যতম' এ জন্য যে সরকারের বার্ষিক বাজেট মূলত তার আগামী এক অর্থবছরের আর্থিক নীতি বা ফিসক্যাল পলিসির (রাজস্ব/ আয় ও পণ্য ও সেবাক্রয় সেইসাথে সামাজিক সুরক্ষা/ নিরাপত্তাবেষ্টনীর ব্যয়) খতিয়ান। উল্লেখ্য, আর্থিক নীতির বাইরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নীতিসমষ্টি আছে, যা বাজেটে কিছুটা প্রতিফলিত হলেও সরাসরি বাজেটের বিষয় বলে গণ্য করা হয় না। আর দেশের মুদ্রা নীতি বা মনিটারি পলিসি প্রণয়নের আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (বাংলাদেশ ব্যাংক), যার মূল দায়িত্ব হলো প্রধানত মুদ্রা নীতি বিবেচনায় রেখে মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা (মূলত সুদের হার নির্ধারণের মাধ্যমে) এবং টাকা ছাপানো। সরকারের আর্থিক নীতি (যা অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বাধীন) এবং মুদ্রা নীতি (যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্বাধীন)—এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ। আর আর্থিক মন্দা ও কভিড-১৯-এর মহাবিপর্যয় থেকে উত্তরণে এ সমন্বয় এবং ভারসাম্যায়ন অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। তবে রেন্ট-সিকারদের "ডাকিনীবিদ্যক কর্পোরেশন"নিয়ন্ত্রিত (Zombie corporation, অর্থাৎ যারা সস্তায় ঋণের পরে ঋণ নিতে থাকবে, কিন্তু ফেরত দেবে না) আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এ ভারসাম্যটা হয় রেন্ট-সিকারদের স্বার্থের অনুকূলে সাধারণ মানুষের প্রতিকূলে। এসব কথা বলার যুক্তিসংগত কারণ এ রকম: সরকারের আর্থিক নীতি এমন হবে—যখন অবিবেচক-ডাকিনীবিদ্যক-রেন্টসিকিং কর্পোরেশনদের হাতে ঋণ পৌঁছে যাবে—ওরা কখনও তা ফেরত দেবে না; আর মুদ্রা নীতির প্রণেতা কেন্দ্রীয় ব্যাংক এমন মুদ্রা নীতি বানাবে, যখন ওদের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্থের জোগান হয়ে যাবে। এসবের ফলে ভবিষ্যতে মন্দা-মহামন্দা হবে—আর এসবে আর্থিক নীতি ও মুদ্রা নীতি প্রণেতাদের কারো কিছু যায়-আসে না (ওরা তো রেন্ট-সিকার ডাকিনীবিদ্যকদের চাকুরে)।

কভিড-১৯ মহামারির বিপর্যয় ও অর্থনৈতিক মন্দাসহ যুদ্ধের অভিঘাত মোকাবিলা এবং একই সাথে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে উল্লিখিত পদ্ধতিগত ভিত্তি-ভাবনা প্রয়োগে **আমরা আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য যে বিকল্প জনগণতান্ত্রিক বাজেট প্রস্তাব করছি, তার মোট আকার (পরিচালন ও উন্নয়ন মিলে) হবে ১১ লক্ষ ৯৫ হাজার ৪৮৬ কোটি টাকা—যা চলতি অর্থবছরে (২০২৩-২৪) মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক প্রস্তাবকৃত বাজেটের তুলনায় ১.৫৭ গুণ বেশি (সারণি ৫ দেখুন)**। চলতি অর্থবছরে (২০২৩-২৪) সরকারের মোট বাজেট ৭ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা।

আমরা অনুমান করি যে আমাদের প্রস্তাবিত বৃহদাকার-সম্প্রসারণশীল বাজেট নিয়ে বেশ কথাবার্তা-সংশয়-সন্দেহ হতে পারে। তবে যুক্তি থাকলে আমাদের প্রস্তাব বর্জন করার কোনোই কারণ নেই। কারণ নেই এ কারণেও যে আমরা অর্থনৈতিক মহামন্দা, কভিড-১৯-এর বিপর্যয়কর অভিঘাত এবং ইউরোপে রাশিয়া-

ইউক্রেন যুদ্ধ ও মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের ঋণাত্মকসহ সবধরনের সম্ভাব্য অভিঘাত মোকাবিলা করে আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ বৈষম্যহীন 'শোভন সমাজব্যবস্থা' বিনির্মাণের কথা বলছি।

৫.৩ বিকল্প বাজেটে কাঠামোগত মৌলিক পরিবর্তন কোথায়?

২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য আমরা যে বিকল্প বাজেট উপস্থাপন করছি, তা—কভিড-১৯ মহামারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ-উদ্ভূত মহাবিপর্যয়কালীন বাজেট, উত্তরণের বাজেট, রূপান্তরের বাজেট, সম্ভাব্য গভীর অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাওয়ার বাজেট, মানুষের অন্তর্নিহিত সৃজনশীল শক্তির স্ফূরণের বাজেট। আর এই বিকল্প বাজেট আমরা উপস্থাপন করছি, সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় সংসদে প্রস্তাব আকারে যেদিন খসড়া বাজেট উপস্থাপন করবেন (আমাদের জানামতে, ৬ জুন ২০২৪)—তার কয়েক দিন আগে। সরকার আসন্ন বাজেটে হুবহু কী বলবেন, তা আমরা জানি না। অতীতের মতো এবারও আমরা গত ৫ ফাল্গুন ১৪৩০/১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪-এ আমাদের বিকল্প বাজেট ভাবনার মূল বিষয়াদি সরকারের কাছে লিখিতভাবে উপস্থাপন করেছি (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ১-এ দেওয়া আছে)। আর মাননীয় অর্থমন্ত্রী যেহেতু বাজেট পেশ করবেন কয়েক দিন পরে এবং যেহেতু তা ১ মাস ধরে সংসদে আলাপ-আলোচনার পরে চূড়ান্ত হবে, সেহেতু সরকার চাইলে আমাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণভিত্তিক সুপারিশাদি দেখে-শুনে বিচার-বিশ্লেষণ করে গ্রহণ-বর্জনের সুযোগ পাবেন। এখানে আরো বলা প্রয়োজন যে—যেহেতু আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সরকারপ্রণীত বাজেট সম্পর্কে আমরা এখনও তেমন কিছুই জানি না, সেহেতু ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটের বিভিন্ন দিক তুলনা করা হবে সরকারের চলমান অর্থবছরের অর্থাৎ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের সাথে।

আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য আমরা যে বাজেট প্রস্তাব করছি, তাতে ইতিপূর্বে উল্লেখিত বেশকিছু মৌলিক কাঠামোগত পরিবর্তন সূচিত হবে। **আমাদের প্রস্তাবিত ১১ লক্ষ ৯৫ হাজার ৪৮৬ কোটি টাকার বিকল্প বাজেটের অন্যতম প্রধান পরিবর্তনসূচক বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:**

(১) **আমাদের বাজেটের আকার ১১ লক্ষ ৯৫ হাজার ৪৮৬ কোটি টাকা। চলমান অর্থবছরের ২০২৩-২৪ সরকারের বাজেটের তুলনায় ১.৫৭ গুণ বড় (সারণি ৪, ৭, ও ৮ দেখুন)।** আমাদের প্রস্তাবিত বাজেটের আকার আসন্ন অর্থবছরে সরকার যা প্রস্তাব করবেন বলে গণমাধ্যমসূত্রে জানা যায়, তার তুলনায় সম্ভবত ১.৫ গুণ বড়। অর্থাৎ আমাদের প্রস্তাবিত বাজেট হলো দ্রুত সম্প্রসারণশীল বাজেট। কারণ হিসেবে আমরা আগেই বলেছি—সামাজিক-অর্থনৈতিক বিপর্যয়, কভিড-১৯ মহামারির মহাবিপর্যকর অভিঘাত, বৈশ্বিক অর্থনীতির মন্দাবস্থা, এবং ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের সম্ভাব্য ঋণাত্মক অভিঘাত মোকাবিলা করে আলোকিত মানুষের বৈষম্যহীন শোভন বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের প্রস্তাবিত বাজেট যুক্তিসংগত এবং তা দেশের মানুষের এবং অর্থনীতির অন্তর্নিহিত শক্তিবিচারেও যৌক্তিক।

(২) **আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে সরকারের রাজস্ব আয় থেকে আসবে ১০ লক্ষ ২৪ হাজার ৭৬৭ কোটি টাকা, অর্থাৎ মোট বাজেট বরাদ্দের ৯২.১৩ শতাংশের জোগান দেবে সরকারের রাজস্ব আয়** (সারণি ৭)। আর বাজেটের বাকি ৭.৮৭ শতাংশ অর্থাৎ ১ লক্ষ ৭০ হাজার ৭১৯ কোটি টাকার ঘাটতি অর্থায়ন জোগান দেবে সম্মিলিতভাবে বন্ড বাজার (মোট

৯৫ হাজার ৭১৯ কোটি টাকা; অর্থাৎ ঘাটতি অর্থায়নের ৫৬.১ শতাংশ), সঞ্চয়পত্র বিক্রয় থেকে ঋণ গ্রহণ (মোট ২৫ হাজার কোটি টাকা; ঘাটতি অর্থায়নের ১৪.৬ শতাংশ), এবং সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্ব (মোট ৫০ হাজার কোটি টাকা, যেখান থেকে আসবে ঘাটতি অর্থায়নের ২৯.৩ শতাংশ)। তবে **আমাদের প্রস্তাবে ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক ঋণ নিট-এর কোনো ভূমিকা থাকবে না, যা চলতি অর্থবছরের সরকারি বাজেটে ঘাটতি পূরণে ৩৯.৫ শতাংশ ভূমিকা রাখতে পারে। অর্থাৎ, আমাদের বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্য আমরা বৈদেশিক ঋণের দ্বারস্থ হতে চাই না। আবার একই সাথে বাজেটের ঘাটতি পূরণে আমরা দেশীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব রাখিনি; কারণ, দেশীয় ব্যাংকের ঋণ অন্য কাজে ব্যবহার করা হবে।** সরকারের চলতি বাজেটে ঘাটতি পূরণে দেশীয় ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার কথা মোট ঘাটতির ৪৪ শতাংশ।

(৩) **আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে মোট রাজস্ব থেকে আয় হবে ১০ লক্ষ ২৪ হাজার ৭৬৭ কোটি টাকা, যা সরকার চলমান অর্থবছরের (২০২৩-২৪) জন্য যে প্রস্তাব করেছিল তার চেয়ে ২.০৩ গুণ বেশি (সারণি ৬); আর প্রস্তাবিত মোট ব্যয় বরাদ্দ (পরিচালন ও উন্নয়ন মিলে) হবে ১১ লক্ষ ৯৫ হাজার ৪৮৬ কোটি টাকা, যা চলমান বছরের সরকারি বাজেটের তুলনায় ১.৫৭ গুণ বেশি (সারণি ৪)।**

(৪) **আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট অর্থায়নে কোনো বৈদেশিক ঋণের প্রয়োজন হবে না। সুদাসলসহ বৈদেশিক ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার পক্ষে আমাদের অবস্থান। আর কভিড-১৯-এর মহাবিপর্যয়সহ বৈশ্বিক মন্দা ও যুদ্ধের অভিঘাত মোকাবিলায় যদি কোনো অনুকূল শর্তে বৈদেশিক ঋণ থেকে মুক্তির পথ থেকে থাকে, সে বিষয়ে আমরা ঋণদাতাদের সাথে সম্মানজনক অবস্থান বজায় রেখে আলাপ-আলোচনার পক্ষে। আমরা বুঝতে চাই—যেসব ঋণ আমাদের নামে ওদের ঋণ হিসাবের খাতায় লেখা আছে, তার কোনটা আমরা চেয়েছিলাম আর কোনটা না চাইতেই পেয়েছিলাম। আমরা স্বাধীনভাবে বিকশিত হওয়ার স্বার্থে অতীত সব ঋণের হিসেবপত্তরের মিটমাট করতে চাই।** যেমন ধরুন, আমরা কারো কাছে যদি ১০০ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে থাকি, আর ইতিমধ্যে তা পরিশোধ করার পরেও ৫০ কোটি টাকার ঋণী হয়ে থাকি, তা মওকুফ নিয়ে আমরা আন্তরিকভাবে আলোচনা করতে ইচ্ছুক; অথবা টাকার সাথে মার্কিন ডলারের তথাকথিত বিনিময় মূল্যের (exchange rate) কারণে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত অথবা ওরা উপকৃত হয়ে থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট সমস্যার সুরাহা করতে ইচ্ছুক **(এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৯৭০ সাল থেকে মার্কিন ডলারের মান কৃত্রিমভাবে বাড়ানো হয়েছে)**। বৈদেশিক ঋণ নিয়ে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট—আমরা নীতিগতভাবেই ঋণ করে ঘি খাওয়ার বিপক্ষে (এর মধ্যে কোনো জাতীয়তাবাদ নেই, নেই মানবসত্তার মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা)। আমরা জানি যে সাম্রাজ্যবাদী আর্থিকীকরণকৃত রেন্টসিকিং লুটেরা পুঁজির ঋণ যেকোনো দেশে তাদেরই অধীনস্থ লুটেরা গোষ্ঠীর শাসনব্যবস্থা জোরদারে সহায়ক হতে বাধ্য। **আমরা মনে করি, শোভন সমাজ-রাষ্ট্র বিনির্মাণ-উদ্দিষ্ট চেতনার অর্থমন্ত্রকের যোগ্যতা ও দক্ষতার মানদণ্ড হবে তিনি/ তারা দেশজ সম্পদ দিয়ে (বৈশ্বিক সার্বভৌম তহবিল ও বৈশ্বিক সম্পদ তহবিলসহ) এবং বৈদেশিক ঋণ না নিয়ে কত দূর মানবপ্রগতি নিশ্চিত করতে পারেন সেই সক্ষমতার ওপর।**

(৫) **আমাদের প্রস্তাবনায় বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ কাঠামোতে গুণগত রূপান্তর ঘটবে। মোট বরাদ্দে এবং আনুপাতিক বরাদ্দে উন্নয়ন বাজেট হবে পরিচালন বাজেটের চেয়ে অনেক বেশি, যা এখন ঠিক উল্টো। এখন উন্নয়ন-পরিচালন বাজেট বরাদ্দের অনুপাত ৩৮:৬২, যা আমাদের প্রস্তাবিত বাজেটে হবে ৬৬:৩৪ (সারণি ৪ ও ৯)। আমাদের প্রস্তাবনায় উন্নয়ন বরাদ্দ চলমান সরকারি বাজেটের তুলনায় ২.১৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৫ লক্ষ ৯৮ হাজার ৩০৩ কোটি টাকায় উন্নীত হবে, আর পরিচালন বরাদ্দ (যার ৮০-৮৫% বেতন-ভাতা) এখনকার তুলনায় ১.২৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৭ লক্ষ ৯৭ হাজার ১৮৩ কোটি টাকায় উন্নীত হবে (সারণি ৪)। আমাদের প্রস্তাবনায় পরিচালন বাজেট বরাদ্দ যে এখনকার তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পাবে, তার প্রধান কারণ—আমরা ব্যাপক হারে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি যৌক্তিক মনে করি, যেখানে বেতন-ভাতা ও সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ পরিচালন বাজেটভুক্ত।** এ বরাদ্দ বৃদ্ধির আরো একটা বড় কারণ হলো—সরকারি বাজেট সংজ্ঞায় এখন অপ্রত্যাশিত ব্যয়, ভর্তুকি ও প্রণোদনা পরিচালন ব্যয়ভুক্ত। আমরা মনে করি ভর্তুকি, প্রণোদনা, অপ্রত্যাশিত ব্যয়-বরাদ্দ পরিচালন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করা ভ্রান্ত এবং তা করা হয় অপ-রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। এসবই যুক্তিগতভাবে উন্নয়ন ব্যয়-বরাদ্দের অংশ হওয়া উচিত। আমরা সেটাই করার পক্ষে। আর সেক্ষেত্রে সরকারের এখনকার বাজেটের আকার ঠিক রাখলেও উন্নয়ন বরাদ্দ এখনকার তুলনায় বেশ কিছুটা বাড়বে।

(৬) আমাদের প্রস্তাবনা অনুযায়ী বাজেটের আয় কাঠামোতে মৌলিক গুণগত রূপান্তর ঘটবে। আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে সরকারের মোট রাজস্ব আয় (প্রাপ্তি) হবে **১,০২৪,৭৬৭ কোটি টাকা** কোটি টাকা, যার মধ্যে ৭২ শতাংশ হবে প্রত্যক্ষ কর এবং ২৮ শতাংশ হবে পরোক্ষ কর (সারণি ৪, ৮, ৯)। কাঠামোগত এই পরিবর্তনটি মৌলিক। কারণ, সরকার-প্রস্তাবিত চলমান অর্থবছরের বাজেটে মোট রাজস্ব আয়ের (প্রাপ্তির) ৪৬ শতাংশ প্রত্যক্ষ কর এবং ৫৪ শতাংশ পরোক্ষ কর। **আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটের আয় কাঠামোতে যেহেতু ধনী ও সম্পদশালীদের ওপর কর (নতুন নতুন করসহ) অতীতের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পাবে এবং একই সাথে যেহেতু ব্যয় কাঠামো হবে প্রগতিমুখী, সেহেতু বিকল্প বাজেট বাস্তবায়ন করলে তা যৌক্তিক কারণেই সমাজে সম্পদ বৈষম্য, আয় বৈষম্য, স্বাস্থ্য বৈষম্য, শিক্ষা বৈষম্যসহ সামাজিক-বৈষম্য ও ক্রমবর্ধমান অসমতা হ্রাস করবে। সুতরাং, আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটকে "বৈষম্য হ্রাসকারী উন্নত বাংলাদেশ অভিমুখী উন্নয়নদর্শন" হিসেবে অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত।**

৫.৪ বিকল্প বাজেট নিয়ে সম্ভাব্য সংশয়বাদী ও বিরোধীদের উদ্দেশ্যে

আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটটি শোভন সমাজ-শোভন অর্থনীতি-শোভন রাষ্ট্রব্যবস্থা বিনির্মাণের লক্ষ্যে মাত্র একবছরের বাজেট—২০২৪-২৫ অর্থবছরের। প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটের আকার (টাকার অংকে) চলমান বাজেটের আকারের তুলনায় ১.৫৭গুণ বেশি। আমাদের প্রস্তাবিত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বিকল্প বাজেটের আকার ১১,৯৫,৪৮৬ কোটি টাকা, যেখানে চলমান অর্থবছরের (২০২৩-২৪) সরকারি বাজেটের আকার ৭,৬১,৭৮৫ কোটি টাকা (সারণি ৪ দেখুন)। আমরা খুব ভালোভাবেই জানি যে—কেউ কেউ বলবেন, যা ওদের মালিকানাধীন টেলিভিশন, রেডিও, পত্রপত্রিকা, অন্যান্য অনেক যোগাযোগ-

প্রচার-সম্প্রচারমাধ্যমে প্রচারিত হবে—"বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা অবাস্তব ও কল্পনাপ্রসূত"। এ নিয়ে সংশয়ও থাকবে। সেক্ষেত্রে আমাদের বিনীত প্রস্তাব হবে নিম্নরূপ:

> আপনারা যারা চ্যালেঞ্জ করবেন (তাদের অনুগত অর্থনীতিশাস্ত্রীক ও সুশীল সমাজের টেলিব্যক্তিত্বদেরসহ) তারা অনুগ্রহ করে আমাদের বিকল্প বাজেটটি এ দেশের ১৭ কোটি মানুষের সামনে উত্থাপন করে বিকল্প বাজেটের আকার থেকে শুরু করে প্রতিটি আয় খাত ও ব্যয়-বরাদ্দ খাত সম্পর্কে তাদের (জনগণের) প্রশ্ন-সংশয়-দ্বিধা-সিদ্ধান্ত-সম্মতি-অসম্মতিসহ মতামত নিন; জানুন তাদের ভাবনা ও সুপারিশ (এসব মনে করার যুক্তিসংগত কোনো কারণই নেই যে বাজেট প্রণয়ন-উদ্দিষ্ট ভাবনাটা 'বিশেষজ্ঞ'দের একচেটিয়া সম্পত্তি)। দেশের ১৭ কোটি মানুষের সম্মতি নিতেই হবে এ জন্য যে আমাদের পবিত্র সংবিধানমতে তারা প্রজাতন্ত্রের মালিক—আমি-আপনি প্রত্যেকে ব্যক্তি হিসেবে মালিকদের মাত্র একজন। তবে আমি-আপনি রেন্টসিকার-দুর্বৃত্ত-লুটেরা গোষ্ঠীর কেউ হলে দেশের মালিক হিসেবে অযোগ্য বিবেচিত হব—সেটাও সংবিধানের বিধান অনুযায়ীই, যেখানে স্পষ্ট লেখা: *"রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না"* [দেখুন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ২০ (২)]। সুতরাং রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণী দলিল—রাষ্ট্রীয় বাজেট নিয়ে জনগণের সম্মতি (people's consent) নেওয়া যে গণতান্ত্রিক সমাজে বাধ্যতামূলক এবং তা আমাদের সংবিধান অনুযায়ী পুরোপুরি বাধ্যতামূলক—আশা করি এ নিয়ে কেউ-ই অমূলক-অযৌক্তিক বিতর্ক করবেন না। অযথা এ বিতর্কে অবতীর্ণ হলে একদিকে জনগণের কাছে পরাজিত হবেন—মহা পরাজয় বরণ করবেন; আর তার চেয়েও মারাত্মক যে বিপদে পড়বেন তা হলো, ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান'-এর মূল চেতনার বিরুদ্ধে চলে যাবেন (বুঝুন তাহলে কী অবস্থা হবে)। সুতরাং আর কোনো প্রশ্ন করার আগে দয়া করে আমাদের বিকল্প বাজেটটি দেশের আপামর জনগণের কাছে পৌঁছে জাতীয়ভাবে ভোট গ্রহণ করুন (ভোটারের বয়স আপনারাই নির্ধারণ করুন; আমরা হাইস্কুলপড়ুয়া বয়সীদের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে)—আপনারা ভোট বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শী; প্রয়োজনে দেশের বিশাল যুব গোষ্ঠীর সহায়তা নিন; প্রয়োজনে জাতীয় ও এলাকাভিত্তিক কনভেনশন করুন; প্রয়োজনে সব পেশাজীবী সংগঠনকে ডাকুন; প্রয়োজনে আমাদেরও ডাকুন আমরা সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আর অবাধ ও সুষ্ঠু সেই ভোটের ফলাফলের ভিত্তিতেই জাতীয় বাজেট—'সরকারের বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি' (সংবিধান বাজেটকে এই সুন্দর নামটি দিয়েছে) প্রণয়ন করুন (প্রণয়নের এই পর্বে সত্যিকার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শক রাখুন)। এতসব পর্ব পেরুলে দেখবেন যে আমরা যে বিকল্প বাজেট উত্থাপন করছি তার চেয়ে জনগণের সম্মতিভিত্তিক বাজেট (একই সময়কালের জন্য) হবে কমপক্ষে দ্বিগুণ বড়, আর আয়ের বাজেট হবে আমাদের প্রস্তাবের 'সর্বমোট রাজস্ব প্রাপ্তি'র তুলনায় কমপক্ষে তিনগুণ বড়—সেক্ষেত্রে আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য বিনির্মিত জনসম্মতিভিত্তিক বাজেটের আনুমানিক আকার হবে ৪১ লক্ষ ৮৮ হাজার ২২৪ কোটি টাকা, আর আয়ের **বাজেটের আনুমানিক আকার হবে ৫৭ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩৩৬ কোটি টাকা অর্থাৎ বাজেটে এখন যেখানে ঘাটতি হয়, সেখানে উদ্বৃত্ত হবে ১৫ লক্ষ ৯৯ হাজার ১১২ কোটি টাকা।** কেন এমন হবে? এ প্রশ্নের সদুত্তর বাজেট নিয়ে জনসম্মতিভিত্তিক ভোট নেওয়ার ব্যবস্থা করলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে (আর তার আগে জনসম্মুখে উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণের দাওয়াত কবুল করুন)।

আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে মোট ব্যয় ১১ লক্ষ ৯৫ হাজার ৪৮৬ কোটি টাকা, মোট আয় ("রাজস্ব প্রাপ্তি") ১০ লক্ষ ২৪ হাজার ৭৬৭ কোটি টাকা কেন যুক্তিসংগত? আমরা ইতিমধ্যে প্রযোজ্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই এসব বিষয়ে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি। তবে প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে টাকা-পয়সার অংক নিয়ে কথা বলার আগে কয়েকটি কথা স্মরণ করা যুক্তিসংগত হবে। আর সেসব স্মরণ করার আগে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আমাদের অর্থনীতি সমিতির বৈশিষ্ট্যসূচক পরিচিতি (এটা আমাদের কারো ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, নীতিগত ব্যাপার এবং দেশের মানুষের তা জানার অধিকার আছে এবং/অথবা আমাদের সেটা জানানোর দায়দায়িত্ব আছে) বলে রাখা প্রয়োজন। কারণ, তা না হলে বোঝা যাবে না কেন আমরা এসব বলছি। আমরা আনুষ্ঠানিক অর্থে অর্থনীতি 'বিজ্ঞানের' (?) ছাত্র, তবে ওই বিজ্ঞানের অনেক কিছুই গ্রহণের কোনো যুক্তি দেখি না। যেমন অর্থনীতিশাস্ত্র যখন বলে যে 'ক' হলে 'খ'-এর অবস্থা এমন হবে, তা হলে 'গ'-এর পরিবর্তন হবে—এ রকম; আর সেক্ষেত্রে 'ঘ'-এর ওপর অভিঘাত হবে এখনকার চেয়ে ভিন্নতর, আর 'ঘ'-এর অবস্থা সে রকম হলে 'ঙ'-এর পরিণতি হবে খুবই শোচনীয়; আর 'ঙ'-এর পরিণতি ও রকম হলে 'গ'-এর এক-একক বৃদ্ধি বা হ্রাস হবে শর্তসাপেক্ষ ব্যাপার—আর সেক্ষেত্রে 'ক' আর 'খ'-এর যে কী হবে—তা আল্লাহই জানেন (তা হলে আপনি কী জানেন? কী বলতে চান? না-কি এটাই অর্থনীতিশাস্ত্র?)—এ ধরনের যুক্তিতে আমাদের বিশ্বাস নেই; কারণ, তা কোনো ধরনের কার্যকরণ সূত্রের অর্থাৎ causation-এর মধ্যে পড়ে না। যুক্তিশাস্ত্রে নিশ্চয়ই এসব যুক্তির শাস্ত্রীয় ভদ্র কোনো নাম আছে—এসবের যৌক্তিক নাম হতে পারে 'জগাখিচুড়িবাদ', "হ-য-ব-র-লবাদ"।

আমরা জানি ও বুঝি যে সংশয়-সন্দেহবাদীরা আমাদের বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনার অনেক কিছুই নিয়েই প্রশ্ন তুলবেন—সংশয় প্রকাশ করবেন। তবে সম্ভবত তাদের প্রশ্নের বেশির ভাগই হবে আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটের বড় অংকের টাকাপয়সার সম্ভাব্য উৎসকেন্দ্রিক। উদাহরণসহ বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

(১) আমরা বলছি যে আগামী অর্থবছরে আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে ১১ লক্ষ ৯৫ হাজার ৪৮৬ কোটি টাকা ব্যয় করতে হলে সরকারকে রাজস্ব আয় করতে হবে ১০ লক্ষ ২৪ হাজার ৭৬৭ কোটি টাকা (সারণি ৪)। কোথা থেকে 'এত টাকা' আসবে? এটাই বিরুদ্ধবাদীদের মূল প্রশ্ন (যে প্রশ্ন সাংবাদিকেরা আমাদের করেন)। এখন তাহলে বিরুদ্ধবাদী ও সংশয়বাদীরা কান পেতে শুনুন 'এত টাকা' (!) কোথা থেকে পাওয়া সম্ভব। এ বিষয়ে কি কারো কোনো সন্দেহ আছে যে—আমাদের দেশে ঘুষ-দুর্নীতি আছে, চোরাচালান আছে, অর্থ পাচার আছে, যত ধরনের কর আছে (যেমন আমদানি শুল্ক, রপ্তানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক)—সবকিছুতেই ফাঁকি আছে—বড় মাপের ফাঁকি। এসবই হলো কালোটাকার (Black money) উৎস।

বেশ কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হলেও সম্মানিত সংশয়বাদী ও বিরুদ্ধবাদীদের উদ্দেশ্যে আমরা বলার প্রয়োজনে বোধ করছি যে সরকারের বর্ধিত আয়ের উৎস সম্পর্কে আপনাদের যতই সন্দেহ-সংশয় থাকুক না কেন মাননীয় অর্থমন্ত্রীর এসব নিয়ে একদিকে যেমন সন্দেহ সংশয় নেই, আর অন্যদিকে রেন্টসিকার-সম্পদশালী কালোটাকার মালিকদের (অবশ্য অর্থমন্ত্রীসহ 'উনারা' এ শব্দটি ব্যবহার করেন না—বলেন 'অপ্রদর্শিত আয়') স্বার্থ রক্ষা না

করে পারবেন না। এ বিষয়ে বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটি কথা বলেছিলেন:[১০]

"'*সমতা ও ন্যায্যতা*' শীর্ষক প্যারাগ্রাফে (অনুচ্ছেদ ২২১) তিনি সত্য গোপন করতে না পেরে ফটাস্ করে বলে ফেলেন, '*বাংলাদেশে বর্তমানে সম্পদ কর আইন কার্যকর নেই। ... আমরা পর্যালোচনা করে দেখেছি অনেক বিত্তশালী করদাতার বিপুল পরিমাণ সম্পদ রয়েছে। কিন্তু তারা তেমন কোনো আয় প্রদর্শন করেন না। ফলে প্রদেয় আয়কর কম হওয়ায় তাদের তেমন কোনো সারচার্জও প্রদান করতে হয় না*'। তবে এসব সত্যভাষ্যের ঠিক এক প্যারাগ্রাফ আগে '*কোম্পানি কর হার*' শীর্ষক ২২০ নম্বর অনুচ্ছেদে সম্পদশালী-বিত্তশালীদের অন্যায়-অন্যায্য স্বার্থ রক্ষায় তিনি বলেছেন, '*আমাদের দেশে বর্তমানে কার্যকর করপোরেট কর হার ৫ শতাংশ-এর কম। এ ছাড়া গত অর্থবছর ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের করপোরেট কর হার ২.৫ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছে। এতে এই খাত থেকে করপোরেট কর আদায় যথেষ্ট পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় করপোরেট কর হারের বিদ্যমান কাঠামোটি বহাল রাখার প্রস্তাব করছি*'। 'বিত্তশালীদের বিপুল পরিমাণ সম্পদ রয়েছে, কিন্তু তারা তেমন কোনো আয় প্রদর্শন করেন না'—এ বক্তব্যের ঠিক এক প্যারাগ্রাফ পরেই '*প্রবৃদ্ধি ও ব্যবসায়ে সহায়তা এবং ব্যবসায় পরিচালনা সহজীকরণ*' শীর্ষক ২২৩ নম্বর অনুচ্ছেদে অর্থমন্ত্রীকে কালোটাকার মালিকদের পক্ষাবলম্বন করে (প্রতিপক্ষ হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়) বলতে হয়েছে, '*বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য অর্থনৈতিক অঞ্চল ও হাইটেক পার্কে শিল্প স্থাপনে প্রদর্শিত আয় থেকে বিনিয়োগকৃত অর্থের ওপর ১০% হারে কর প্রদান করা হলে উক্ত বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎস সম্পর্কে আয়কর বিভাগ থেকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না– এ সংক্রান্ত একটি বিধান আয়কর অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছি। বিদ্যমান আইনে নির্দিষ্ট হারে কর প্রদান হলে ফ্ল্যাট ও এ্যাপার্টমেন্টের ক্রয় এবং দালান নির্মাণে বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎস সম্পর্কে আয়কর বিভাগ হতে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় না। তবে এই হারটি অত্যাধিক হওয়ায় করদাতাগণ খুব একটা সাড়া দিচ্ছেন না। ফ্ল্যাট ও এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় এবং দালান নির্মাণে বিনিয়োগ স্বপ্রণোদিতভাবে আয়কর নথিতে প্রদর্শনে করদাতাগণকে আরও আগ্রহী করার জন্য এ-সংক্রান্ত বিদ্যমান কর হ্রাস করার প্রস্তাব করছি। আমি আশা করি এ হ্রাসকৃত কর হারের সুযোগ নিয়ে করদাতাগণ ফ্ল্যাট ও এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় এবং দালান নির্মাণে তাদের অপ্রদর্শিত বিনিয়োগ অতিদ্রুত আয়কর নথিতে প্রদর্শন করবেন এবং স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিতভাবে করের আওতায় অন্তর্ভুক্ত হবেন*'"।

আমাদের হিসাবে দেশে গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে সৃষ্ট মোট কালোটাকার পরিমাণ কমপক্ষে ৮ লক্ষ ৪১ হাজার ৪১৯ কোটি টাকা; আর বিগত ৪৮ বছরে (১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত) দেশে সৃষ্ট মোট কালোটাকার পরিমাণ কমপক্ষে ৮৮ লক্ষ ৬১ হাজার ৪৩৭ কোটি টাকা (সারণি ৩)। এর সাথে আছে জামায়াত-জঙ্গিদের মৌলবাদের অর্থনীতি, যে অর্থনীতি গত ২০১৯ সালে **নিট অবৈধ মুনাফা করেছে**

---

[১০] দেখুন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১৯গ), সমৃদ্ধ আগামীর পথযাত্রায় বাংলাদেশ– সময় এখন আমাদের, সময় এখন বাংলাদেশের : বাজেট বক্তৃতা ২০১৯-২০, পৃ. ৮০-৮১।

আনুমানিক ৪ হাজার ২৬২ কোটি টাকা (এর বাইরে আছে ওদের সমর্থকদের, এমনকি অসমর্থনকারী যারা ওদের পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন তাদের 'ইয়ানত' বা বেতন থেকে কেটে নেওয়া বাধ্যতামূলক চাঁদা), **আর 'মৌলবাদের অর্থনীতি' বিগত ৪০ বছরে পুঞ্জীভূত মোট অবৈধ নিট মুনাফা করেছে ৩ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি**। তাহলে গত বছরে সৃষ্ট অবৈধ কালোটাকার আনুমানিক পরিমাণ হবে ৮ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা (কালোটাকা ৮,৪১,৪১৯ কোটি টাকার সাথে মৌলবাদের অর্থনীতির অবৈধ নিট মুনাফা ৪,২৬২ কোটি টাকা যোগ করলে)। আর **কালোটাকার বিগত ৪৮ বছর (১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত) এবং মৌলবাদের অর্থনীতির বিগত ৪০ বছরের নিট অবৈধ মুনাফা যোগ করলে পুঞ্জীভূত কালোটাকার আনুমানিক পরিমাণ হবে ৯১ লক্ষ ৬১ হাজার ৪৩৭ কোটি** টাকা (পুঞ্জীভূত কালোটাকা ৮৮ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৩৭ কোটি টাকার সাথে মৌলবাদের অর্থনীতির পুঞ্জীভূত অবৈধ নিট মুনাফা কমপক্ষে ৩ লক্ষ কোটি টাকা যোগ করলে)। তাহলে হিসেবপত্তর দেখাচ্ছে যে—দেশে বিগত ৪০-৪৫ বছরে পুঞ্জীভূত মোট কালোটাকার পরিমাণ হবে কমপক্ষে ৯১ লক্ষ ৬১ হাজার ৪৩৭ কোটি টাকা। সরকার তো 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতা নীতি' (Zero tolerance to corruption) ঘোষণা করেছেন; বাংলাদেশ রাষ্ট্রটা তো জন্মগ্রহণ করেছে ৩০ লক্ষ শহীদের জীবনের বিনিময়ে; ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ তো হয়েছিল বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে; সংবিধান তো স্পষ্ট বলছে—'মানুষে মানুষে সামাজিক ও অসাম্য বিলোপে নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন করার দায়িত্ব নেবে রাষ্ট্র' [অনুচ্ছেদ ১৯ (২)], 'কোন ব্যক্তি যেন অনুপার্জিত আয় ভোগে সমর্থ না হন– সে দায়িত্বও রাষ্ট্রের' [অনুচ্ছেদ ২০ (২)]—তাহলে বিগত চার দশকে সৃষ্ট পুঞ্জীভূত (কমপক্ষে) ৯১ লক্ষ ৬১ হাজার ৪৩৭ কোটি টাকার সমপরিমাণ কালোটাকা কেন উদ্ধার করা হবে না? কেন তা সুদাসলে উদ্ধার করা হবে না? দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ (যারা প্রজাতন্ত্রের মালিক) তো বলবেন উদ্ধার হওয়া উচিত ১০০ শতাংশ। কিন্তু 'কালোওয়ালারা' দেবেন না—তারা জান দেবেন তো মান দেবেন না।

এখন ধরুন হারানোর ভয়ে ভীত-দুর্বলচিত্ত মধ্যবিত্ত মানুষ[১১] হিসেবে আমি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের (অর্থাৎ জনগণের, যারা প্রজাতন্ত্রের মালিক) বিপক্ষে অবস্থান

[১১] ১৭ কোটি মানুষের বাংলাদেশে মোট মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত মানুষের সংখ্যা সাড়ে ৮ কোটি (মোট জনসংখ্যার ৫০%)। মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিত্তের মাপকাঠিতে তিন ভাগে বিভক্ত: নিম্ন-মধ্যবিত্ত, মধ্য-মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত। দেশে এখন (কভিড-১৯ লকডাউনপরবর্তী সময়ে) নিম্ন-মধ্যবিত্তের সংখ্যা হবে ৩ কোটি ৯১ লক্ষ (মোট জনসংখ্যার ২৩%), মধ্য-মধ্যবিত্ত ২ কোটি ৩৮ লক্ষ (১৪%), আর উচ্চ-মধ্যবিত্ত ২ কোটি ২১ লক্ষ (১৩%) (দেখুন, উপ-অধ্যায় ৮.৫, সারণি ২)। মধ্যবিত্ত মানুষের সমস্যা অনেক– না পারে এদিকে, না পারে ওদিকে। বিত্তের মাঝামাঝি অবস্থান হলে বিত্ত হারানোর ভয় থাকে, আর বিত্ত হারানোর ভয়ে প্রতিনিয়ত আপোস করে। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে এসব ভদ্রলোকের কমবেশি একটা বাজারমূল্য আছে, যে মূল্য দিলে এরা অনেক কিছুই করতে পারে (ক্ষেত্রবিশেষ কল্পনাতীত গণবিরোধী কাজও)। পরনিন্দা চর্চায় এদের জুড়ি নেই। তোষামোদিতে এদের জুড়ি নেই। আবার শিক্ষিত হলে জ্ঞানবাজি আর বক্তৃতাবাজিতে তাদের জুড়ি থাকে না; তবে সে বক্তৃতা প্রকাশ্য হলে তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থের পক্ষে যায়। তবে কদাচিৎ দু-একজন পাওয়া যেতে পারে (সম্ভবত সব কালেই ছিল) যারা একটু ভিন্ন হন; নিজের শ্রেণি অবস্থানের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন। একটু বেশি বিত্ত আর একটু বেশি শিক্ষিত হলে ভয় থাকে গাড়ি-বাড়ি, ব্যাংকে স্থায়ী

নিয়ে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কালোটাকার মালিকদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে বললাম ৮০ শতাংশ ছাড় দেব না—ছাড় দেব মাত্র ২০ শতাংশ অর্থাৎ পুঞ্জীভূত মোট কালোটাকার ফেরত দেব মাত্র ২০ শতাংশ (৮০ শতাংশ হাতে রাখব)—সেক্ষেত্রে ফেরত দেব ১৮ লক্ষ ৩২ হাজার ২৮৭ কোটি টাকা। এটাই হবে সরকারের আয়ের একাংশ, যা দিয়ে সরকার বাজেট বানাবেন। আর অন্য অংশ হবে সরকার সাধারণভাবে যে আয় করে থাকেন ("রাজস্ব প্রাপ্তি"), যার পরিমাণ চলতি অর্থবছরের বাজেটে ৪ লক্ষ ৩৬ হাজার ২৭১ কোটি টাকা (যাকে সরকারের বাজেট দলিলে বলা হয় 'সর্বমোট রাজস্ব প্রাপ্তি; সারণি ৭ দেখুন)। তাহলে ওপরের দু'টো যোগ করলে—সরকারের সম্ভাব্য আয়ের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ২২ লক্ষ ৬৮ হাজার ৫৫৮ কোটি টাকা। আর একটু আছে, যা নিয়ে কভিড-১৯-এর মহাবিপর্যয়কালে সুস্থ মস্তিষ্কের কেউ-ই দ্বিমত পোষণ করবেন না, তা হলো সম্পদ কর (wealth tax, যা আমাদের আইনে আছে, কিন্তু আদায় করা হয় না) এবং অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর (tax on excess profit)। এই দুই উৎস থেকে সরকারকে আয় করানোর জন্য আমরা প্রস্তাব করেছি এ জন্য যে (ক) ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের মধ্যে এখন দেশের জনসংখ্যার ৫ শতাংশ অতিধনীর হাতে আছে দেশের মোট খানার আয়ের (total household income of the country) কমপক্ষে ৪০ শতাংশ, আর আয় বৈষম্য মহাবিপৎসীমা অতিক্রম করেছে; (খ) করোনার সময়ে অনেক ব্যবসা-বাণিজ্য হয়েছে; তবে অফলাইনে নয় অনলাইনে, যেখানে মুনাফা হয়েছে মাত্রাতিরিক্ত এবং একচেটিয়া।

এ অবস্থায় আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে সরকারের আয় খাতে সম্পদ কর থেকে মাত্র ২ লক্ষ ১২ হাজার কোটি টাকা, আর অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর থেকে মাত্র ৭৫ হাজার ২০০ কোটি টাকা আহরণের প্রস্তাব করেছি। তাহলে দুর্বলচিত্তের মধ্যবিত্ত মানুষ হিসেবে যত ধরনের আপস সম্ভব সবকিছু প্রয়োগ করলেও তো বাজেটের জন্য সরকারের বার্ষিক আয় হতে পারে ২৫ লক্ষ ৫৫ হাজার ৭৫৮ কোটি টাকা (কালোটাকা ও অর্থপাচার উদ্ধার অংশ + এখনকার বাজেটে সরকারের রাজস্ব প্রাপ্তি + সম্পদ কর + অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর)। অথচ আমাদের প্রস্তাবিত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বিকল্প বাজেটে প্রস্তাবিত আয় ১০ লক্ষ ২৪ হাজার ৭৬৭ কোটি টাকা, আর ব্যয় ১১ লক্ষ ৯৫ হাজার ৪৮৬ কোটি টাকা। তাহলে সরকার সম্ভাব্য যে আয় করতে পারে, তা দিয়ে তো আমাদের

আমানত, ব্যবসা-বাণিজ্য হারানোর। ভয়-ভীতির আসল কারণটি এরা কখনও প্রকাশ করে না– এদের চাকরি হারানোর ভয় থাকলেও থাকতে পারে, তবে আসল ভীতি হলো ট্যাক্স ফাইল। আর শাসকগোষ্ঠী সেটা নিয়েই খেলে। ফলে এরা কখনও শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে যান না, যেতে পারেন না। এরা সমাজ পরিবর্তনের কথাও বলেন, তবে তা মনের কথা নয়; এবং এসব প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন না। এদের বেশির ভাগই স্বার্থপর। এদের বেশির ভাগই জানেন না যে উৎপাদনে সৃষ্ট নতুন মূল্য দিয়েই এদের বেতন-ভাতা হয়। এসব নিয়ে এদের বেশির ভাগ নির্বিকার। শ্রেণি অবস্থানগত কারণে এদের দিয়ে বড় ধরনের সংস্কারমূলক কাজও সম্ভব নয় (সমাজ পরিবর্তনের কথা বাদই দিলাম)। তবে যখনই বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন ঘটে, এরা কীভাবে যেন সামনের সারিতে হাজির হয়ে যান। এরা কায়দা করে বাঁচতে জানেন। এরা সবসময় 'উপরের' সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। এরা খুবই কার্যকর দালাল, আপসপটিয়সী, বসের সামনে বিড়াল আর অধীনস্থদের সামনে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, এরা যত না বুদ্ধিমান ও চালাক তার চেয়ে ঢের বেশি চতুর, প্রয়োজনে চোখ ওল্টাতে এরা সময় অপচয় করেন না, আর উপরে উঠতে এদের কাছে নীতি-নৈতিকতা বলে কিছু কাজ করে না। (উৎস: বারকাত, আবুল (২০২০) বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে, ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, পৃ. ৫৩৫-৫৩৬)

প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটের তুলনায়ও অনেক বড় বাজেট প্রণয়ন সম্ভব। সমস্যাটা কার এবং কোথায়? কভিড-১৯-উদ্ভূত মহাবিপর্যয় আর সেইসাথে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা ও ইউরোপে যুদ্ধের সম্ভাব্য অভিঘাত—এহেন সময়ে ব্যাপক কর্মসংস্থান বৃদ্ধিমূলক রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন, প্রয়োজন বৈষম্য হ্রাসকারী উন্নয়নদর্শন—শোভন সমাজ-শোভন জীবনব্যবস্থা বিনির্মাণ—আর সে জন্য দরকার সম্প্রসারণশীল বাজেট, যে বাজেটের অর্থ তো আমাদের আছে। হিসেবপত্তর তো স্পষ্ট। তাহলে অসুবিধাটা কোথায়? বাধা কোথায়? অসম্ভাব্যতা কোথায়?

আমরা জানি, কালোটাকার মালিকেরা ভয় পাচ্ছেন যে জনগণ তো জেনে গেল মোট কালোটাকার ২০ শতাংশ মানে কত টাকা, তাহলে ওরা ১০০ শতাংশ সমান সমান কত টাকা সেটাও হিসেব করে ফেলবেন—ভবিষ্যতে কী যে হয় (!)। ধরুন, কালোওয়ালাদের দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন নিশ্চিত করতে জনগণের সম্মতি নিয়ে দুর্বলচিত্ত মধ্যবিত্ত-মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আমরা আপনাদের প্রস্তাব দিলাম যে আপনারা যদি ওই ২০ শতাংশের অতিরিক্তটার অর্ধেক টাকা অর্থাৎ ৩৬ লক্ষ ৬৪ হাজার ৫৭৫ কোটি টাকা আগামী ৫-৬ বছরে (২০২৯-৩০ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে) এমন ধরনের শিল্পকলকারখানা ও কৃষিতে বিনিয়োগ করেন, যা কোনো অবস্থাতেই বাতাস-পানি-পরিবেশের দূষণ করবে না (কারণ ওই দূষণ শ্বসনতন্ত্রের রোগজনিত মহামারি respiratory pandemic-এর কারণ হবে, যা থেকে আপনিও রেহাই পাবেন না)—তাহলে আপনাদের অতীত কৃতকর্ম ক্ষমা করা হবে। আর এই আপসমূলক প্রস্তাব মেনে নেওয়ার পরেও তো আপনার কাছে ৩৬ লক্ষ ৬৪ হাজার ৫৭৫ কোটি টাকার সমপরিমাণ কালোটাকা থেকেই যাচ্ছে। কালোওয়ালারা এখন একবার ভেবে দেখতে পারেন—অথবা অন্য কোনো ধরনের আপস প্রস্তাব থাকলে সেটা জনগণের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে পারেন। এ দেশের আমজনতা যথেষ্ট ক্ষমাশীল; চেতনায় মুক্তিযোদ্ধা। 'কালোওয়ালারা' আরো একটা বিষয় জেনে রাখলে উপকৃত হবেন, আর তা হলো—বিদেশে আপনাদের যেসব অবৈধ সম্পদ-সম্পত্তি আছে, যাকে বলা হয় "সার্বভৌম সম্পদ" বা "sovereign wealth"—আন্তর্জাতিক আইনকানুনে ওইসব সম্পদের মালিক কিন্তু আপনার দেশের জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র। এতকিছুর পরেও "জান দেব কিন্তু, মান দেব না—কালোটাকা দেব না"—এই মত পরিত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে (দেখুন: বারকাত, আবুল (২০২০) বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, পৃ. ৫৩৭)।

(২) আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১১ লক্ষ ৯৫ হাজার ৪৮৬ কোটি টাকা (সারণি ৪)। আমরা কোথায় কোন খাত-ক্ষেত্রে কেন কী পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দেব (অথবা দেওয়া উচিত)? এ বিষয়ে আমাদের সরাসরি উত্তর: আমাদের দেশের সংবিধানই হলো ব্যয়-বরাদ্দের প্রধান নির্দেশদাতা; অগ্রাধিকার বিবেচনা ওই নির্দেশনা মেনেই করতে হবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আমরা তা করি না—আমরা গুটিকয়েক মানুষ স্বজনতুষ্টিবাদী আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির (যাকে বলা যায় অলিগার্খিক-ক্রনি-ফাইন্যান্সিয়ালাইজড ক্যাপিটালইজম) স্বার্থ মেনে নব্য-উদারবাদী মুক্তবাজার মতাদর্শ মোতাবেক ব্যয়-বরাদ্দ

নির্ধারণ করি। আর বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতিতে আমাদের বিবেচনা যেহেতু প্রকৃতির প্রতি অনুগত থেকে আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ বৈষম্যহীন শোভন জীবনব্যবস্থা বিনির্মাণ-উদ্দিষ্ট, সেহেতু স্বাভাবিক যে আমাদের বরাদ্দ কাঠামোটাও সাযুজ্যপূর্ণ হবে। বাজেটে আমাদের বরাদ্দ কাঠামো হবে দেশে ধন বৈষম্য, আয় বৈষম্য, শিক্ষা বৈষম্য, স্বাস্থ্য বৈষম্যসহ সবধরনের বৈষম্য নিরসন-উদ্দিষ্ট। বাজেটে আমাদের প্রস্তাবিত বরাদ্দে স্বাভাবিকভাবেই অগ্রাধিকারক্রম হবে এ রকম: সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ, শিক্ষা, ও প্রযুক্তি, কৃষি, জনপ্রশাসন, স্বাস্থ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ, সুদ, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, গণপরিবহন, গৃহায়ণ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, গবেষণা-উদ্ভাবন-বিচ্ছুরণ ও উন্নয়ন, শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস, জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, বিবিধ ব্যয়, বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম (সংস্কৃতি ও ধর্মকে আমরা একবন্ধনী খাত থেকে দুটি ভিন্ন খাত হিসেবে প্রস্তাব করেছি) (দেখুন, সারণি ৫)। আমাদের এই বরাদ্দ কাঠামো সরকারের প্রচলিত বরাদ্দ কাঠামোর সাথে মিলবে না। যেহেতু আমাদের প্রস্তাবিত বাজেট সম্প্রসারণশীল বাজেট, সেহেতু (আমাদের প্রস্তাবিত মোট বরাদ্দ চলমান বাজেটের তুলনায় ৩.০৯ গুণ বেশি)। অর্থনীতির প্রতিটি খাতেই ব্যয়-বরাদ্দ বাড়বে। তবে সে বাড়ার হারটাও হবে *সংবিধানে প্রতিফলিত—সংবিধানের প্রাধান্য—'জনগণই হইবেন প্রজাতন্ত্রের মালিক'* চেতনার প্রতিফলন। আর সেইসাথে কভিড-১৯-এর মহাবিপর্যয় এবং বৈশ্বিক মন্দা ও যুদ্ধবিগ্রহের কারণে বাজেটে এমনকি সুনির্দিষ্ট বরাদ্দসহ নতুন নতুন বরাদ্দ খাতও থাকতে হবে। যেমন **আমাদের প্রস্তাবে খাত-উপখাত** হিসেবে এ ধরনের নতুন কয়েকটি হলো—**সার্বজনীন পেনশন বিভাগ, বিধিবদ্ধ রেশনিং বিভাগ, দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত মানুষের জন্য আবাসন বিভাগ, প্রবীণ হিতৈষী বিভাগ, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা বিভাগ, ভূমি সংস্কার বিভাগ, আদিবাসী, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা পৃথক্করণ, শিক্ষা ও প্রযুক্তি পৃথক্করণ, নারীর বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগ, নারীর ক্ষমতায়ন বিভাগ, শিশুবিকাশ বিভাগ, সংস্কৃতি ও ধর্ম পৃথক্করণ, নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ, শিল্পায়ন ত্বরান্বয়ন, প্রতিবন্ধী মানুষ, হাওর অঞ্চলের প্রকৃতিবান্ধব উন্নয়ন, অণু ও ক্ষুদ্র ব্যবসা-উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিভাগ, কৃষকদের স্বল্পমেয়াদি সুদবিহীন ঋণ, কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধ, নারীর ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্র অনুদান, জেনোমিক মেডিসিন, অসংক্রামক রোগ (ক্যানসার, হার্ট, কিডনি, ডায়াবেটিস) নিরাময়ে সরকারি চিকিৎসাসেবা, জাতীয় অনুবাদ প্রতিষ্ঠান, পাঠাগার**। প্রস্তাবিত বাজেটে ব্যয়-বরাদ্দ কাঠামো নিয়ে যারা বিরোধিতা করবেন, তাদের যুক্তিসহ লেখালেখির আহ্বান রইল। আহ্বান রইল সময় নিয়ে আলাপ-আলোচনা-তর্ক-বিতর্কের—যেসবে জনগণ সরাসরি রিয়েলটাইমে অংশ নিতে পারেন। তবে একই সাথে বাজেটের আয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমরা যে জনগণের সম্মতির প্রয়োজনীয়তাসহ বিভিন্ন ধরনের পথ-পদ্ধতি নিয়ে বলেছি—আশা করি, সে বিষয়েও তারা কথা বলবেন।

৫.৫ বিকল্প বাজেটে ব্যয়-বরাদ্দ হবে কোথায়?

৫.৫.১ তিনটি বড় মাপের বরাদ্দ-সংস্কার প্রস্তাব

কভিড-১৯ উদ্ভূত মহারোগ, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দা, ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের অভিঘাতসহ বিভিন্নমুখী আর্থ-সামাজিক মহামন্দা মোকাবিলাসহ ভবিষ্যতে শোভন রাষ্ট্র-শোভন সমাজ-শোভন অর্থনীতির বিকাশ ত্বরান্বিত করতে সংবিধানের প্রাধান্য "জনগণই হইবেন প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক" [অনুচ্ছেদ ৭(১)] এবং "আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককাংশে স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে" [অনুচ্ছেদ ৫৯(১)]—এই প্রতিশ্রুতি দুটি আত্মস্থ করে আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনটি বড় মাপের পরিবর্তন-সংস্কার প্রস্তাব করছি:

প্রথম প্রস্তাব: বর্তমান ৩৯টি মন্ত্রণালয় রাজধানী ঢাকা শহরে কেন্দ্রীভূত না রেখে কয়েকটি মন্ত্রণালয় ঢাকার বাইরে বিভাগীয় শহরে স্থানান্তর করা (দেখুন, সারণি ৩)।

দ্বিতীয় প্রস্তাব: সংবিধানের প্রাধান্য "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ" [অনুচ্ছেদ ৭ (১)]; সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি [অনুচ্ছেদ ১০]; গণতন্ত্র ও মানবাধিকার [অনুচ্ছেদ ১১]; বিকেন্দ্রীভূত-স্থানীয় শাসন উন্নয়নব্যবস্থা [অনুচ্ছেদ ৫৯ (১)]; মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা [অনুচ্ছেদ ১৫] এবং বৈষম্য রোধে গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব [অনুচ্ছেদ ১৬]—এসব মেনে অতিকেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থাকে তৃণমূল-মানুষমুখী ও গণমুখী করার লক্ষ্যে আমরা যেমন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে ভৌগোলিকভাবে স্থানান্তরের প্রস্তাব করেছি, তেমনি জনসমৃদ্ধি (peoples wellbeing অর্থে) নিশ্চিত করার প্রয়াস হিসেবে আমরা দুটি নতুন মন্ত্রণালয় (New Ministries) এবং বিদ্যমান মন্ত্রণালয়ের অধীন বেশকিছু নতুন বিভাগ (New Division/ Directorate) গঠন এবং এ লক্ষ্যে বাজেট বরাদ্দ প্রস্তাব করেছি (দেখুন, সারণি ৫)। আমাদের প্রস্তাবিত নতুন মন্ত্রণালয়দ্বয় হলো: (১) গণপরিবহন মন্ত্রণালয় (Ministry of Public Transport) এবং (২) গবেষণা, উদ্ভাবন, বিচ্ছুরণ, ও উন্নয়ন মন্ত্রণালয় (Research, Innovation, Diffusion, and Development Ministry)। আর বিদ্যমান বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে আমরা ১৬টি নতুন বিভাগ (New Division/ Directorate) প্রস্তাব করছি, যা হলো নিম্নরূপ: **সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন**— (১) প্রবীণ হিতৈষী বিভাগ, (২) দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়ন বিভাগ, (৩) নারীর ক্ষমতায়ন বিভাগ (গ্রাম ও শহরের দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত ও নারীপ্রধান খানা), (৪) আদিবাসী মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়ন বিভাগ, (৫) শিশুবিকাশ বিভাগ, (৬) বিধিবদ্ধ রেশনিং বিভাগ (দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জন্য), (৭) সার্বজনীন পেনশন বিভাগ, (৮) দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের আবাসন বিভাগ; **স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন**—(৯) জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা বিভাগ; **শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন**—(১০) নারীর বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগ, (১১) কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, (১২) মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ; **কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন**—(১৩) কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার বিভাগ, (১৪) হাওর-বাঁওর-বিল-চর-উপকূল উন্নয়ন বিভাগ; **পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন**—

(১৫) অর্থনৈতিক কূটনীতি বিভাগ; **বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন**—(১৬) অণু ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিভাগ **(দেখুন, সারণি ৪ ও ৯)**।

এ ছাড়া যদিও আমরা আসন্ন বাজেটে প্রস্তাব করিনি, তথাপি মনে করি—দেশে অনানুষ্ঠানিক খাত মন্ত্রণালয় (Ministry of informamal sector) গঠন করা উচিত। কারণ, দেশের মোট শ্রমশক্তির ৮০-৮৫ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। একইসাথে শক্তিশালী **কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার বিভাগ** গঠনের পাশাপাশি আমরা প্রস্তাব করছি যে—বর্তমান **ভূমি মন্ত্রণালয়ের** নাম বঙ্গবন্ধু প্রদেয় **ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়**-এ পরিবর্তন করা; পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয় বিলুপ্ত করে **আদিবাসী উন্নয়নবিষয়ক মন্ত্রণালয়** গঠন করা, যার দু'টো বিভাগ হবে পার্বত্য আদিবাসী বিভাগ এবং সমতলের আদিবাসী বিভাগ; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে কার্যকর পল্লী উন্নয়ন এবং গণমুখী-বহুমুখী সমবায় বিভাগ গড়ে তোলা (যার প্রতিটিতেই একজন করে ভিন্ন মন্ত্রী নিযুক্ত হবেন); শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন **শিল্প সুরক্ষা/ সংরক্ষণ বিভাগ** (Industry Protection Division) গড়ে তোলা; বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে **বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগ** গঠন করা; পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে শক্তিশালী কার্যকর **নদী খনন বিভাগ** প্রতিষ্ঠা করা।

তৃতীয় প্রস্তাব: আমাদের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব বাস্তবায়নে এক বছরের জন্য নয়, পরিকল্পিতভাবে পাঁচ বছরের জন্য বরাদ্দ (উন্নয়ন ও পরিচালন) দিতে হবে, যা থেকে প্রতিবছরের বরাদ্দ বার্ষিক বাজেটে প্রতিফলিত হবে। আমরা দ্বিতীয় প্রস্তাব বাস্তবায়নে পাঁচ বছর মেয়াদি বরাদ্দ প্রস্তাবনা আসন্ন ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বাজেটে উপস্থাপন করেছি (দেখুন, সারণি ৪)।

৫.৫.২ খাতওয়ারি বরাদ্দ প্রস্তাব

এখন আমরা আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাজেটে ব্যয়ের খাতওয়ারি বরাদ্দ প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপন করব। প্রথমেই বলে রাখি, আমাদের প্রস্তাবিত বাজেটটি উন্নত বাংলাদেশ অভিমুখী জনকল্যাণকামী—'শোভন জীবনব্যবস্থা' নিশ্চিতকরণে যে উন্নয়নদর্শন সঠিক বলে আমরা মনে করি; সে কারণেই কিছু স্বপ্ন দেখানোর—বাজেট বরাদ্দে আমাদের নিম্নরূপ: সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ (প্রস্তাবিত বাজেটে মোট বরাদ্দের ৬.৯৪ শতাংশ), শিক্ষা ও প্রযুক্তি (১২.৮৮ শতাংশ), কৃষি (৫.৮৯ শতাংশ), জনপ্রশাসন (২২.৭১ শতাংশ), স্বাস্থ্য (৫.২০ শতাংশ), পরিবহন ও যোগাযোগ (২.৪৬ শতাংশ), সুদ (২৩.৩০ শতাংশ), স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন (১.৩৯ শতাংশ), গণপরিবহন (৪.৮ শতাংশ), গৃহায়ণ (০.৩৪ শতাংশ), বিদ্যুৎ ও জ্বালানি (০.০৬ শতাংশ), গবেষণা-উদ্ভাবন-বিচ্ছুরণ ও উন্নয়ন (৩.৮ শতাংশ), শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস (০.৯৪ শতাংশ), জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা (৫.১৪ শতাংশ), প্রতিরক্ষা (৬.১ শতাংশ), বিবিধ ব্যয় (১.৩৫ শতাংশ), বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম (০.৫৯ শতাংশ) (সংস্কৃতি ও ধর্মকে আমরা একবন্ধনী খাত থেকে দুটি ভিন্ন খাত হিসেবে প্রস্তাব করেছি) **(দেখুন, সারণি ৪)**।

শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাত

শিক্ষা ও প্রযুক্তিখাতে চলতি অর্থবছর ২০২৩-২৪ এর বাজেটে সরকারের মোট বরাদ্দ (পরিচালন + উন্নয়ন) ছিল ১০৪,১৩৭ কোটি টাকা। বাংলাদেশকে জ্ঞানালোকিত মানুষের সমাজ রূপান্তরে মানবশক্তি উন্নয়নের কোনো বিকল্পই নেই। আর অন্তত সে কারণেই শিক্ষার অগ্রাধিকার এবং বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে আমরা এ খাতের জন্য আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তৃতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ ১৪৫,৪৭৪ কোটি টাকা নির্ধারণ করেছি, যা আমাদের মোট প্রস্তাবিত বরাদ্দের ১২.৮৮ শতাংশ এবং চলমান বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ১.৪০ গুণ বেশি (দেখুন, সারণি ৪, ৫, ৬)। আসন্ন অর্থবছরের জন্য শিক্ষাখাতে আমাদের প্রস্তাবিত বরাদ্দের মধ্যে 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষায়' চলমান বছরের সরকারি বরাদ্দ ৩৪ হাজার ৭২২ কোটি টাকার স্থলে ৪৫ হাজার ৬৭৫ কোটি টাকা (১.৩২ গুণ বৃদ্ধি) প্রস্তাব করছি। 'মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ' উপখাতে সরকারের মোট ৪২ হাজার ৮৩৮ কোটি টাকার বরাদ্দ ১.২০ গুণ বৃদ্ধি করে আমাদের প্রস্তাব ৫১ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সরকারি চলতি বাজেটে ১৩ হাজার ৬০৭ কোটি টাকার বিপরীতে আমরা ১.৬৫ গুণ বৃদ্ধি করে ২২ হাজার ৪৭৫ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করছি। মূলত আইসিটিনির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি খাতে সরকারি বরাদ্দ ২ হাজার ৩৬৮ কোটি টাকার জায়গায় আমাদের প্রস্তাব ৫ হাজার ৭২৪ কোটি টাকা, যা চলমান সরকারি বরাদ্দের তুলনায় ২.৪২ গুণ বেশি, 'কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ' খাতে সরকারি বরাদ্দ ১০ হাজার ৬০২ কোটি টাকার বিপরীতে আমাদের প্রস্তাবিত বরাদ্দ ১৮ হাজার কোটি টাকা, যার মধ্যে ১৪ হাজার কোটি টাকা যাবে কারিগরি শিক্ষাখাতে (উচ্চ উৎপাদনশীল অর্থনীতি গড়তে প্রয়োজন দক্ষ জনসম্পদ)।

'শিক্ষা ও প্রযুক্তি' খাত নিয়ে আমাদের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হলো (১) 'শিক্ষা' ও 'প্রযুক্তি'কে এখন একসাথে দেখিয়ে সরকার বলেন যে তারা শিক্ষায় সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেন। দাবিটা সঠিক নয়। আমাদের প্রস্তাব হলো 'শিক্ষা' ও 'প্রযুক্তি'কে দুটি ভিন্ন খাত হিসেবে দেখাতে হবে। যে ক্ষেত্রে 'শিক্ষা ও গবেষণা' হবে একটি খাত আর 'প্রযুক্তি' হবে অন্য খাত। একই সাথে 'শিক্ষা ও গবেষণা' বাজেট বরাদ্দ হবে কমপক্ষে জিডিপির ৫ শতাংশ। আমরা সেটাই প্রস্তাব করেছি। (২) প্রচলিত বাজেটে কারিগরি শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষাকে একসাথে এক খাতভুক্ত হিসাবে দেখানো হয়। আমরা তা অযৌক্তিক মনে করি। 'কারিগরি শিক্ষা' ও 'মাদ্রাসা শিক্ষার' উদ্দেশ্য ভিন্ন, সে কারণেই আমরা তা ভিন্নভাবে দেখানো যৌক্তিক বলে মনে করি। আমরা সেটাই করেছি এবং দুটি ভিন্ন বিভাগে রূপান্তরের কথা বলেছি। আমাদের প্রস্তাবে কারিগরি শিক্ষায় মোট বরাদ্দ ১৪ হাজার কোটি টাকা, আর মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে (ধর্মভিত্তিক সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান) ৪ হাজার কোটি টাকা (সারণি ৪)। (৩) শিক্ষাখাতে আমরা "নারীর বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগ" প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছি। এ জন্য আগামী ৫ বছরে ১০ হাজার কোটি টাকাসহ আসন্ন বাজেটে ২ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করছি। **শিক্ষাখাতের বরাদ্দকে ব্যয় (expenditure) হিসেবে নয়, বিবেচনা করতে হবে বিনিয়োগ (investment) হিসেবে।**

গবেষণাসংশ্লিষ্ট বাজেট "শিক্ষা ও প্রযুক্তি" খাতের অন্তর্গত বিধায় উল্লেখ জরুরি যে গত বছরের মতো এ বছরও আমরা "গবেষণা, উদ্ভাবন, বিচ্ছুরণ ও উন্নয়ন" (Research, Innovation, Diffusion and Development, RID & D) নামে একটি ভিন্ন (নতুন) মন্ত্রণালয় গঠনের প্রস্তাব করছি। আর এই মন্ত্রণালয়ের জন্য আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আমার প্রস্তাবিত বরাদ্দ ৩০ হাজার কোটি টাকাসহ আগামী ৫ বছরের জন্য (২০২৭-২৮ অর্থবছর পর্যন্ত) মোট ১ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা (দেখুন, সারণি ৪)।

স্বাস্থ্যখাত

স্বাস্থ্যখাতের অবস্থা যে একেবারেই বেহাল তা আমরা ৪.১৫ অনুচ্ছেদে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি। স্বাস্থ্যখাত এখন বৈষম্য সৃষ্টি ও দারিদ্র্য সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম। আর 'কভিড-১৯' প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে যে আমাদের দেশে আসলেই তেমন কোনো শক্তিশালী স্বাস্থ্যখাত নেই। নেই জনস্বাস্থ্য (public health) বলে কোনো কিছুর তেমন অস্তিত্ব। স্বাস্থ্যখাতে বর্তমান (২০২৩-২৪ অর্থবছরে) সরকারি বরাদ্দ ৩৮ হাজার ৫২ কোটি টাকা। আমরা এ বরাদ্দ ১.৯৪ গুণ বৃদ্ধি করে ৭৩ হাজার ৮০০ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি (সারণি ৫)।

আমরা মনে করি, **বর্ধিত স্বাস্থ্য বরাদ্দ সেসব খাত-উপখাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রবাহিত করা সমীচীন হবে, যার ফলে জনগণের সুস্বাস্থ্য-মধ্যস্থতাকারী জীবনসমৃদ্ধি নিশ্চিত হবে**। আর সে লক্ষ্যে বর্ধিত স্বাস্থ্য বরাদ্দ যেসব খাত-উপখাতসহ মানুষের জন্য উদ্দিষ্ট হতে হবে তার মধ্যে থাকবে—প্রাথমিক-মধ্যবর্তী-উচ্চতর স্বাস্থ্যসেবা (primary, secondary, tertiary healthcare); সবধরনের 'দারিদ্র্যের রোগ' (যক্ষ্মা, শ্বসনতন্ত্রের সংক্রমণ, প্রজননতন্ত্রের রোগ, জন্মদান প্রক্রিয়ার মা ও শিশুস্বাস্থ্য, ম্যালেরিয়া, ডায়েরিয়া, হাম, খাবার পানিতে আর্সেনিক-উদ্ভূত আর্সেনোকোসিস রোগ); গ্রামের ও নগরের দরিদ্র-প্রান্তস্থ মানুষ; সবধরনের প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা (preventive health care/ services), এবং ভবিষ্যৎ **জনস্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ জেনোমিক মেডিসিনে বিনিয়োগ** (শেষোক্ত এ বিনিয়োগটি রাষ্ট্রকে পরিকল্পিতভাবে করতে হবে, যার অন্তর্ভুক্ত হবে জেনোমিক মেডিসিন উৎপাদনে প্রণোদনা, গবেষণা, উন্নয়ন ও বিচ্ছুরণ অর্থাৎ RD & D বিনিয়োগ, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রভৃতি)। স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ প্রস্তাবে উল্লিখিত বিষয়াদির পাশাপাশি যে বিষয়টি আমরা গুরুত্বসহ বিবেচনা করেছি, তা হলো—সরকার প্রতিশ্রুত 'গ্রাম হবে শহর'-এর আওতায় সম্ভাব্য সবধরনের স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা প্রদানে যথাসাধ্য বিকেন্দ্রীভূত কাঠামো গড়ে তোলা।

আমাদের দেশে "জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা সিস্টেম" বলে কোনো কিছুই তেমন নেই। এ নিয়ে সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণ করে আমরা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়েছি যে স্বাস্থ্যখাতে বিদ্যমান ডাইরেক্টরেটের পাশাপাশি আরো একটি ডাইরেক্টরেট প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যার নাম হবে "জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ডাইরেক্টরেট" (Department/ Directorate of Public Health Safety/Security)। আমাদের প্রস্তাবনার এ বিভাগটি যা নিয়ে কাজ করবে তার নির্দেশনাও আমরা দিয়েছি। বিকল্প বাজেটে আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হলো ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে প্রস্তাবিত এই নবসৃষ্ট বিভাগে ৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ, যার ৩ হাজার কোটি টাকা যাবে পরিচালন বাজেটে আর ৫ হাজার কোটি টাকা যাবে উন্নয়ন বরাদ্দে। আসলে সুবিন্যস্ত ও কার্যকর 'জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা বিভাগ' প্রতিষ্ঠায় মোট লাগবে আনুমানিক ৪০ হাজার কোটি টাকা, যা পরবর্তী পাঁচ বছরের বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে (দেখুন, সারণি ৫)।

আমরা মনে করি, **স্বাস্থ্যখাতের বরাদ্দ হলো 'মানবসম্পদ' সৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ**, এ **বিনিয়োগ নিয়ে আপস হবে আত্মঘাতী। আমরা এও মনে করি, জনগণের স্বাস্থ্য মুক্তবাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়া মহা-অন্যায় এবং তা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে সম্পূর্ণ সাযুজ্যহীন**।

সারণি ৪: ব্যয়ের বাজেট

২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট ও সরকারের চলতি অর্থবছরের (২০২৩-২৪) বাজেট

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	পরিচালন[২]					উন্নয়ন[২]					পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০২৪-২৫ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
১	**জনপ্রশাসন**	**১,৪৭,৯৮৪**	**৩০.৫৬**	**১,৩৪,৫১৩**	**২২.৫২**	**০.৯১**	**১৯,৮৯৬**	**৭.১৭**	**১৮,৬৮৩**	**৩.১২**	**০.৯৪**	**১,৬৭,৮৮০**	**১,৫৩,১৯৬**	০.৯১
১.১	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়	৩২	০.০১	৪০	০.০১	**১.২৫**	-	০.০০	-	০.০০	-	৩২	৪০	১.২৫
১.২	জাতীয় সংসদ	৩৩৫	০.০৭	৩৫০	০.০৬	**১.০৪**	২	০.০০	**৫**	০.০০	**২.৫২**	৩৩৭	৩৫৫	১.০৫
১.৩	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৯৩১	০.১৯	৯০৫	০.১৫	**০.৯৭**	৩,৫২০	১.২৭	**৪,০২৫**	০.৬৭	**১.১৪**	৪,৪৫১	৪,৯৩০	১.১১
১.৪	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	১০৩	০.০২	১২০	০.০২	**১.১৭**	৮	০.০০	**১৫**	০.০০	**১.৮৮**	১১১	১৩৫	১.২২
১.৫	নির্বাচন কমিশন	২,১২৪	০.৪৪	৫০০	০.০৮	**০.২৪**	২৮২	০.১০	**৩০০**	০.০৫	**১.০৬**	২,৪০৬	৮০০	০.৩৩
১.৬	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৩,৫৩৬	০.৭৩	৩,০০০	০.৫০	**০.৮৫**	১,০০৩	০.৩৬	**৮০৬**	০.১৩	**০.৮০**	৪,৫৩৯	৩,৮০৬	০.৮৪
১.৭	সরকারি কর্মকমিশন	১০১	০.০২	১১২	০.০২	**১.১১**	৩০	০.০১	**৩৫**	০.০১	**১.১৭**	১৩১	১৪৭	১.১২
১.৮	অর্থ বিভাগ[৩]	১,৩৪,৯৮১	২৭.৮৮	১,২৩,২৬১	২০.৬৪	**০.৯১**	৬,৫৪৩	২.৩৬	৭,০০০	১.১৭	**১.০৭**	১,৪১,৫২৪	১,৩০,২৬১	০.৯২
১.১০	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৩,১১৩	০.৬৪	৩,১০০	০.৫২	**১.০০**	৩৮৩	০.১৪	২০৮	০.০৩	**০.৫৪**	৩,৪৯৬	৩,৩০৮	০.৯৫
১.১১	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	৯৮	০.০২	১৫০	০.০৩	**১.৫৩**	২,৮৫১	১.০৩	৩,৫০২	০.৫৯	**১.২৩**	২,৯৪৯	৩,৬৫২	১.২৪

সারণি ৪ চলমান...

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	পরিচালন[২]					উন্নয়ন[২]					পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০২৪-২৫ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
১.১২	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৬৯৯	০.১৪	৭৫০	০.১৩	**১.০৭**	৬৬	০.০২	৮০	০.০১	**১.২১**	৭৬৫	৮৩০	১.০৮
১.১৩	পরিকল্পনা বিভাগ[৪]	৮৮	০.০২	১২৫	০.০২	**১.৪২**	৪,৭৯৫	১.৭৩	২,০৫৭	০.৩৪	**০.৪৩**	৪,৮৮৩	২,১৮২	০.৪৫
১.১৪	বাস্তবায়ন পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	৬১	০.০১	১০০	০.০২	**১.৬৪**	১২৩	০.০৪	১৫০	০.০৩	**১.২২**	১৮৪	২৫০	১.৩৬
১.১৫	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	২৬১	০.০৫	৪০০	০.০৭	**১.৫৩**	১৫৪	০.০৬	৩০০	০.০৫	**১.৯৫**	৪১৫	৭০০	১.৬৯
১.১৬	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১,৫২১	০.৩১	১,৬০০	০.২৭	**১.০৫**	১৩৬	০.০৫	২০০	০.০৩	**১.৪৭**	১,৬৫৭	১,৮০০	১.০৯
১.১৭	অর্থনৈতিক কূটনীতি বিভাগ	-	০.০০	২৬০	০.০৪	-	-	০	২০	০.০০	-	-	২৮০	-
২	**স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন**	**৭,৩২৪**	**১.৫১**	**৮,২৫৭**	**১.৩৮**	**১.১৩**	**৪২,০১৮**	**১৫.১৪**	**৫৩,৯৬৯**	**৯.০২**	**১.২৮**	**৪৯,৩৪২**	**৬২,২২৬**	১.২৬
২.১	কর ন্যায়পালের অফিস	-	০.০০	-	০.০০	-	-	০.০০	-	০.০০	-	-	-	-
২.২	স্থানীয় সরকার বিভাগ	৬,২০০	১.২৮	৭,০০০	১.১৭	**১.১৩**	৪০,৫০৪	১৪.৫৯	৫০,৪১৯	৮.৪৩	**১.২৪**	৪৬,৭০৪	৫৭,৪১৯	১.২৩
২.৩	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	৬৭১	০.১৪	৭৫০	০.১৩	**১.১২**	৭৬২	০.২৭	২,০৫০	০.৩৪	**২.৬৯**	১,৪৩৩	২,৮০০	১.৯৫
২.৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪৫৩	০.০৯	৫০৭	০.০৮	**১.১২**	৭৫২	০.২৭	১,৫০০	০.২৫	**১.৯৯**	১,২০৫	২,০০৭	১.৬৭

সারণি ৪ চলমান...

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	পরিচালন[১]					উন্নয়ন[২]					পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০২৪-২৫ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
৩	**প্রতিরক্ষা**	**৪০,১৯০**	**৮.৩০**	**৩৫,৯৭১**	**৬.০**	**০.৯০**	**১,৫৪২**	**০.৫৬**	**১,৯১২**	**০.৩২**	**১.২৪**	**৪১,৭৩২**	**৩৭,৮৮৩**	০.৯১
৩.১	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-প্রতিরক্ষা সার্ভিস	৩৮,২৮৪	**৭.৯১**	**৩৪,১০০**	৫.৭১	**০.৮৯**	১,৫৪২	০.৫৬	১,৯১২	০.৩২	**১.২৪**	৩৯,৮২৬	৩৬,০১২	০.৯০
৩.২	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-অন্যান্য সার্ভিস	১,৮৬১	**০.৩৮**	**১,৮২০**	০.৩	**০.৯৮**	-		-		-	১,৮৬১	১,৮২০	০.৯৮
৩.৩	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	৪৫	**০.০১**	**৫১**	০.০	**১.১৩**	-	০.০০	-	-	-	৪৫	৫১	১.১৩
৪	**জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা**	**২৮,৮১২**	**৫.৯৫**	**৩০,৪৬২**	**৫.১০**	**১.০৬**	**৩,৪৫৪**	**১.২৪**	**৪,৪৪৮**	**০.৭৪**	**১.২৯**	**৩২,২৬৬**	**৩৪,৯১০**	১.০৮
৪.১	সুপ্রিম কোর্ট	২৩৭	০.০৫	২৫০	০.০৪	**১.০৫**	-	০.০০	১০৫	০.০২	-	২৩৭	৩৫৫	১.৫০
৪.২	আইন ও বিচার বিভাগ	১,৭৬৬	০.৩৬	১,৮৮০	০.৩১	**১.০৬**	১৭৬	০.০৬	২৫০	০.০৪	**১.৪২**	১,৯৪২	২,১৩০	১.১০
৪.৩	জননিরাপত্তা বিভাগ	২৩,৯৮১	৪.৯৫	২৫,০০০	৪.১৯	**১.০৪**	১,৭১৬	০.৬২	২,০০০	০.৩৩	**১.১৭**	২৫,৬৯৭	২৭,০০০	১.০৫
৪.৪	লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগ	৪১	০.০১	৫০	০.০১	**১.২২**	২	০.০০	৭	০.০০	**৩.৫০**	৪৩	৫৭	১.৩৩
৪.৫	দুর্নীতি দমন কমিশন	১৬৬	০.০৩	২১০	০.০৪	**১.২৭**	১৮	০.০১	৩০	০.০১	**১.৬৭**	১৮৪	২৪০	১.৩০
৪.৬	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	২,৬২১	০.৫৪	৩,০৭২	০.৫১	**১.১৭**	১,৫৪২	০.৫৬	২,০৫৬	০.৩৪	**১.৩৩**	৪,১৬৩	৫,১২৮	১.২৩
৫	**শিক্ষা ও প্রযুক্তি**	**৫৭,৩৯৩**	**১১.৮৫**	**৭৫,২৬৩**	**১৪.৪৪**	**১.৩১**	**৪৬,৭৪৪**	**১৫.৮২**	**৭০,২১১**	**১২.২৪**	**১.৫০**	**১,০৪,১৩৭**	**১,৪৫,৪৭৪**	১.৪০

সারণি ৪ চলমান...

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	পরিচালন[১]					উন্নয়ন[২]					পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০২৪-২৫ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
৫.১	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২২,৭০৪	৪.৬৯	২৮,০০০	৪.৬৯	**১.২৩**	১২,০১৮	৪.৩৩	**১৭,৬৭৫**	২.৯৫	**১.৪৭**	৩৪,৭২২	৪৫,৬৭৫	১.৩২
৫.২	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ	২৫,৯৩১	৫.৩৬	৩০,৮৭৫	৫.১৭	**১.১৯**	১৬,৯০৭	৬.০৯	**২০,৭২৫**	৩.৪৬	**১.২৩**	৪২,৮৩৮	৫১,৬০০	১.২০
৫.৩	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	৬২৭	০.১৩	১,৮০০	০.৩০	**২.৮৭**	১২,৯৮০	৪.৬৮	**২০,৬৭৫**	৩.৪৬	**১.৫৯**	১৩,৬০৭	২২,৪৭৫	১.৬৫
৫.৪	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	৩৫২	০.০৭	৫৮৮	০.১০	**১.৬৭**	২,০১৬	০.৭৩	**৫,১৩৬**	০.৮৬	**২.৫৫**	২,৩৬৮	৫,৭২৪	২.৪২
৫.৫	নারীর বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগ: (আগামী ৫ অর্থবছরে- ২০২৪-২৫ থেকে ২০২৮-২৯ মোট ১০ হাজার কোটি টাকা- অর্থাৎ বছরে ২ হাজার কোটি টাকা)	-	০.০০	১,০০০	০.১৭	-	-	০.০০	১,০০০	০.১৭	-	-	২,০০০	-
৫.৬	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	৭,৭৭৯	১.৬১	১৩,০০০	২.১৮	**১.৬৭**	২,৮২৩	১.০২	**৫,০০০**	০.৮৪	**১.৭৭**	১০,৬০২	১৮,০০০	১.৭০
	কারিগরি শিক্ষা বিভাগ	-	-	১১,০০০	১.৮৪	-			৩,০০০	০.৫০১	-		১৪,০০০	-

সারণি ৪ চলমান...

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	পরিচালন[১]					উন্নয়ন[২]					পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০২৪-২৫ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
	মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (ধর্মভিত্তিক সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)		-	২,০০০	০.৩৩	-			২,০০০	০.৩৩৪	-		৪,০০০	-
৬	**স্বাস্থ্য**	**২২,৫৮৮**	**৪.৬৬**	**৩৩,৮০০**	**৫.১৬**	**১.৫০**	**১৫,৪৬৪**	**৫.৫৭**	**৪০,০০০**	**৫.৮৫**	**২.৫৯**	**৩৮,০৫২**	**৭৩,৮০০**	১.৯৪
৬.১	স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ	১৭,২২১	৩.৫৬	২২,৫৫০	৩.৭৮	**১.৩১**	১২,২১০	৪.৪০	**২৪,৪৫০**	৪.০৯	**২.০০**	২৯,৪৩১	৪৭,০০০	১.৬০
৬.২	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগ	৫,৩৬৭	১.১১	৮,২৫০	১.৩৮	**১.৫৪**	৩,২৫৪	১.১৭	**১০,৫৫০**	১.৭৬	**৩.২৪**	৮,৬২১	১৮,৮০০	২.১৮

সারণি ৪ চলমান...

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	পরিচালন[১]					উন্নয়ন[২]					পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০২৪-২৫ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
৬.৩	জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা বিভাগ: জীবজন্তু-প্রাণিবাহিত রোগ, বায়োসিকিউরিটি, বায়োসেফটি; রোগ নির্ণয় ও রিপোর্টিং; সমন্বিত ডেটাবেজ; র‍্যাপিড রেসপন্স; জনস্বাস্থ্য সিস্টেম প্রতিষ্ঠা; জীবাণু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও যন্ত্রপাতি; জনস্বাস্থ্য ইমারজেন্সি মোকাবিলার দক্ষতা, প্রতিরোধ ব্যবস্থা (preventive care), মানসিক স্বাস্থ্য (আগামী ৫ অর্থবছরে–২০২৪-২৫ থেকে ২০২৮-২৯ মোট ৪০ হাজার কোটি টাকা অর্থাৎ বছরে ৮ হাজার কোটি টাকা)	-	০.০০	৩,০০০	০.৫০	-	২,৪৪৬	০.০০	৫,০০০	০.৮৪	২.০৪	২,৪৪৬	৮,০০০	৩.২৭
৭	সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ	৩১,৩৪৩	৬.৪৭	৫৭,০২০	৬.৮৯	১.৮২	৯,০০৪	৩.২৪	১,১৩,৩৮৮	৫.৬০	১২.৫৯	৪০,৩৪৭	১,৭০,৪০৯	৪.২২

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	পরিচালন[১]					উন্নয়ন[২]					পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০২৪-২৫ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
৭.১	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	১১,০৩৩	২.২৮	১৫,০০০	২.৫১	**১.৩৬**	১,১৮৪	০.৪৩	৮,৪৩২	১.৪১	**৭.১২**	১২,২১৭	২৩,৪৩২	১.৯২
৭.২	প্রবীণ হিতৈষী বিভাগ (আগামী ৫ অর্থবছরে– ২০২৪-২৫ থেকে ২০২৮-২৯ মোট ১১ হাজার কোটি টাকা অর্থাৎ বছরে ২ হাজার ২শ কোটি টাকা)			৭০০					১,৫০০				২,২০০	
৭.৩	মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩,৭৭৮	০.৭৮	৪,৪১০	০.৭৪	**১.১৭**	৯৭৬	০.৩৫	৫,৭৭৫	০.৯৭	**৫.৯২**	৪,৭৫৪	১০,১৮৫	২.১৪
৭.৪	খাদ্য মন্ত্রণালয়	৫,০৮৪	১.০৫	৬,৩৩৬	১.০৬	**১.২৫**	৯৩২	০.৩৪	৭,৬১৫	১.২৭	**৮.১৭**	৬,০১৬	১৩,৯৫১	২.৩২
৭.৫	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৫,৫৩২	১.১৪	৭,৭০৯	১.২৯	**১.৩৯**	৪,৫৮৫	১.৬৫	৯,৬৭৪	১.৬২	**২.১১**	১০,১১৭	১৭,৩৮৩	১.৭২
৭.৬	মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫,৯১৬	১.২২	৭,৬৬৫	১.২৮	**১.৩০**	১,৩২৭	০.৪৮	১,৯৯৩	০.৩৩	**১.৫০**	৭,২৪৩	৯,৬৫৮	১.৩৩

সারণি ৪ চলমান...

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	পরিচালন[১]					উন্নয়ন[২]					পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০২৪-২৫ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
৭.৭	দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়ন বিভাগ (গ্রাম ও শহর; ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান-অনানুষ্ঠানিক, কৃষি, শিক্ষা, সেবা: আগামী ৫ অর্থবছরে ২০২৪-২৫ থেকে ২০২৮-২৯ মোট ৬০ হাজার কোটি টাকা অর্থাৎ বছরে ১২ হাজার কোটি টাকা)	-	০.০০	৫,০০০	০.৮৪	-	-	০.০০	৭,০০০	০.০০	০.০০	-	১২,০০০	-
৭.৮	নারীর ক্ষমতায়ন বিভাগ: গ্রাম ও শহরের দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত ও নারী প্রধান খানা (আগামী ৫ অর্থবছরে-২০২৪-২৫ থেকে ২০২৮-২৯ মোট ৬৫	-	০.০০	৩,০০০	০.৫০	-	-	০.০০	১০,০০০	০.০০	০.০০	-	১৩,০০০	-

সারণি ৪ চলমান...

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	পরিচালন[১]					উন্নয়ন[২]					পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০২৪-২৫ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
	হাজার কোটি টাকা অর্থাৎ বছরে ১৩ হাজার কোটি টাকা) (খ)													
৭.৯	আদিবাসী মানুষের জীবনকুশলতা বিকাশ বিভাগ (আগামী ৫ অর্থবছরে- ২০২৪-২৫ থেকে ২০২৮-২৯ অর্থবছরে ৩ হাজার কোটি টাকা- অর্থাৎ বছরে ৬শ কোটি টাকা)	-	০.০০	২০০	০.০৩	-	-	০.০০	৪০০	০.০০	০.০০	-	৬০০	০.০০

সারণি ৪ চলমান...

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	পরিচালন[১]					উন্নয়ন[২]					পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০২৪-২৫ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
৭.১০	শিশুবিকাশ বিভাগ (আগামী ৫ অর্থবছরে- ২০২৪-২৫ থেকে ২০২৮-২৯ মোট ৮০ হাজার কোটি টাকা- অর্থাৎ বছরে ১৬ হাজার কোটি টাকা)	-	০	৪,০০০	০.৬৭	-	-	০	১২,০০০	০	-	-	১৬,০০০	০.০০
৭.১১	বিধিবদ্ধ রেশনিং বিভাগ (আগামী ৫ অর্থবছরে- ২০২৪-২৫ থেকে ২০২৮-২৯ - মোট ১০ হাজার কোটি টাকা- অর্থাৎ বছরে ২ হাজার কোটি টাকা)		০	১,০০০	০.১৭	-	-	০	১,০০০	০	-	-	২,০০০	১.০০
৭.১২	সার্বজনীন পেনশন বিভাগ (আগামী ৫ অর্থবছরে- ২০২৪-২৫ থেকে ২০২৮-২৯ - মোট ২ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা-অর্থাৎ বছরে ৫০	-	০	২,০০০	০.৩৩	০.০০	-	০	৪৮,০০০	০	০.০০	-	৫০,০০০	০.০০

সারণি ৪ চলমান...

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	পরিচালন[১]					উন্নয়ন[২]					পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০২৪-২৫ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
	হাজার কোটি টাকা)													
৮	**গৃহায়ণ**	**১,৯৪৯**	**০.৪০**	**৫,০০০**	**০.৩৩**	**২.৫৭**	**৫,৪৭৯**	**১.৯৭**	**২৫,৬২১**	**০.০০**	**৪.৬৮**	**৭,৪২৮**	**৩০,৬২১**	**৪.১২**
৮.১	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১,৯৪৯	০.৪০	২,০০০	০.৩৩	**১.০৩**	৫,৪৭৯	১.৯৭	৫,৬২১		**১.০৩**	৭,৪২৮	৭,৬২১	১.০৩
৮.২	দরিদ্র-প্রান্তিক নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের আবাসন বিভাগ (আগামী ৫ অর্থবছরে-২০২৪-২৫ থেকে ২০২৮-২৯-মোট ১ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকা অর্থাৎ বছরে ২৩ হাজার কোটি টাকা)	-	০.০০	৩,০০০	০.৫০	-	-	০.০০	২০,০০০	৩.৩৪	-	-	২৩,০০০	-
৯	**বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম**	**২,৫৩৬**	**০.৫২**	**৩,৫১০**	**০.৫৯**	**১.৩৮**	**৩,০৩২**	**১.০৯**	**৪,৪৭০**	**০.৭৫**	**১.৪৭**	**৫,৫৬৮**	**৭,৯৮০**	১.৪৩

সারণি ৪ চলমান...

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	পরিচালন[১]					উন্নয়ন[২]					পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০২৪-২৫ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
৯.১	তথ্য মন্ত্রণালয়	৮৩৯	০.১৭	১,১১৬	০.১৯	**১.৩৩**	২১২	০.০৮	৪১২	০.০৭	**১.৯৪**	১,০৫১	১,৫২৮	১.৪৫
৯.২	সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪৩৭	০.০৯	৬৭১	০.১১	**১.৫৪**	২৬২	০.০৯	১,০০০	০.১৭	**৩.৮২**	৬৯৯	১,৬৭১	২.৩৯
৯.৩	ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩৩৩	০.০৭	২২৩	০.০৪	**০.৬৭**	২,১৭৬	০.৭৮	৫৫৮	০.০৯	**০.২৬**	২,৫০৯	৭৮১	০.৩১
৯.৪	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৯২৭	০.১৯	১,৫০০	০.২৫	**১.৬২**	৩৮২	০.১৪	২,৫০০	০.৪২	**৬.৫৪**	১,৩০৯	৪,০০০	৩.০৬
১০	**বিদ্যুৎ ও জ্বালানী**	**১৩৩**	**০.০৩**	**২০০**	**০.০৬**	**১.৫০**	**৩৪,৬৮৬**	**১২.৫০**	**৪৭,০০০**	**১৪.০৪**	**১.৩৬**	**৩৪,৮১৯**	**৪৭,২০০**	১.৩৬
১০.১	জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ	৮৩	০.০২	১০০	০.০২	**১.২০**	৯১১	০.৩৩	১০,০০০	১.৬৭	**১০.৯৮**	৯৯৪	১০,১০০	১০.১৬
১০.২	বিদ্যুৎ বিভাগ	৫০	০.০১	১০০	০.০২	**২.০০**	৩৩,৭৭৫	১২.১৭	৩৭,০০০	৬.১৮	**১.১০**	৩৩,৮২৫	৩৭,১০০	১.১০
	বিদ্যুৎ উৎপাদন		০.০০	৩০	০.০১	-	-	০.০০	৭,০০০	১.১৭	-	-	৭,০৩০	-
	বিদ্যুৎ সঞ্চালন		০.০০	৭১	০.০১	-	-	০.০০	১৫,০০০	২.৫১	-	-	১৫,০৭১	-
	বিদ্যুৎ বিতরণ		০.০০	৫১	০.০১	-	-	০.০০	১৫,০০০	২.৫১	-	-	১৫,০৫১	-
১১	**কৃষি[৫]**	**২৭,৩৫৪**	৫.৬৫	**৩৭,০৬৮**	৫.৮৪	**১.৩৬**	**১৬,৩৪৬**	৫.৮৯	**৬৩,৫০৪**	**৫.৬০**	**৩.৮৮**	**৪৩,৭০০**	**১,০০,৫৭২**	২.৩০
১১.১	কৃষি মন্ত্রণালয়	২০,৭৭০	৪.২৯	২৬,৩৪২	৪.৪১	**১.২৭**	৪,৩৪৮	১.৫৭	১৩,৩৮৬	২.২৪	**৩.০৮**	২৫,১১৮	৩৯,৭২৮	১.৫৮
১১.২	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	১,৮১৩	০.৩৭	২,৬২৬	০.৪৪	**১.৪৫**	২,৪২৭	০.৮৭	৪,৭৪৮	০.৭৯	**১.৯৬**	৪,২৪০	৭,৩৭৪	১.৭৪
১১.৩	পরিবেশ, বন মন্ত্রণালয়	৭৮৮	০.১৬	১,০০০	০.১৭	**১.২৭**	৮৫১	০.৩১	১,৯১৬	০.৩২	**২.২৫**	১,৬৩৯	২,৯১৬	১.৭৮

সারণি ৪ চলমান...

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	পরিচালন[১]					উন্নয়ন[২]					পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০২৪-২৫ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
১১.৪	ভূমি মন্ত্রণালয়	১,৫৩৩	০.৩২	১,৮০০	০.৩০	**১.১৭**	৯২৬	০.৩৩	২,৫০০	০.৪২	**২.৭০**	২,৪৫৯	৪,৩০০	১.৭৫
১১.৫	পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	২,৪৫০	০.৫১	৩,১০০	০.৫২	**১.২৭**	৭,৭৯৪	২.৮১	১০,৯৫৪	১.৮৩	**১.৪১**	১০,২৪৪	১৪,০৫৪	১.৩৭
১১.৬	কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার বিভাগ: (আগামী ৫ অর্থবছরে- ২০২৪-২৫ থেকে ২০২৮-২৯ অর্থবছরে মোট ৮১ হাজার কোটি টাকা-অর্থাৎ বছরে ১৬ হাজার কোটি টাকা) (ক)	-	০	১,২০০	০.২	-	-	০	**১৫,০০০**	২.৫১	-	-	১৬,২০০	-
১১.৭	হাওর-বাঁওর-বিল-চর-উপকূল উন্নয়ন বিভাগ: (আগামী ৫ অর্থবছরে- ২০২৪-২৫ থেকে ২০২৮-২৯ অর্থবছরে মোট ৮০ হাজার কোটি টাকা-অর্থাৎ বছরে ১৬ হাজার কোটি টাকা)	-	০	১,০০০	০১৭	-	-	০	**১৫,০০০**	২.৫১	-	-	১৬,০০০	-

সারণি ৪ চলমান...

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	পরিচালন[১]					উন্নয়ন[২]					পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০২৪-২৫ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
১২	**শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস**	**১,৪৮৬**	**০.৩১**	**৫,৫৮৪**	**০.৯৪**	**৩.৭৬**	**৪,১০১**	**১.৪৮**	**১৬,১৬৬**	**২.৭০**	**৩.৯৪**	**৫,৫৮৭**	**২১,৭৫০**	৩.৮৯
১২.১	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৮৫	০.০৬	৩,৮৬৬	০.৬৫	**১৩.৫৬**	৩০৮	০.১১	**১০,৮৭৫**	১.৮২	**৩৫.৩১**	৫৯৩	১৪,৭৪১	২৪.৮৬
	অণু ও ক্ষুদ্র ব্যবসা-উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিভাগ: (আগামী ৫ অর্থবছরে-২০২৪-২৫ থেকে ২০২৮-২৯ অর্থবছরে মোট ১ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাক-অর্থাৎ বছরে ২৮ হাজার কোটি টাকা)			৩,০০০					**২৫,০০০**				২৮,০০০	
১২.২	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২২৩	০.০৫	৩০০	০.০৫	**১.৩৫**	১২৪	০.০৪	৭৫০	০.১৩	**৬.০৫**	৩৪৭	১,০৫০	৩.০৩
১২.৩	শিল্প মন্ত্রণালয়	৩৭০	০.০৮	৫৮১	০.১০	**১.৫৭**	২,৬৫৩	০.৯৬	২,৭৪৮	০.৪৬	**১.০৪**	৩,০২৩	৩,৩৩০	১.১০
১২.৪	প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৩৯২	০.০৮	৪৫০	০.০৮	**১.১৫**	৬২৬	০.২৩	৭৯৩	০.১৩	**১.২৭**	১,০১৮	১,২৪৩	১.২২
১২.৫	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	২১৬	০.০৪	৩৮৭	০.০৬	**১.৭৯**	৩৯০	০.১৪	১,০০০	০.১৭	**২.৫৬**	৬০৬	১,৩৮৭	২.২৯

সারণি ৪ চলমান...

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	পরিচালন[১]					উন্নয়ন[২]					পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০২৪-২৫ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
১৩	**পরিবহণ ও যোগাযোগ**	**১১,৮১৩**	**২.৪৪**	**১৪,৫৪৭**	**২.৪৪**	**১.২৩**	**৭৫,৮১৬**	**২৭.৩১**	**৯৮,৯৩১**	**১৬.৫৪**	**১.৩০**	**৮৭,৬২৯**	**১,১৩,৪৭৮**	১.২৯
১৩.১	সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ	৫,৬৪৮	১.১৭	৬,৬০৪	১.১১	**১.১৭**	৩৪,০৬২	১২.২৭	৩৭,০৮৪	৬.২০	**১.০৯**	৩৯,৭১০	৪৩,৬৮৮	১.১০
১৩.২	রেলপথ মন্ত্রণালয়	৪,০৫০	০.৮৪	৫,০৮৮	০.৮৫	**১.২৬**	১৪,৯৬০	৫.৩৯	২০,৩৫২	৩.৪০	**১.৩৬**	১৯,০১০	২৫,৪৪০	১.৩৪
১৩.৩	নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়	৮৪৬	০.১৭	১,১৮৫	০.২০	**১.৪০**	৯,৯৫৫	৩.৫৯	১৫,৮৬০	২.৬৫	**১.৫৯**	১০,৮০১	১৭,০৪৫	১.৫৮
১৩.৪	বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৫৪	০.০১	৮০	০.০১	**১.৪৮**	৬,৫৪২	২.৩৬	৭,৫৭২	১.২৭	**১.১৬**	৬,৫৯৬	৭,৬৫২	১.১৬
১৩.৫	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	১,২০৬	০.২৫	১,৫৭৫	০.২৬	**১.৩১**	১,২৩৩	০.৪৪	২,২৫১	০.৩৮	**১.৮৩**	২,৪৩৯	৩,৮২৬	১.৫৭
১৩.৬	সেতু বিভাগ	৯	০.০০	১৫	০.০০	**১.৬৯**	৯,০৬৪	৩.২৭	১৫,৮১২	২.৬৪	**১.৭৪**	৯,০৭৩	১৫,৮২৭	১.৭৪
১৪	**সুদ**	**৯৪,৩৭৬**	**১৯.৪৯**	**১,৩৮,০০০**	**২৩.১১**	**১.৪৬**	-		-		-	**৯৪,৩৭৬**	**১,৩৮,০০০**	১.৪৬
১৪.১	অভ্যন্তরীণ	৮২,০০০	১৬.৯৪	১,০৩,০০০	১৭.২৫	**১.২৬**	-		-		-	৮২,০০০	১,০৩,০০০	১.২৬
১৪.২	বৈদেশিক	১২,৩৭৬	২.৫৬	৩৫,০০০	৫.৮৬	**২.৮৩**	-		-		-	১২,৩৭৬	৩৫,০০০	২.৮৩
১৫	**বিবিধ ব্যয়**	**৮,৯২২**	**১.৮৪**	**৭,৯৮৮**	**১.৩৪**	**০.৯০**	-		-		-	**৮,৯২২**	**৭,৯৮৮**	০.৯০
১৫.১	খাদ্য হিসাব (নিট)	৫০২	০.১০	৬,৯১২	১.১৬	**১৩.৭৭**	-		-		-	৫০২	৬,৯১২	১৩.৭৭

সারণি ৪ চলমান...

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	পরিচালন[১]					উন্নয়ন[২]					পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০২৪-২৫ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
১৫.২	ঋণ ও অগ্রিম (নিট)	৮,৪২০	১.৭৪	১,০৭৬	০.১৮	০.১৩	-		-		-	৮,৪২০	১,০৭৬	০.১৩
১৬	গবেষণা, উদ্ভাবন, বিচ্ছুরণ ও উন্নয়ন মন্ত্রণালয় (RID & D: Research, Innovation, Diffusion and Development) (আগামী ৫ অর্থবছরে ২০২৪-২৫ থেকে ২০২৮-২৯ মোট ১ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা অর্থাৎ বছরে ৩০ হাজার কোটি টাকা)	-	০.০০	৫,০০০	০.৮৪	-	-	০.০০	২৫,০০০	০.০০	-	-	৩০,০০০	-
১৭	গণপরিবহন মন্ত্রণালয় (আগামী ৫ অর্থবছরে ২০২৪-২৫ থেকে ২০২৮-২৯ মোট ১ লক্ষ কোটি টাকা-অর্থাৎ বছরে ২০ হাজার কোটি টাকা)	-	০.০০	৫,০০০	০.৮৪	-	-	০.০০	১৫,০০০	০.০০	-	-	২০,০০০	-

সারণি ৪ চলমান...

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	পরিচালন[১]					উন্নয়ন[২]					পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০২৪-২৫ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
	মোট	**৪,৮৪,২০৩**	**১০০**	**৫,৯৭,৯৮৩**	**১০০**	**১.২৩**	**২,৭৭,৫৮২**	**১০০**	**৫,৯৮,৩০৩**	**১০০**	**২.১৬**	**৭,৬১,৭৮৫**	**১১,৯৫,৪৮৬**	**১.৫৭**

১	পূর্বের 'অনুনয়ন ব্যয়'কে নতুন প্রবর্তিত বাজেট ও হিসাবরক্ষণ শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিতে 'পরিচালন ব্যয়' হিসেবে দেখানো হয়েছে।
২	উন্নয়ন কার্যক্রম = এডিপিবহির্ভূত কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও স্থানান্তর + এডিপিবহির্ভূত বিশেষ প্রকল্প + স্কিম (পূর্বের রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচী) + বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি।
৩	পরিচালন ব্যয়ে অপ্রত্যাশিত ব্যয়, ভর্তুকি ও প্রণোদনা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ ফান্ড এবং রপ্তানি সহায়তা বাবদ ১১,৩২৫ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।
৪	২০২২-২৩ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগের প্রাক্কলিত উন্নয়ন ব্যয়ে বিশেষ প্রয়োজনে প্রদেয় উন্নয়ন সহায়তা বাবদ ১,১৫৯ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।
৫	কৃষি মন্ত্রণালয়ের পরিচালন ব্যয়ে সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রম খাতে প্রণোদনা বাবদ ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ১২,০০০ কোটি টাকা এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে ১৬,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।
(*)	খাতভিত্তিক সম্পদ বিভাজনে পেনশন ও ভর্তুকি অন্তর্ভুক্ত আছে।
(**)	কৃষি খাতের বরাদ্দে প্রণোদনা অন্তর্ভুক্ত।
(***)	ঋণ ও অগ্রিম (নীট) এবং খাদ্য হিসাব (নীট) বাবদ ব্যয়কে একত্রে 'বিবিধ ব্যয়' নামে প্রদর্শন করা হয়েছে।

সারণি ৪ চলমান...

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	পরিচালন[১]					উন্নয়ন[২]					পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪*		২০২৪-২৫		বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০২৩-২৪ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০২৪-২৫ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
(*****)	উৎস: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাৎসরিক বাজেট ২০২৩-২৪, বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, পৃ. ৬-১৪। ঢাকা: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।													
(******)	বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির ২২ মে ২০২৪ তারিখের সভায় অনুমোদিত।													
উৎস	(ক): আবুল বারকাত লিখিত 'পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী আদিবাসী মানুষ এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারে জাতীয় বাজেট বরাদ্দ: অর্থবছর ২০২১-২২ এর বিশ্লেষণ এবং আসন্ন ২০২১-২২ এর জন্য প্রস্তাব', (২৯ মে ২০২১, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার ও এ এল আর ডি)। ঝষরফব ৩০ এ বিস্তারিত আছে। মোট ৫ বছরে ৪,৬০০ কোটি টাকার মধ্যে পার্বত্য আদিবাসী মানুষের জন্য ২,৫০০ কোটি টাকা এবং সমতলের আদিবাসী মানুষের জন্য ২,০০০ কোটি টাকা। পার্বত্য আদিবাসীদের আসন্ন (২০২৩-২৪) অর্থবছরে প্রস্তাবিত মোট ৫০০ কোটি টাকার মধ্যে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের জন্য ৩০০ কোটি টাকা, আঞ্চলিক পরিষদের জন্য ১০০ কোটি টাকা, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ কমিশনের জন্য ১০০ কোটি টাকা।													
	(খ) আবুল বারকাত লিখিত 'পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী আদিবাসী মানুষ এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কাওে জাতীয় বাজেট বরাদ্দ: অর্থবছর ২০২১-২২ এর বিশ্লেষণ এবং আসন্ন ২০২১-২২ এর জন্য প্রস্তাব', (২৯ মে ২০২১, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার ও এ এল আর ডি)। ঝষরফব ৬৬ এ বিস্তারিত আছে। আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে গ্রামীণ নারীর জন্য মোট উন্নয়ন বরাদ্দ হওয়া উচিত ১ লক্ষ ৫১ হাজার ২০৫ কোটি টাকা (যা প্রস্তাব-অপেক্ষ্যমান মোট উন্নয়ন বরাদ্দের ৬৪%)।													

সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ খাত

আমাদের প্রস্তাবিত বৈষম্য নিরসন-উদ্দিষ্ট জনগণতান্ত্রিক বাজেটে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত হলো "সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণখাত"। এই খাতে এখন সরকারি বরাদ্দ ৪০ হাজার ৩৪৭ কোটি টাকা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসসহ 'কভিড-১৯'-এর লকডাউন-উদ্ভূত মহাবিপর্যয় এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা ও যুদ্ধবিগ্রহের কারণে সামনের দিকে অনিশ্চয়তা—এসব কারণে আমরা এ বরাদ্দ ৪.২২ গুণ বাড়িয়ে ১ লক্ষ ৭০ হাজার ৪০৯ কোটি টাকা প্রস্তাব করছি; এর মধ্যে আমরা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চলমান বাজেট ১২ হাজার ২১৭ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২৩ হাজার ৪৩২ কোটি টাকা, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ৪ হাজার ৭৫৪ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১০ হাজার ১৮৫ কোটি টাকা, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ ৭ হাজার ২৪৩ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৯ হাজার ৬৫৮ কোটি টাকা, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এখনকার বাজেট বরাদ্দ ৬ হাজার ১৬ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৩ হাজার ৯৫১ কোটি টাকা, এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ১০ হাজার ১১৭ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৭ হাজার ৩৮৩ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।

এখানে সবিশেষ জোর দিয়ে বলা দরকার যে ২০২৩-২৪ অর্থবছর থেকে অন্তত আগামী ৫ বছরের জন্য "সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ" খাতের আওতায় আমরা বেশকিছু নতুন বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সংশ্লিষ্ট বাজেট প্রস্তাব করছি। এসবই হবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন (অবশ্য এ নিয়ে ভাবা যেতে পারে)। আমাদের প্রস্তাবসমূহ নিম্নরূপ:

(১) আজকের এবং ভবিষ্যতের প্রবীণ মানুষদের অবদান, জনসংখ্যায় প্রবীণ মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং 'উন্নয়ন-ধাক্কায়' প্রবীণদের পিছলেপড়া আর জীবনের ভঙ্গুরতা-একাকীত্ব-নিঃসঙ্গতা বৃদ্ধির কারণে আমরা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন **'প্রবীণ হিতৈষী বিভাগ'** প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করছি। এ লক্ষ্যে আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২ হাজার ২০০ কোটি টাকাসহ আগামী ৫ বছরের জন্য ১১ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করছি।

(২) **দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়ন বিভাগ (গ্রাম-শহর; ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান-অনানুষ্ঠানিক, কৃষি, শিক্ষা, সেবা):** প্রস্তাবিত বরাদ্দ আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১২ হাজার কোটি টাকাসহ (৭ হাজার কোটি টাকা উন্নয়ন ও ৫ হাজার কোটি টাকা অনুন্নয়ন/ পরিচালন বাজেট) আগামী ৫ বছরে (২০২৮-২৯ অর্থবছর পর্যন্ত) মোট ৬০ হাজার কোটি টাকা;

(৩) **নারীর ক্ষমতায়ন বিভাগ** (গ্রাম ও শহরের দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত ও নারীপ্রধান খানা) প্রস্তাবিত বরাদ্দ আসন্ন অর্থবছরে ১৩ হাজার কোটি টাকাসহ আগামী ৫ বছরে মোট ৬৫ হাজার কোটি টাকা;

(৪) **আদিবাসী মানুষের জীবনকুশলতা বিকাশ বিভাগ:** প্রস্তাবিত বরাদ্দ আসন্ন অর্থবছরে ৬০০ কোটি টাকাসহ আগামী ৫ বছরে ৩ হাজার কোটি টাকা;

(৫) **শিশুবিকাশ বিভাগ:** প্রস্তাবিত বরাদ্দ—আসন্ন অর্থবছরে ১৬ হাজার কোটি টাকাসহ আগামী ৫ বছরে ৮০ হাজার কোটি টাকা;

(৬) **বিধিবদ্ধ রেশনিং বিভাগ (দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষসহ):** প্রস্তাবিত বরাদ্দ—আসন্ন অর্থবছরে ২ হাজার কোটি টাকাসহ আগামী ৫ বছরে ১০ হাজার কোটি টাকা; এবং

(৭) **সার্বজনীন পেনশন বিভাগ:** আসন্ন অর্থবছরের বাজেটে প্রস্তাবিত বরাদ্দ ৫০ হাজার কোটি টাকাসহ আগামী ৫ বছরে (২০২৮-২৯ অর্থবছর পর্যন্ত) মোট ২ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা (দেখুন, সারণি ৪)।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত

আমাদের প্রস্তাবনায় বিকল্প বাজেটে মোট ১৭টি বৃহৎবর্গীয় খাতের মধ্যে 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানি' ১১তম বৃহৎ বরাদ্দ প্রাপ্তিযোগ্য খাত। বিদ্যুৎ ও জ্বালানিখাতে সরকারি বরাদ্দ এখন ৩৪ হাজার ৮১৯ কোটি টাকা। আমরা এ বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ৪৭ হাজার ২০০ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি, যার মধ্যে জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগে বর্তমান ৯৯৪ কোটি টাকার বরাদ্দ ১০ গুণ বৃদ্ধি করে ১০ হাজার ১০০ কোটি টাকা, বিদ্যুৎ বিভাগে ৩৩ হাজার ৮২৫ কোটি টাকার বরাদ্দ ১.১০ গুণ বৃদ্ধি করে ৩৭ হাজার ১০০ কোটি টাকা প্রস্তাব করছি। আর বিদ্যুৎ বিভাগের বাজেটে আমাদের প্রস্তাবে আছে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ৭ হাজার ৩০ কোটি টাকা, বিদ্যুৎ সঞ্চালনে ১৫ হাজার ৭১ কোটি টাকা এবং বিদ্যুৎ বিতরণে ১৫ হাজার ৫১ কোটি টাকা। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ বাজেট বরাদ্দ—আমাদের নতুন প্রস্তাব, যা সরকারের বাজেটে ভিন্নভাবে দেখানো হয় না। বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনায় আমরা নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেছি। আমরা এসব বলেছি এ জন্য যে—আমরা প্রকৃতি-পরিবেশ ও উন্নয়নের যোগসূত্রে অনবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুতের মারাত্মক ঋণাত্মক অভিঘাত সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন।

পরিবহন ও যোগাযোগখাত

পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে বর্তমান সরকারি বরাদ্দ (২০২৩-২৪ অর্থবছরে) ৮৭ হাজার ৬২৯ কোটি টাকা। বিকল্প বাজেটে আমরা এ বরাদ্দ ১.২৯ গুণ বৃদ্ধি করে ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৪৭৮ কোটি টাকা প্রস্তাব করছি। উপখাত হিসাবে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের জন্য বর্তমান সরকারি বরাদ্দ ৩৯ হাজার ৭১০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৪৩ হাজার ৬৮৮ কোটি টাকা, সেতু বিভাগে ৯ হাজার ৭৩ কোটি টাকা থেকে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ১৫ হাজার ৮২৭ কোটি টাকা, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ ১৯ হাজার ১০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২৫ হাজার ৪৪০ কোটি টাকা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের বর্তমান বরাদ্দ ১০ হাজার ৮০১ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৭ হাজার ৪৫ কোটি টাকা, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ ৬ হাজার ৫৯৬ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৭ হাজার ৬৫২ কোটি টাকা, এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বর্তমান বরাদ্দ ২ হাজার ৪৩৯ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩ হাজার ৮২৬ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে অনেক যৌক্তিক কারণেই আমরা অবকাঠামো উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিয়েছি। এসব কারণের অন্যতম হলো—শক্তিশালী

অর্থনীতি গড়ে তোলা, মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বৃদ্ধি, সমতাভিমুখী সমাজ-অর্থনীতি গড়ে তোলার ভিত্তি সুদৃঢ়করণ, এবং সর্বোপরি শোভন বাংলাদেশ বিনির্মাণ।

উল্লেখ্য, সমগ্র পরিবহনব্যবস্থায় জনদুর্ভোগ এবং শোভন জীবনব্যবস্থা বিনির্মাণের লক্ষ্যে এ বছর আমরা "গণপরিবহন মন্ত্রণালয়" (Ministry of Public Transport) নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছি। প্রস্তাবিত গণপরিবহন মন্ত্রণালয়ের জন্য আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২০ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাবসহ আগামী ৫ বছরে মোট ১ লক্ষ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করছি (দেখুন, সারণি ৪)।

ঋণের সুদ

ঋণের সুদাসল পরিশোধ বাবদ আমরা আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করছি (সারণি ৪)। চলতি বাজেটে বৈদেশিক ঋণের সুদ খাতে সরকারের বরাদ্দ ১২ হাজার ৩৭৬ কোটি টাকা, আমরা প্রস্তাব করছি ৩৫ হাজার কোটি টাকা। আমরা চাই, একদিকে বৈদেশিক ঋণের সুদ ও আসল যত দ্রুত সম্ভব পরিশোধ করতে, আর অন্যদিকে পাশাপাশি চাই মূল ঋণ ও সুদ পরিশোধে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কূটনীতি জোরদার করতে। স্বৈরাচার শাসনামলে যেসব বিদেশি ঋণ নেওয়া হয়েছিল, সেসবের দায়ভার নিয়ে আমরা ঋণদাতাদের সাথে আলোচনার পক্ষে। এসবই আমাদের নীতিগত অবস্থান। আমরা ঋণগ্রস্ত জাতি হওয়ার দৈন্য দেখাতে চাই না। উল্লেখ্য যে এ বছরের বাজেটে আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে "অর্থনৈতিক কূটনীতি বিভাগ" প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবসহ ২৮০ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব দিয়েছি।

যেহেতু আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটের (অর্থবছর ২০২৪-২৫) আকার চলমান বাজেটের (অর্থবছর ২০২৩-২৪) তুলনায় ১.৫৭ গুণ বড়, সেহেতু বাজেটের সব খাতেই আমাদের প্রস্তাবিত বরাদ্দ চলমান বাজেটের তুলনায় বেশি। তবে যেহেতু খাতভিত্তিক বাজেট বণ্টনের কাঠামো নির্ভর করছে আমাদের প্রস্তাবিত ব্যয়-বরাদ্দনির্ধারণী মডেলের ওপর, সেহেতু বিভিন্ন খাতে ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধির হার এক নয়। যেমন চলতি বাজেটের বরাদ্দের তুলনায় বিকল্প বাজেটে *'কৃষি'*তে বরাদ্দ ২.৩০ গুণ বেশি (মোট বরাদ্দ ১ লক্ষ ৫৭২ কোটি টাকা), *'শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস'*-এ বরাদ্দ ৩.৮৯ গুণ বেশি (মোট বরাদ্দ ২১ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা), যেখানে বাস্তবতা বিবেচনায় প্রস্তাবিত অণু ও ক্ষুদ্র ব্যবসা-উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিভাগের জন্য বরাদ্দ ২৮ হাজার কোটি টাকা); *'গৃহায়ণ'*-এ ৪.১২ গুণ বেশি (মোট বরাদ্দ ৩০ হাজার ৬২১ কোটি টাকা, যার মধ্যে প্রস্তাবিত নতুন বিভাগ "মানুষের জন্য আবাসন" খাতে ২৩ হাজার কোটি টাকা); *'স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন'*-এ ১.২৬ গুণ বেশি (মোট বরাদ্দ ৬২ হাজার ২২৬ কোটি টাকা, যার মধ্যে ৮৫.৩ শতাংশ স্থানীয় সরকার বিভাগে); *'বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম'*তে ১.৪৩ গুণ বেশি (মোট বরাদ্দ ৭ হাজার ৯৮০ কোটি টাকা); *'জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা'*য় ১.০৮ গুণ বেশি (মোট বরাদ্দ ৩৪ হাজার ৯১০ কোটি টাকা, যার মধ্যে জননিরাপত্তা বিভাগে ৭৭.৩ শতাংশ); এবং *'জনপ্রশাসন'*-এ ০.৯১ গুণ বেশি (মোট বরাদ্দ ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ১৯৬ কোটি টাকা, যার ৮৫ শতাংশ অর্থ বিভাগে)।

প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে চলমান বাজেটের তুলনায় মোট বাজেটের অংকে যেসব খাতে বৃদ্ধি হবে, সেগুলো হলো: সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ (চলমান বাজেটের ৫.৩ শতাংশ, কিন্তু বিকল্প বাজেটের ১৪.৩ শতাংশ), কৃষি (চলমান বাজেটের ৫.৭ শতাংশ, বিকল্প বাজেটের ৮.৪ শতাংশ), স্বাস্থ্য (চলমান

বাজেটের ৫ শতাংশ, কিন্তু বিকল্প বাজেটের ৬.২ শতাংশ), গৃহায়ণ (চলমান বাজেটের ১ শতাংশ, বিকল্প বাজেটের ২.৬ শতাংশ), এবং শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস (চলমান বাজেটের ০.৭ শতাংশ, বিকল্প বাজেটের ১.৮ শতাংশ) (দেখুন, সারণি ৬)।

প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে বড় ধরনের কাঠামোগত বিন্যাস হবে এ রকম যে—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ, এবং গৃহায়ণ— এই চার খাতে সম্মিলিত বরাদ্দ হবে মোট বাজেটের ৩৫.২ শতাংশ, যা চলমান বাজেটে মাত্র ২৫ শতাংশ; ঠিক একইভাবে কৃষি ও শিল্পের সম্মিলিত বরাদ্দ হবে বিকল্প বাজেটে মোট বরাদ্দের ১০.২ শতাংশ, যা চলমান বাজেটে ৬.৪ শতাংশ (দেখুন, সারণি ৬ ও ৮)। এসবই যথামাত্রা নির্দেশ করে যে চলমান বাজেটের তুলনায় বিকল্প বাজেটের বরাদ্দকাঠামো অনেক বেশি মাত্রায় আর্থসামাজিক বৈষম্য হ্রাসকারী এবং প্রকৃত মানব উন্নয়নমুখী।

বাজেট শুধু কিছু অর্থেরই বরাদ্দ নয়। তা গুণগত পরিবর্তন সাধন-উদ্দিষ্টও। আর সে কারণেই আমরা বৈষম্য-অসমতা বঞ্চনা-দারিদ্র্য ও উন্নয়নসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক অর্থনীতির দৃষ্টিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির যথামাত্রা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি। যেমন উৎপাদন ও সামষ্টিক অর্থনীতির বিষয়াদি, দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা, কৃষি-কৃষক-কৃষিব্যবস্থা, শিক্ষাখাত ও শিক্ষাব্যবস্থা, স্বাস্থ্যখাত, শিল্পখাত ও শিল্পায়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশুর বিকাশ, প্রতিবন্ধী মানুষের সক্ষমতা বিকাশ, প্রকৃতি-পরিবেশ-উন্নয়ন, গবেষণা ও বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা, দুর্নীতি, কালোটাকা, অর্থ পাচার, এবং বাজেট বাস্তবায়নের রাজনৈতিক অর্থনীতি। একমাত্র এসব বিশ্লেষণকে মুখ্য মনে করে আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট পাঠ করলেই সম্ভবত বড় পর্দায় বোঝা যাবে প্রকৃত উন্নয়নপ্রবণতা ও সম্ভাবনাচিত্র, বোঝা যাবে তা বৈষম্য হ্রাসকারী এবং প্রকৃতিসম্মানকারী কি না—অর্থাৎ বোঝা যাবে—বড় পর্দায় ছোট ছোট বিষয়ের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয় যোগসূত্র।

যদিও আগামী একবছরের বাজেটের বিষয় নয়, তথাপি আমাদের প্রস্তাবিত জনগণতান্ত্রিক বিকল্প বাজেট ভাবনায় কিছু ঐতিহাসিক সত্য স্মরণ করা প্রয়োজন বোধ করছি। আমরা আসলে ঋণগ্রস্ত দেশ নই: ব্রিটিশ উপনিবেশ শাসন-শোষণের আনুমানিক ২০০ বছরে ভারতবর্ষ থেকে ৪৭ ট্রিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ শোষণ করেছে—আত্মসাৎ করেছে, পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে (আজকের বাংলাদেশ) ৫০ লক্ষ কোটি টাকার সমপরিমাণ শোষণ করেছে, স্বাধীন বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের শোষণ করেছে ইউরোপ আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজার। আমরা সংশ্লিষ্ট বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক ফোরামে এসব বিষয় উত্থাপনে আগ্রহী। একই সাথে 'বৈশ্বিক সম্পদ তহবিল' গড়ে তুলতে আমরা আগ্রহী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বৈশ্বিক আর্থিক বাজার প্রবাহের ওপর টবিন ট্যাক্স ও টেরা ট্যাক্স নিয়ে আলোচনা করতে।

সারণি ৫: বাজেট ব্যয়ের (বরাদ্দে) খাতওয়ারি অগ্রাধিকারের তুলনামূলক চিত্র—সরকারি বাজেট ২০২৩-২৪ বনাম বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব ২০২৪-২৫

খাতওয়ারি বরাদ্দ: অগ্রাধিকারক্রম অনুযায়ী	সরকারের বাজেট বরাদ্দ খাত (কোটি টাকায়)	বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বরাদ্দ খাত (কোটি টাকায়)
১ম	জনপ্রশাসন (১,৬৭,৮৮০)	সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ (১,৭০,৪০৯)
২য়	শিক্ষা ও প্রযুক্তি (১০৪,১৩৭)	জনপ্রশাসন (১,৫৩,১৯৬)
৩য়	পরিবহন ও যোগাযোগ (৮৭,৬২৯)	শিক্ষা ও প্রযুক্তি (১,৪৫,৪৭৪)
৪র্থ	সুদ (৯৪,৩৭৬)	সুদ (১,৩৮,০০০)
৫ম	স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন (৪৯,৩৪২)	পরিবহন ও যোগাযোগ (১,১৩,৪৭৮)
৬ষ্ঠ	কৃষি (৪৩,৭০০)	কৃষি (১০০,৫৭২)
৭ম	প্রতিরক্ষা (৪১,৭৩২)	স্বাস্থ্য (৭৩,৮০০)
৮ম	সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ (৪০,৩৪৭)	স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন (৬২,২২৬)
৯ম	স্বাস্থ্য (৩৮,০৫২)	বিদ্যুৎ ও জ্বালানী (৪৭,২০০)
১০ম	জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা (৩২,২৬৬)	প্রতিরক্ষা (৩৭,৮৮৩)
১১তম	বিদ্যুৎ ও জ্বালানী (৩৪,৮১৯)	জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা (৩৪,৯১০)
১২তম	বিবিধ ব্যয় (৮,৯২২)	গৃহায়ণ (৩০,৬২১)
১৩তম	গৃহায়ণ (৭,৪২৮)	গবেষণা, উদ্ভাবন, বিচ্ছুরণ ও উন্নয়ন মন্ত্রণালয় (৩০,০০০)
১৪তম	বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম (৫,৫৬৮)	শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস (২১,৭৫০)
১৫তম	শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস (৫,৫৮৭)	গণপরিবহন মন্ত্রণালয় (২০,০০০)
১৬তম	গণপরিবহন মন্ত্রণালয় **(সরকারি বাজেটে অনুপস্থিত)**	বিবিধ ব্যয় (৭,৯৮৮)
১৭তম	গবেষণা, উন্নয়ন ও বিচ্ছুরণ মন্ত্রণালয় **(সরকারি বাজেটে অনুপস্থিত)**	বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম (৭,৯৮০)
মোট বাজেট (কোটি টাকায়)	**৭,৬১,৭৮৫**	**১১,৯৫,৪৮৬**

সারণি ৬: বাজেটে সম্পদ ব্যবহারের তুলনামূলক চিত্র: সরকারের চলতি অর্থবছরের (২০২৩-২৪) বাজেট ও অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট ২০২৪-২৫

সম্পদ ব্যবহারের খাতসমূহ	সরকারের চলতি অর্থবছরের বাজেট (২০২৩-২৪)		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট (২০২৪-২৫)	
	মোট (কোটি টাকায়)	মোট বাজেটের শতকরা হার	মোট (কোটি টাকায়)	মোট বাজেটের শতকরা হার
১. জনপ্রশাসন	১৬৭৮৮০	২২.০	১৫৩১৯৫.৬	১২.৮
২. স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৪৯৩৪২	৬.৫	৬২২২৬.০	৫.২
৩. প্রতিরক্ষা	৪১৭৩২	৫.৫	৩৭৮৮৩.০	৩.২
৪. জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	৩২২৬৬	৪.২	৩৪৯০৯.৬	২.৯
৫. শিক্ষা ও প্রযুক্তি	১০৪১৩৭	১৩.৭	১৪৫৪৭৪.০	১২.২
৬. স্বাস্থ্য	৩৮০৫২	৫.০	৭৩৮০০.০	৬.২
৭. সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ	৪০৩৪৭	৫.৩	১৭০৪০৮.৮	১৪.৩
৮. গৃহায়ণ	৭৪২৮	১.০	৩০৬২১.০	২.৬
৯. বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম	৫৫৬৮	০.৭	৭৯৮০.২	০.৭
১০. বিদ্যুৎ ও জ্বালানী	৩৪৮১৯	৪.৬	৪৭২০০.০	৩.৯
১১. কৃষি	৪৩৭০০	৫.৭	১০০৫৭১.৫	৮.৪
১২. শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস	৫৫৮৭	০.৭	২১৭৫০.৩	১.৮
১৩. পরিবহন ও যোগাযোগ	৮৭৬২৯	১১.৫	১১৩৪৭৮.০	৯.৫
১৪. সুদ	৯৪৩৭৬	১২.৪	১৩৮০০০.০	১১.৫
১৫. বিবিধ ব্যয়	৮৯২২	১.২	৭৯৮৮.০	০.৭
১৬. গবেষণা, উদ্ভাবন, বিচ্ছুরণ ও উন্নয়ন মন্ত্রণালয়		সরকারি বাজেটে অনুপস্থিত	৩০০০০	২.৫
১৭. গণপরিবহন মন্ত্রণালয়		সরকারি বাজেটে অনুপস্থিত	২০০০০	১.৭
মোট (শতাংশ)		১০০.০		১০০.০
মোট (কোটি টাকা)	৭৬১,৭৮৫		১,১৯৫,৪৮৬	
জিডিপির শতাংশ	১৯.১৬		২৬.৯৩	
বাজেট ঘাটতি	২৫৭৮৮৫.০০		১৭০৭১৯.০০	
বাজেট ঘাটতি (জিডিপি শতাংশ)	৬.৪৯		৩.৮৫	
জিডিপি (কোটি টাকায়)	৩৯,৭৬,৪৬৫ (২০২১-২২ সালের জিডিপি)		৪৪,৩৯,২৭৩ (২০২২-২৩ সালের জিডিপি)	

৫.৬ বিকল্প বাজেটের আয় আসবে কোথা থেকে?

আমাদের প্রস্তাবিত "উন্নত বাংলাদেশ অভিমুখী" বাজেটে সরকারের আয় বাড়বে—চলতি অর্থবছরে (২০২৩-২৪) সরকার প্রস্তাবিত ৭ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটির তুলনায় ১.৫৭ গুণ এবং দাঁড়াবে ১১ লক্ষ ৯৫ হাজার ৪৪৬ কোটি টাকা (সারণি ৭)।

৫.৬.১ আয়ের নতুন উৎস

আমরা বাজেটে সরকারের আয়ের ২৭টি নতুন উৎস প্রস্তাব করছি। বাজেটে আয় বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাবিত ২৭টি নতুন উৎস হলো নিম্নরূপ: **(১) কালোটাকা উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি, (২) অর্থ পাচার উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি, (৩) সম্পদ কর, (৪) অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর (tax on excess profit) (অনলাইন ব্যবসা-বাণিজ্যসহ), (৫) বিলাসী দ্রব্য/ পণ্যের ওপর কর (tax on luxury goods), (৬) সংসদ সদস্যসহ অন্যদের ওপর গাড়ির শুল্ক মওকুফ বাতিল-উদ্ভূত আহরণ, (৭) বিদেশি নাগরিকদের ওপর কর, (৮) সেবা থেকে প্রাপ্ত কর, (৯) বিমান পরিবহন ও ভ্রমণ কর, (১০) রয়্যালটি ও সম্পদ থেকে আয়, (১১) প্রতিরক্ষাবাবদ প্রাপ্তি, (১২) রেলপথ, (১৩) ডাক বিভাগ, (১৪) সরকারের সম্পদ বিক্রয়, (১৫) সেচবাবদ প্রাপ্তি, (১৬) তার ও টেলিফোন বোর্ড, (১৭) টেলিকম রেগুলেটরি কমিশন, (১৮) এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, (১৯) ইনস্যুরেন্স রেগুলেটরি কমিশন, (২০) সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, (২১) বিআইডাব্লিউটিএ, (২২) পৌর হোল্ডিং কর, (২৩) ডিজি হেলথ: বেসরকারি হাসপাতাল-ক্লিনিক-ডায়গনস্টিক সেন্টার অনুমতি ও নবায়ন ফি (permission and renewal fees), (২৪) ডিজি ড্রাগস: ঔষধ প্রস্তুতকারী কোং লাইসেন্স এবং নবায়ন ফিস, (২৫) বিউটিপার্লার সেবালব্ধ কর, (২৬) আবাসিক হোটেল/ গেস্ট হাউস ক্যাপাসিটি কর (capacity tax), (২৭) বিদেশি পরামর্শ ফি** (সারণি ৭, ৯)।

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দা, কভিড-১৯-এর অভিঘাত, ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের প্রভাব মোকাবিলা এবং বৈষম্যহীন শোভন বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সরকারের আয় বাড়াতে হবে। আর সম্ভাব্য কীভাবে তা বাড়তে পারে, তা নিয়ে আমরা আমাদের ধারণাগত মডেল ইতিমধ্যে উপস্থাপন করেছি। সরকারের বাজেটের আয় খাত নিরূপণে সংশ্লিষ্ট হিসেবপত্তর করার ক্ষেত্রে আমরা ওই মডেল ব্যবহার করেছি।

৫.৬.২ রাজস্ব প্রাপ্তি

মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক পেশকৃত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে মোট রাজস্ব ধরা হয়েছিল ৫ লক্ষ ৩ হাজার ৯০০ কোটি টাকা। আর আমরা আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বিকল্প বাজেটে ওই আয় ২.০৩ গুণ বৃদ্ধি করে ১০ লক্ষ ২৪ হাজার ৭৬৭ কোটি টাকা প্রস্তাব করছি।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডনিয়ন্ত্রিত করসমূহ

বাজেটে আয়ের উপখাতওয়ারি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে 'জাতীয় রাজস্ব বোর্ডনিয়ন্ত্রিত আয়করসমূহ' সরকারি প্রস্তাবনায় ছিল ৪ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা (যা ছিল মোট আয়ের ৮৫.৩৩ শতাংশ)—আমাদের প্রস্তাবনায় এই আয় ১.৯৮ গুণ বেড়ে দাঁড়াবে ৮ লক্ষ ৪৯ হাজার ৫১৭ কোটি টাকায়

(যা আমাদের প্রস্তাবিত মোট আয়ের ৮২.৯০ শতাংশ)। আয়ের উপখাত **'আয়, মুনাফা ও মূলধনের ওপর কর'** থেকে চলতি অর্থবছরে (অর্থাৎ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে) সরকারের প্রস্তাবিত বাজেটে ধরা হয়েছিল ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ২৬০ কোটি টাকা (মোট আয়ের ৩০.৪১ শতাংশ)—এই খাতে **আমরা ১.৭০ গুণ বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছি**, যার ফলে এই উপখাত থেকে আয় হবে ২ লক্ষ ৬০ হাজার ৭০০ কোটি টাকা (যা প্রস্তাবিত মোট আয়ের ২৫.৪৪ শতাংশ)। বৈষম্য সৃষ্টিসহায়ক বিধায় 'মূল্য সংযোজন কর' খাতে আমরা আয় বৃদ্ধির প্রস্তাব করিনি—আমাদের প্রস্তাবনায় আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরে 'মূল্য সংযোজন কর' থেকে আয় হবে মোট ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৮০০ কোটি টাকা (যা আমাদের প্রস্তাবিত মোট আয়ের ১২.৩৩ শতাংশ)।

সারণি ৭: আয়ের বাজেট— ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট ও সরকারের চলতি অর্থবছরের (২০২৩-২৪) বাজেট

প্রধান অর্থনৈতিক কোড রেঞ্জ এবং অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০২৩-২৪: সরকারের চলতি অর্থবছরের বাজেট*		২০২৪-২৫: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট		২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে আয়ের পরিমাণ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকার প্রস্তাবিত পরিমাণের কত গুণ বেশি
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ	
	করসমূহ হইতে প্রাপ্তি					
	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহ					
১০০	আয়, মুনাফা ও মূলধনের ওপর কর	১,৫৩,২৬০	৩০.৪১	২,৬০,৭০০	২৫.৪৪	১.৭০
৩০০	মূল্য সংযোজন কর	১,৬৩,৮৩৭	৩২.৫১	১,৪০,৮০০	১৩.৭৪	০.৮৬
৪০০	আমদানি শুল্ক (প্রচলিত; বিলাসী দ্রব্য/পণ্য; সংসদ সদস্যসহ অন্যান্যদের ওপর গাড়ির শুল্ক মওকুফ বাতিল-উদ্ভূত আহরণ)	৪৬,০১৫	৯.১৩	৮৫,০০০	৮.২৯	১.৮৫
৫০০	রপ্তানি শুল্ক	৬৬	০.০১	১২৫	০.০১	১.৮৯
৬০০	আবগারী শুল্ক	৪,৫৭৯	০.৯১	৫,৫০০	০.৫৪	১.২০
৭০০	সম্পূরক শুল্ক	৬০,৭০৩	১২.০৫	৪৭,০০০	৪.৫৯	০.৭৭
	বিদেশি নাগরিকদের ওপর কর	০	০.০০	৮,৬০০	০.৮৪	-
	সেবা থেকে প্রাপ্ত কর	০	০.০০	৫,৫০০	০.৫৪	-
	সম্পদ কর (wealth tax)	০	০.০০	**২,১২,০০০**	২০.৬৯	-
	অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর (tax on excess profit) (অনলাইন ব্যবসা-বাণিজ্যসহ)	০	০.০০	৭৫,২০০	৭.৩৪	-
	বিমান পরিবহন ও ভ্রমণ কর	০	০.০০	৬,৫০০	০.৬৩	-

প্রধান অর্থনৈতিক কোড রেঞ্জ এবং অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০২৩-২৪: সরকারের চলতি অর্থবছরের বাজেট*		২০২৪-২৫: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট		২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে আয়ের পরিমাণ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকার প্রস্তাবিত পরিমাণের কত গুণ বেশি
৯০০	অন্যান্য কর	১,৫৪০	০.৩১	২,৫৯২	০.২৫	১.৬৮
	মোট জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহ	**৪,৩০,০০০**	৮৫.৩৩	**৮,৪৯,৫১৭**	৮২.৯০	১.৯৮
	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহ		০.০০		০.০০	-
১০০০	মাদক শুল্ক	৪৫৮	০.০৯	৫,০০০	০.৪৯	১০.৯২
১১০০	যানবাহন কর	৩,০০০	০.৬০	৫,০০০	০.৪৯	১.৬৭
১২০০	ভূমি রাজস্ব	২,২১০	০.৪৪	৪,০০০	০.৩৯	১.৮১
১৩০০	স্ট্যাম্প বিক্রয় (নন-জুডিশিয়াল)	**১৩,৬১৮**	২.৭০	১৭,১০০	১.৬৭	১.২৬
	সারচার্জ	৭১৪	০.১৪	৯০০	০.০৯	১.২৬
	উপ মোট জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহ	**২০,০০০**	**৩.৯৭**	**৩২,০০০**	৩.১২	১.৬০
	মোট করসমূহ হইতে প্রাপ্তি	**৪,৫০,০০০**	**৮৯.৩০**	**৮,৮১,৫১৭**	৮৬.০২	১.৯৬
	কর ব্যতীত প্রাপ্তি					-
১৫০০	লভ্যাংশ ও মুনাফা	৯,৩৪৬	১.৮৫	২০,০০০	১.৯৫	২.১৪
১৬০০	সুদ	৭,৫২১	১.৪৯	১২,৫০০	১.২২	১.৬৬
১৭০০	রয়্যালটি এবং সম্পদ হইতে আয়	-	০.০০	৮০০	০.০৮	-
১৮০০	প্রশাসনিক ফি	৫,৮৬৪	১.১৬	১১,৫০০	১.১২	১.৯৬
১৯০০	**জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ**	৯৮৫	০.২০	৩,০০০	০.২৯	৩.০৫
২০০০	সেবাবাবদ প্রাপ্তি	৮,৭০৩	১.৭৩	৬,৯০০	০.৬৭	০.৭৯
২১০০	ভাড়া ও ইজারা	৫৪৯	০.১১	১,৫০০	০.১৫	২.৭৩
২২০০	টোল	১,২৩১	০.২৪	৩,০০০	০.২৯	২.৪৪
২৩০০	অবাণিজ্যিক বিক্রয়	৪,০৪৭	০.৮০	৭,৬০০	০.৭৪	১.৮৮
২৪০০	সেচবাবদ প্রাপ্তি	-	০.০০	৫০	০.০০	-
২৫০০	প্রতিরক্ষাবাবদ প্রাপ্তি	০	০.০০	৯,৫০০	০.৯৩	-
২৬০০	কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি	১১,৬৬৪	২.৩১	১৬,০০০	১.৫৬	১.৩৭
৩১০০	রেলপথ	০	০.০০	১৪,৫০০	১.৪১	-

প্রধান অর্থনৈতিক কোড রেঞ্জ এবং অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০২৩-২৪: সরকারের চলতি অর্থবছরের বাজেট*		২০২৪-২৫: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট		২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে আয়ের পরিমাণ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকার প্রস্তাবিত পরিমাণের কত গুণ বেশি
৩২০০	ডাক বিভাগ	০	০.০০	১,৭০০	০.১৭	-
৩৬০০	সরকারের সম্পদ বিক্রয় (স্টেশনারিসহ)	০	০.০০	৩,১০০	০.৩০	-
	বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তি (অনুদান)[২]	৩,৯০০	০.৭৭	-	০.০০	০.০০
	মূলধন রাজস্ব	৯০	০.০২	২০০	০.০২	২.২২
	তার ও টেলিফোন বোর্ড	০	০.০০	-	০.০০	-
	টেলিকম রেগুলেটরি কমিশন	০	০.০০	২,০০০	০.২০	-
	এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন	০	০.০০	১,৬০০	০.১৬	-
	ইন্সুরেন্স রেগুলেটরি কমিশন	০	০.০০	৫০০	০.০৫	-
	সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন	০	০.০০	১,৬০০	০.১৬	-
	বিআইডাব্লিউটিএ	০	০.০০	১,৫০০	০.১৫	-
	পৌর হোল্ডিং কর	০	০.০০	১,০০০	০.১০	-
	ডিজি হেলথ : বেসরকারি হাসপাতাল- ক্লিনিক- ডাইগনোস্টিক সেন্টার অনুমতি ও নবায়ন ফিস্	০	০	২,০০০	০.২০	-
	ডিজি ড্রাগস: ঔষুধ প্রস্তুতকারী কো. লাইসেন্স, নবায়ন ফিস্ ও অন্যান্য	০	০	১,৫০০	০.১৫	-
	বিউটি পার্লার সেবা লব্ধ কর (service charge tax)	০	০	১,০০০	০.১০	-
	আবাসিক হোটেল/গেস্ট হাউস ক্যাপাসিটি কর (capacity tax)	০	০	১,২০০	০.১২	-
	বিদেশি পরামর্শক ফি	০	০	২,৫০০	০.২৪	-
	কালোটাকা উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি[৩]	০	০	১০,০০০	০.৯৮	-
	অর্থ পাচার উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি[৪]	০	০	৫,০০০	০.৪৯	-
	মোট কর ব্যতীত প্রাপ্তি	**৫৩,৯০০**	**১০.৭০**	**১,৪৩,২৫০**	১৩.৯৮	২.৬৬
	সর্বমোট রাজস্ব প্রাপ্তি	**৫,০৩,৯০০**	**১০০.০০**	**১০,২৪,৭৬৭**	১০০.০০	২.০৩
						-

প্রধান অর্থনৈতিক কোড রেঞ্জ এবং অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০২৩-২৪: সরকারের চলতি অর্থবছরের বাজেট*		২০২৪-২৫: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট		২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে আয়ের পরিমাণ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকার প্রস্তাবিত পরিমাণের কত গুণ বেশি
	সঞ্চয়পত্র বিক্রয় (**)	২৩,০০০		**২৫,০০০**		**১.০৯**
	ঋণ গ্রহণ (দেশীয় ব্যাংক থেকে)	১,৩২,৩৯৫		**০**		০.০০
	বৈদেশিক ঋণ নীট	১,০২,৪৯০		**০**		
	সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্ব	-		**৫০,০০০**		-
	বন্ড: বিদেশে বসবাসকারী দেশের নাগরিক, বিভিন্ন কোম্পানী ও প্রতিষ্ঠান	-		**৯৫,৭১৯**		-
	মোট ঘাটতি অর্থায়ন	**২,৫৭,৮৮৫**		**১,৭০,৭১৯**		০.৬৬
	সর্বমোট	**৭,৬১,৭৮৫**		**১১,৯৫,৪৮৬**	১০০.০০	১.৫৭

*** উৎস: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাৎসরিক বাজেট ২০২৩-২৪: বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, পৃ. ৫, ৩৯। ঢাকা: অর্থ বিভাগ। পূর্ণ অংকে হিসেব করা হয়েছে, দশমিকের পরের অংশ রাখা হয়নি। 'বিবরণ' কলামের বামে যেসব উৎসে 'প্রধান অর্থনৈতিক কোড রেঞ্জ এবং অর্থনৈতিক কোড' উল্লেখ নেই সেগুলো সরকারের আয়ের ক্ষেত্রে আমাদের 'বিকল্প বাজেট'-এ প্রস্তাব।**
**** প্রচলিত ব্যবস্থা, নারী সঞ্চয়ী এবং পেনশনভোগীদের জন্য বিবেচিত।**
***** বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির ২২ মে ২০২৪ তারিখের সভায় অনুমোদিত।**

[১] সারচার্জ এ স্বাস্থ্য উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও আইটি সারচার্জ অন্তর্ভূক্ত

[২] বৈদেশিক অনুদান যেহেতু পরিশোধযোগ্য নয়, তাই একে সরকারি রাজস্বের সাথে একই গ্রুপভুক্ত করা হয়েছে

[৩] আবুল বারকাত-এর হিসেব অনুযায়ী ১৯৭২-৭৩ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত ৪৬ বছরে বাংলাদেশে সৃষ্ট মোট কালোটাকার আনুমানিক পরিমাণ হবে ৮৮ লক্ষ ৬১ হাজার ৪৩৭ কোটি টাকা, যা ওই সময়কালের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপির; ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত, যার মোট পরিমাণ ২ কোটি ৬৬ লক্ষ ১০ হাজার ৯২১ কোটি টাকা) ৩৩.৩ শতাংশের সমপরিমাণ। ২০২১-২২ অর্থবছরে যার আনুমানিক পরিমাণ ১৩ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকা, যার ২০% (২,৬৫,০৭০ কোটি টাকা) উদ্ধার করার প্রস্তাব করা হয়েছে। উল্লেখ্য কালোটাকা উদ্ধারের প্রস্তাবিত এই অংকটি গত ৫০ বছরের পুঞ্জিভূত মোট কালোটাকার বড়জোড় ২ শতাংশের সমপরিমাণ।

[৪] আবুল বারকাত-এর হিসেব অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশে অর্থ পাচারের পরিমাণ হবে কমপক্ষে ১,১৯,২৫০ কোটি টাকা, যা একই অর্থবছরের সৃষ্ট মোট কালোটাকার (১৩ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকা) ৯ শতাংশের সমপরিমাণ। একই অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের ১৬.৩ শতাংশের সমপরিমাণ। আমাদের হিসেবে বিগত ৪৬ বছরে (১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে) দেশে মোট অর্থ পাচারের পরিমাণ হবে কমপক্ষে ৭ লক্ষ ৯৮ হাজার ৩২৭ কোটি টাকা। ১,১৯,২৫০ কোটি টাকার ৫০% (৫৯,৬২৫ কোটি টাকা) উদ্ধার করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

'জাতীয় রাজস্ব বোর্ডনিয়ন্ত্রিত কর'-এর অন্তর্ভুক্ত খাত-উপখাত বিচারে আমরা প্রচলিত ছকের বাইরে বেরিয়ে নতুন কিছু উৎস থেকে আয়ের প্রস্তাব করেছি। যেমন **বিদেশি নাগরিকদের** ওপর ৮ হাজার ৬০০ কোটি টাকার কর; **সেবা থেকে প্রাপ্ত কর** ৫ হাজার ৫০০ কোটি টাকা; বিমান পরিবহন ও ভ্রমণ কর ৬ হাজার ৫০০ কোটি টাকা– এসবই নতুন উৎস থেকে কর আহরণ প্রস্তাবনা (সারণি ৭)।

আসন্ন অর্থবছরে দীর্ঘমেয়াদে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য হ্রাস এবং কভিড-১৯সহ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দার অভিঘাত মোকাবিলার কারণে আমরা দু'টো বড় আকারের উৎস চিহ্নিত করেছি, যা "জাতীয় রাজস্ব বোর্ডনিয়ন্ত্রিত কর" থেকে আয়ের উৎস হিসেবে নতুন। এ দুটি উৎস হলো **সম্পদ কর** (wealth tax), যা থেকে ২ লক্ষ ১২ হাজার কোটি টাকা (যা হবে সরকারের মোট আয়ের ২০.৬৯ শতাংশ) এবং **অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর** (tax on excess profit), যা থেকে ৭৫ হাজার ২০০ কোটি টাকা (যা হবে সরকারের আয়ের ৭.৩৪ শতাংশ) আহরণের প্রস্তাব করেছি।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডবহির্ভূত কর

'জাতীয় রাজস্ব বোর্ডবহির্ভূত কর' খাতে আমরা সরকারের বর্তমান নির্ধারিত ২০ হাজার কোটি টাকা ১.৬০ গুণ বৃদ্ধি করে ৩২ হাজার কোটি টাকার প্রস্তাব করছি। এক্ষেত্রে **উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হচ্ছে মাদক শুল্ক** খাতে বর্তমানে **৪৫৮ কোটি টাকা** থেকে **আমাদের প্রস্তাবে ৫ হাজার কোটি টাকা** (১০.৯২ গুণ বৃদ্ধি), যানবাহন কর ৩ হাজার কোটি টাকা থেকে ৫ হাজার কোটি টাকা, ভূমি রাজস্ব খাতে ২ হাজার ২১০ কোটি টাকা থেকে ৪ হাজার কোটি টাকা (সারণি ৭)। সরকারের 'মাদকের বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতা' ও 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতা' নীতি এবং বৈষম্য হ্রাস, বৈশ্বিক মন্দা ও 'কভিড-১৯'-এর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এসব প্রস্তাবনার যৌক্তিকতা প্রশ্নাতীত।

কর ব্যতীত প্রাপ্তি

চলমান অর্থবছরে **'কর ব্যতীত প্রাপ্তি'** উপখাতে সরকারের প্রস্তাব ৫৩ হাজার ৯০০ কোটি টাকা, আর আমরা তা ২.৬৬ গুণ বৃদ্ধি করে প্রস্তাব করছি ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ২৫০ কোটি টাকা। আমাদের প্রস্তাবনা হলো: **লভ্যাংশ ও মুনাফা খাতে এখনকার** (২০২৩-২৪ অর্থবছরের) **৯ হাজার ৩৪৬ কোটি টাকা থেকে প্রায় ২.১৪ গুণ বৃদ্ধি করে ২০ হাজার কোটি টাকা; জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ** উপখাতে **৯৮৫ কোটি টাকা** থেকে ৩.০৫ গুণ বৃদ্ধি করে **৩ হাজার কোটি টাকা; কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব প্রাপ্তিতে ১১ হাজার ৬৬৪ কোটি টাকা** থেকে **বৃদ্ধি করে ১৬ হাজার কোটি টাকা**। এ ছাড়াও আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য আমাদের প্রস্তাবনায় আছে পৌর হোল্ডিং কর ১ হাজার কোটি টাকা, বেসরকারি হাসপাতাল-ক্লিনিক রেজিস্ট্রেশন ফি এবং লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ ২ হাজার কোটি টাকা, ঔষধ প্রস্তুতকারী কোম্পানির লাইসেন্স এবং নবায়ন (প্রতিবছরে) ফি বাবদ ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা, আবাসিক হোটেল ও গেস্ট হাউসের ক্যাপাসিটি কর থেকে ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা এবং বিদেশি পরামর্শক ফি বাবদ ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা।

আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট কভিড-১৯-এর কল্পনাতীত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা ও আর্থ-সামাজিক মহামন্দা থেকে উত্তোরিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বৈষম্যহীন ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার বাজেট– যে কারণে সরকারের আয় অনেক বৃদ্ধি করতেই হবে। এ জন্য রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা মোট **২৭টি নতুন উৎস নির্দেশ করেছি, যা অতীতে ছিল না** (সারণি ৭ দেখুন)।

আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আমাদের প্রস্তাবিত রাজস্ব আয়ের ২৭টি নতুন উৎসের মধ্যে মাত্র ৫টি উৎস যেমন- **(১) 'সম্পদ কর' (২ লক্ষ ১২ হাজার কোটি টাকা), (২) অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর (৭৫ হাজার ২০০ কোটি টাকা), (৩) অর্থ পাচার রোধ থেকে প্রাপ্তি (৫ হাজার কোটি টাকা), (৪)**

কালোটাকা উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি (১০ হাজার কোটি টাকা) এবং (৫) বিলাসী দ্রব্য/ পণ্যের ওপর কর (আমদানি শুল্কের আওতায়) থেকে প্রাপ্তি (৮৫ হাজার কোটি টাকা)—থেকেই সরকার মোট ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার ২০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আয় করতে পারেন (সারণি ৭ থেকে হিসাবকৃত)। এই নতুন ৫ উৎস থেকে আহরণসম্ভাব্য মোট আয় হবে আমাদের প্রস্তাবিত মোট বাজেটের ৩২.৪ শতাংশের সমপরিমাণ।

প্রস্তাবিত এই ৫ উৎসের সম্ভাব্য প্রাপ্তি ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার ২০০ কোটি টাকা দিয়ে সরকার যা যা করতে পারবেন, তা হলো (১) বিধিবদ্ধ রেশনিং চালু করা—বরাদ্দ ২ হাজার কোটি টাকা, (২) বাজেটে প্রস্তাবিত স্বাস্থ্যখাতের নতুন বিভাগ 'জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা বিভাগ' গঠন– ব্যয় হবে ৮ হাজার কোটি টাকা, (৩) প্রস্তাবিত 'প্রবীণ হিতৈষী বিভাগ'– ২ হাজার ২০০ কোটি টাকা, (৪) দরিদ্র-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জন্য প্রস্তাবিত গৃহায়ণ–২৩ হাজার কোটি টাকা, (৫) কভিড-১৯ এবং অর্থনৈতিক মন্দায় নিঃস্ব অণু-ব্যবসায়ী প্রায় ৪৭ লক্ষ ফেরিওয়ালা, হকার, ভ্যানে পণ্যবিক্রেতা, চা-পান বিক্রেতাদের জন্য এককালীন ১০ হাজার কোটি টাকা অনুদানসহ অণু ও ক্ষুদ্র ব্যবসা-উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিভাগের জন্য ২৮ হাজার কোটি টাকা; (৬) প্রস্তাবিত শিশুবিকাশ বিভাগ– ১৬ হাজার কোটি টাকা; (৭) প্রস্তাবিত দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়ন বিভাগ– ১২ হাজার কোটি টাকা; (৮) নারীর বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগ— ২ হাজার কোটি টাকা; (৯) কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার বিভাগ– ১৬ হাজার ২০০ কোটি টাকা; (১০) গবেষণা, উদ্ভাবন, বিচ্ছুরণ ও উন্নয়ন মন্ত্রণালয়—৩০ হাজার কোটি টাকা; (১১) গণপরিবহণ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা—২০ হাজার কোটি টাকা এবং (১২) সার্বজনীন পেনশন বিভাগ—৫০ হাজার কোটি টাকা। এখানে সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন হলো সরকার এসব জরুরি কাজ করতে ইচ্ছুক কিনা এবং আমাদের নির্দেশিত আয়ের ওইসব উৎসে হাত দেবেন কি–না?

আমরা বাজেট ঘাটতি কমানোর পক্ষে (কারণ, ধারকর্জ করে ঘি খাওয়ার কোনো অর্থ নেই)। আমাদের প্রস্তাবিত মোট বাজেট সরকার প্রস্তাবিত চলমান অর্থবছরের বাজেটের তুলনায় ১.৫৭ গুণ বড়, কিন্তু আমাদের প্রস্তাবিত বাজেট ঘাটতি মোট বাজেটের ১৪.৩ শতাংশ অথচ চলমান সরকারি বাজেটে তা ৩৪ শতাংশ (জিডিপি অনুপাতে আমাদের প্রস্তাবে বাজেটে ঘাটতি ৩.৮৫%, যা সরকারের বাজেট প্রস্তাবে ৬.৪৯%)। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমাদের প্রস্তাবিত বাজেটে ঘাটতি অর্থায়নে আমরা দুটি নতুন উৎসের কথা বলেছি, যা হলো 'বন্ড মার্কেট' এবং 'সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্ব'। প্রস্তাবিত এ দুটি নতুন উৎস থেকে পাওয়া যেতে পারে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৭১৯ কোটি টাকা, যা ৮৫.৩৬ শতাংশ ঘাটতি অর্থায়ন পূরণ করতে সক্ষম (যা মোট রাজস্ব প্রাপ্তির ১৪.২২ শতাংশের সমপরিমাণ)।

আমাদের বিকল্প বাজেট প্রস্তাব অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সরকারের মোট রাজস্ব আয় হবে ১০ লক্ষ ২৪ হাজার ৭৬৭ কোটি টাকা, যা চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সরকারপ্রদত্ত বাজেটের তুলনায় ২.০৩ গুণ বেশি। সরকারের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের তুলনায় আমাদের প্রস্তাবিত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বিকল্প বাজেটে এই বৃদ্ধি হবে প্রধানত ৩টি কারণে (সারণি ৭ দেখুন): (১) আয়ের বিভিন্ন উৎসে যৌক্তিক বৃদ্ধি; যেমন আয় ও মুনাফার ওপরে কর, আমদানি শুল্ক, মাদক শুল্ক, যানবাহন কর, ভূমি রাজস্ব, লভ্যাংশ ও মুনাফা, জরিমানা দণ্ড বাজেয়াপ্তকরণ, টোল, ভাড়া ও ইজারা, সরকারের সম্পদ বিক্রয়। বিভিন্ন উৎসে এ বৃদ্ধির পরিমাণ হবে এখনকার তুলনায় দেড় গুণ থেকে ১১ গুণ পর্যন্ত (যেমন মাদক শুল্ক); (২) কোনো কোনো উৎসের ক্ষেত্রে করের হার পরিবর্তন না করে শুধু কর

আদায়ের প্রক্রিয়া জোরদার করে যেমন আয়, মুনাফা ও মূলধনের ওপর কর এবং রপ্তানি শুল্ক; (৩) প্রস্তাবিত নতুন উৎসসমূহ থেকে রাজস্ব প্রাপ্তি (যেমন ২৭টি নতুন উৎস, যার মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো সম্পদ কর, অর্থ পাচার উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি, কালোটাকা উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি, অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর এবং বিলাসী দ্রব্য/ পণ্যের ওপর কর)।

আসন্ন বাজেটে সরকারের আয়ের উৎস নিয়ে আমাদের অপেক্ষাকৃত শক্ত প্রস্তাব হলো কালোটাকা উদ্ধার থেকে ১০ হাজার কোটি টাকা এবং অর্থ পাচার উদ্ধার থেকে ৫ হাজার কোটি টাকা আহরণ করা। এ প্রস্তাব আমরা অতীতেও করেছি, প্রস্তাবিত আহরণের পরিমাণ ছিল কম। তবে 'কভিড-১৯' বিপর্যয়ের অভিঘাতসহ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা ও ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের অনিশ্চিত অবস্থা মোকাবিলা এবং একই সাথে বৈষম্যহীন অর্থনীতি বিনির্মাণের লক্ষ্যে এ বছর আমরা আগের তুলনায় বেশি অর্থ আদায়ের প্রস্তাব করছি। কালোটাকা উদ্ধার ও অর্থ পাচার রোধ নিয়ে সরকারপ্রধান দুশ্চিন্তিত এবং বর্তমান সরকার ২০১৮-এর নির্বাচনী ইশতেহারে প্রসঙ্গটি উত্থাপনপূর্বক দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের পথনির্দেশ হিসেবেই কালোটাকা উদ্ধার ও অর্থ পাচার রোধ সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা। এ কথা প্রমাণিত-পরীক্ষিত সত্য যে দুর্নীতি, কালোটাকা ও অর্থ পাচার বৈষম্য বাড়ায়।

এখানে উল্লেখ করা সমীচীন যে, আমাদের প্রস্তাবনায় আমরা সরকারের মোট রাজস্ব প্রাপ্তির যে ১০ লক্ষ ২৪ হাজার ৭৬৭ কোটি টাকার হিসেব দিয়েছি 'আদর্শ' পরিমাণটা হতে পারে তার চেয়ে আরো অনেক বেশি। কারণ, কর ও করবহির্ভূত অনেক উৎস আছে, যেসবে রাজস্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে সাধারণভাবে যা মনে করা হয় প্রকৃত সম্ভাবনা তার চেয়ে অনেক বেশি। যেমন আয় ও মুনাফার ওপর কর। আয়কর ফাঁকি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার; উচ্চ আয়ের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আসলে নির্ধারিত আয়কর দেন না; দেশে বড়জোর ১০০-১৫০ জন ব্যক্তি বছরে ১ কোটি টাকা অথবা তার বেশি ব্যক্তিগত পর্যায়ে (কর্পোরেট নয়) কর দেন যেখানে এ সংখ্যাটি হবার কথা কমপক্ষে ৪ লক্ষ ১৮ হাজার ব্যক্তি; 'রেন্ট-সিকার'রা বিপুল পরিমাণে কর ফাঁকি দিতে হেন পথ-পদ্ধতি নেই, যা অবলম্বন করেন না। আবার কালোটাকার মালিক যারা ২০২১-২২ অর্থবছরেই মোট আনুমানিক ১৩ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকার কালোটাকা বানিয়েছেন (সারণি ২ ও ৭), তারা তো তাদের কালোটাকার ওপর কোনো করই দেন না; কারণ কালোটাকার ওপর কীভাবে কর দেবেন। কালোটাকা যদি বৈধ আয়ই না হয়ে থাকে, তাহলে আয়ের ওপর কর অর্থাৎ আয়কর কীভাবে দেবেন, কোথায় দেবেন? আবার কালোটাকা উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করলে তো সহজেই সরকারের রাজস্ব আয়ের "কর ব্যতীত প্রাপ্তি" খাত থেকে রাজস্ব আহরণ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই অনেক গুণ বৃদ্ধি পাবে। একই কথা তো প্রযোজ্য অর্থ পাচারকারীদের ক্ষেত্রেও (২০২১-২২ অর্থবছরে যার পরিমাণ ১ লক্ষ ১৯ হাজার ২৫০ কোটি টাকা)। আবার ব্যাংকের সর্বোচ্চ ঋণগ্রহীতা ২০ জন, যাদের হাতে কমপক্ষে ১ লক্ষ ৭০ হাজার ১৬০ কোটি টাকার ঋণ স্থিতি আছে তার কী হবে? শ্রেণিকৃত ও মওকুফকৃত ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮৮০ কোটি টাকার ব্যাংক ঋণ? আবার জমি-সম্পত্তি অথবা ফ্ল্যাট কিনে যে দামে রেজিস্ট্রি করা হয় এবং তা কিনতে আসলে যে মূল্য পরিশোধ করা হয় সে ফারাক-উদ্ভূত রাজস্ব কোথায়? এ থেকে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই কালোটাকার ফাঁদে পড়েন। এসবই 'ওপেন সিক্রেট'। এসবই হলো শর্ষের মধ্যে ভূত। এসব ভূত নিয়ে ভাবনা জরুরি। কারণ, 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স' সরকারের অন্যতম নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। আর বড় পর্দায় এসবই আয় বৈষম্য-সম্পদ বৈষম্য-শ্রেণি বৈষম্য দূর করার অন্যতম প্রাকৃতিক পথ।

সারণি ৮: বাজেট আয়ের রাজস্বপ্রাপ্তির উৎসসমূহের অগ্রাধিকারের তুলনামূলক চিত্র—সরকারি বাজেট (২০২৩-২৪) বনাম বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব (২০২৪-২৫)

রাজস্ব আয়ের উৎস: অগ্রাধিকারক্রম অনুযায়ী	সরকারের বাজেট (২০২৩-২৪) (কোটি টাকায়)	বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব (২০২৩-২৪ (কোটি টাকায়)
১ম	মূল্য সংযোজন কর (১,৬৩,৮৩৭)	আয়, মুনাফা ও মূলধনের ওপর কর (৫,৩৫,৭০০)
২য়	আয়, মুনাফা ও মুলধনের ওপর কর (১,৫৩,২৬০)	কালোটাকা উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি (২,৬৫,০৭০)
৩য়	সম্পূরক শুল্ক (৬০,৭০৩)	সম্পদ কর (২,১২,০০০)
৪র্থ	আমদানি শুল্ক (প্রচলিত) (৪৬,০১৫)	আমদানি শুল্ক (প্রচলিত; বিলাসী দ্রব্য/পণ্য; সংসদ সদ্যসসহ অন্যান্যদের উপর গাড়ীর শুল্ক মওকুফ বাতিল-উদ্ভূত আহরণ) (১,৫৫,০০০)
৫ম	সুদ (১৬,৬৬৯)	মূল্য সংযোজন কর (১,৪০,৮০০)
৬ষ্ঠ	স্ট্যাম্প বিক্রয় (নন-জুডিশিয়াল) (১৩,৮৭৯)	জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ (৮০,৬০০)
৭ম	প্রশাসনিক ফি (৭,৯২০)	অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর (tax on excess profit) (৭৫,২০০) (অনলাইন ব্যবসা-বাণিজ্যসহ)
৮ম	কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি (৭,১৬০)	অর্থ পাচার উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি (৫৯,৬২৫)
৯ম	সেবা বাবদ প্রাপ্তি (৬,৭৬৭)	যানবাহন কর (৫৫,০০০)
১০ম	আবগারী শুল্ক (৪,১২৭)	সম্পূরক শুল্ক (৪৭,০০০)
১১তম	বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তি (অনুদান) (৩,২৭১)	মাদক শুল্ক (৩০,২০০)
১২তম	অবাণিজ্যিক বিক্রয় (২,৩৫১)	ভূমি রাজস্ব (৩০,০০০)
১৩তম	ভূমি রাজস্ব (২,০৮৪)	লভ্যাংশ ও মুনাফা (২৮,২০০)
১৪তম	লভ্যাংশ ও মুনাফা (১,৮৮৪)	কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি (২৭,৫০০)
১৫তম	যানবাহন কর (১,২৬৪)	স্ট্যাম্প বিক্রয় (নন-জুডিশিয়াল) (১৭,১০০)
১৬তম	টোল (১,১২৭)	রেলপথ (১৪,৫০০)
১৭তম	অন্যান্য কর (১,০৮০)	সুদ (১২,৫০০)
১৮তম	সারচার্জ (৬২১)	ভাড়া ও ইজারা (১২,১০০)
১৯তম	জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ (৪৭৮)	প্রশাসনিক ফি (১১,৫০০)

সারণি ৮ চলমান...

রাজস্ব আয়ের উৎস: অগ্রাধিকারক্রম অনুযায়ী	সরকারের বাজেট (২০২৩-২৪) (কোটি টাকায়)	বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব (২০২৩-২৪ (কোটি টাকায়)
২০তম	ভাড়া ও ইজারা (৩৪৯)	টেলিকম রেগুলেটরি কমিশন (৯,৬০০)
২১তম	মূলধন রাজস্ব (২৯৫)	প্রতিরক্ষা বাবদ প্রাপ্তি (৯,৫০০)
২২তম	মাদক শুল্ক (১৫২)	টোল (৯,১০০)
২৩তম	রপ্তানি শুল্ক (৬৩)	বিদেশি নাগরিকদের ওপর কর (৮,৬০০)
২৪তম	তার ও টেলিফোন বোর্ড **(সরকারী বাজেটে অনুপস্থিত)**	অবাণিজ্যিক বিক্রয় (৭,৬০০)
২৫তম	টেলিকম রেগুলেটরি কমিশন **(সরকারী বাজেটে অনুপস্থিত)**	সেবা বাবদ প্রাপ্তি (৬,৯০০)
২৬তম	এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন **(সরকারী বাজেটে অনুপস্থিত)**	বিদেশি পরামর্শক ফি (৬,৭০০)
২৭তম	ইন্সুরেন্স রেগুলেটরি কমিশন **(সরকারী বাজেটে অনুপস্থিত)**	বিমান পরিবহণ ও ভ্রমণ কর (৬,৫০০)
২৮তম	সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন **(সরকারী বাজেটে অনুপস্থিত)**	এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (৫,৬০০)
২৯তম	বিআইডাব্লিউটিএ **(সরকারী বাজেটে অনুপস্থিত)**	আবগারী শুল্ক (৫,৫০০)
৩০তম	পৌর হোল্ডিং কর **(সরকারী বাজেটে অনুপস্থিত)**	সেবা থেকে প্রাপ্ত কর (৫,৫০০)
৩১তম	ডিজি হেলথ : বেসরকারি হাসপাতাল- ক্লিনিক- ডাইগনোষ্টিক সেন্টার অনুমতি ও নবায়ন ফিস্ **(সরকারী বাজেটে অনুপস্থিত)**	ডিজি হেলথ : বেসরকারি হাসপাতাল- ক্লিনিক- ডাইগনোষ্টিক সেন্টার অনুমতি ও নবায়ন ফিস্ (৪,৬০০)
৩২তম	ডিজি ড্রাগস: ঔষধ প্রস্তুতকারী কো. লাইসেন্স, নবায়ন ফিস্ ও অন্যান্য **(সরকারী বাজেটে অনুপস্থিত)**	তার ও টেলিফোন বোর্ড (৪,১০০)
৩৩তম	বিউটি পার্লার সেবা লব্ধ কর (service charge tax) **(সরকারী বাজেটে অনুপস্থিত)**	সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (৩,৬০০)
৩৪তম	আবাসিক হোটেল/গেস্ট হাউস ক্যাপাসিটি কর (capacity tax) **(সরকারী বাজেটে অনুপস্থিত)**	ডিজি ড্রাগস: ঔষধ প্রস্তুতকারী কো. লাইসেন্স, নবায়ন ফিস্ ও অন্যান্য (৩,৫০০)
৩৫তম	বিদেশি পরামর্শক ফি **(সরকারী বাজেটে অনুপস্থিত)**	সরকারের সম্পদ বিক্রয় (স্টেশনারিসহ) (৩,১০০)
৩৬তম	কালোটাকা উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি **(সরকারী বাজেটে অনুপস্থিত)**	আবাসিক হোটেল/গেস্ট হাউস ক্যাপাসিটি কর (capacity tax) (২,৯০০)

রাজস্ব আয়ের উৎস: অগ্রাধিকারক্রম অনুযায়ী	সরকারের বাজেট (২০২৩-২৪) (কোটি টাকায়)	বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব (২০২৩-২৪ (কোটি টাকায়)
৩৭তম	অর্থ পাচার উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি **(সরকারী বাজেটে অনুপস্থিত)**	বিআইডাব্লিউটিএ (২,৮০০)
৩৮তম	রেলপথ **(সরকারী বাজেটে অনুপস্থিত)**	বিউটি পার্লার সেবা লব্ধ কর (service charge tax) (২,৬৫০)
৩৯তম	ডাক বিভাগ **(সরকারী বাজেটে অনুপস্থিত)**	অন্যান্য কর (২,৫৯২)
৪০তম	সরকারের সম্পদ বিক্রয় (স্টেশনারিসহ) **(সরকারী বাজেটে অনুপস্থিত)**	পৌর হোল্ডিং কর (২,১০০)
৪১তম	প্রতিরক্ষা বাবদ প্রাপ্তি **(সরকারী বাজেটে অনুপস্থিত)**	ডাক বিভাগ (১,৭০০)
৪২তম	বিদেশি নাগরিকদের ওপর কর **(সরকারী বাজেটে অনুপস্থিত)**	মূলধন রাজস্ব (১,৫০০)
৪৩তম	সেবা থেকে প্রাপ্ত কর **(সরকারী বাজেটে অনুপস্থিত)**	ইন্সুরেন্স রেগুলেটরি কমিশন (১,৪০০)
৪৪তম	সম্পদ কর (wealth tax) **(সরকারী বাজেটে অনুপস্থিত)**	সারচার্জ (৯০০)
৪৫তম	অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর (tax on excess profit) (অনলাইন ব্যবসা-বাণিজ্যসহ) **(সরকারী বাজেটে অনুপস্থিত)**	রয়্যালটি এবং সম্পদ হইতে আয় (৮০০)
৪৬তম	বিমান পরিবহণ ও ভ্রমণ কর **(সরকারী বাজেটে অনুপস্থিত)**	রপ্তানি শুল্ক (১২৫)
৪৭তম	সেচ বাবদ প্রাপ্তি **(সরকারী বাজেটে অনুপস্থিত)**	সেচ বাবদ প্রাপ্তি (৫০)
৪৮তম	রয়্যালটি এবং সম্পদ হইতে আয় **(সরকারী বাজেটে অনুপস্থিত)**	বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তি (অনুদান) **(অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে অনুপস্থিত)**
মোট রাজস্ব প্রাপ্তি (কোটি টাকায়)	৪,৩৬,২৭১	১৯,২৯,১১২

অধ্যায় ৬

উন্নত বাংলাদেশ অভিমুখী বিকল্প বাজেট—উপসংহার

আমাদের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে আমরা মোট ১১,৯৫,৪৮৬ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ প্রস্তাব করেছি, যা সরকারের চলতি অর্থবছরের (২০২৩-২৪) বাজেটের তুলনায় ১.৫৭ গুণ বেশি (চলতি অর্থবছরে সরকারের বাজেট ৭,৬১,৭৮৫ কোটি টাকা)। আমাদের প্রস্তাবনায় বাজেটের আকারই শুধু তুলনামূলক বড় নয়, সেইসাথে কাঠামোগত বড় পরিবর্তন যেক্ষেত্রে ঘটছে তা হলো মোট বাজেটে উন্নয়ন ও পরিচালন বাজেট বরাদ্দের অনুপাত। চলতি অর্থবছরে সরকারের বাজেটে যেখানে উন্নয়ন : পরিচালন বাজেট বরাদ্দ অনুপাত ৩৬ : ৬৪, সেখানে আমাদের প্রস্তাবিত ২০২৪-২৫ বিকল্প বাজেটে উন্নয়ন : পরিচালন বাজেট বরাদ্দ অনুপাত হবে ৫০ : ৫০ (সারণি ১০)। অর্থাৎ সহজ কথায়, আমাদের প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ কাঠামো প্রচলিত বাজেটের তুলনায় অনেক বেশি উন্নয়নমুখী। কারণ, সরকারের চলতি (২০২৩-২৪) অর্থবছরের বাজেটে যেখানে মোট ১০০ টাকার বরাদ্দে উন্নয়ন ব্যয় মাত্র ৩৬ টাকা, সেখানে আমাদের প্রস্তাবনানুযায়ী সেটা হবে ৫০ টাকা। আবার যেহেতু গত বাজেটের তুলনায় আমাদের প্রস্তাবিত বাজেটে উন্নয়ন বাজেট ২.১৬ গুণ বেশি, সেহেতু উন্নয়নে মোট (নিরঙ্কুশ) বরাদ্দও আনুপাতিক হারে ততগুণই বাড়বে। অর্থাৎ আমাদের প্রস্তাবিত বাজেট হবে এককথায় নিঃর্শত উন্নয়ন-অভিমুখী। আর একই সাথে বৈষম্য হ্রাসকারী এবং বৈষম্য হ্রাসের মাধ্যমে প্রকৃতির প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে 'সুস্থ প্রবৃদ্ধি' নিশ্চিতকারী।

আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটকে শুধু উন্নয়নমুখী বলাই যথেষ্ট নয়। খাতওয়ারি বরাদ্দ কাঠামো যা তাতে বলতেই হবে যে—আমাদের প্রস্তাবিত বরাদ্দ কাঠামো বৈষম্য-দারিদ্র্য নিরসনমুখী, প্রকৃতি-পরিচর্যামুখী, উৎপাদনমুখী, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিমুখী, শিল্পায়নমুখী, কৃষির বিকাশমুখী, কর্মসংস্থান বৃদ্ধিমুখী, মানবসম্পদ ও মানবপুঁজি সৃষ্টি ও তার বিকাশ ত্বরান্বয়নমুখী এবং বিজ্ঞান-উদ্ভাবন-প্রযুক্তি বিকাশমুখী। এসব উপসংহারে উপনীত হবার কারণ অনেক, যার মধ্যে অন্যতম হলো : (১) চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সরকার প্রস্তাবিত বাজেটের তুলনায় আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরে যেখানে মোট বাজেট বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে ১.৫৭ গুণ, সেখানে একই সময়ে উন্নয়ন বাজেট বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে ২.১৬ গুণ; আর পরিচালন বাজেট ১.২৩ গুণ, (২) ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকারের প্রস্তাবিত বাজেটের তুলনায় আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে খাতওয়ারি বরাদ্দ-অগ্রাধিকার অধিকতর প্রগতিমুখী।

উল্লেখ্য, আমাদের প্রস্তাবিত বাজেট ব্যয়-বরাদ্দে 'প্রতিরক্ষা', 'জনপ্রশাসন' (মন্ত্রণালয়), ও 'অভ্যন্তরীণ সুদ'—এসব খাতের তুলনামূলক বরাদ্দ-গতি অন্যান্য খাতের চেয়ে কম। এসবও বৈষম্য হ্রাস-উদ্দিষ্ট আমাদের বিকল্প বাজেট বরাদ্দ নিরূপণের ভাবনাভিত্তি-উদ্ভূত (অর্থাৎ বৈষম্যহীন শোভন সমাজ ও অর্থনীতি বিনির্মাণে আমাদের 'বিকল্প বাজেট মডেল'-উদ্ভূত)।

বৈষম্য নিরসন-উদ্দিষ্ট একটি জনকল্যাণকামী বাজেট বিধায় ২০২৪-২৫-এর বিকল্প বাজেটে আমরা বেশকিছু নতুন সুনির্দিষ্ট ব্যয়-বরাদ্দ খাত-উপখাত (যা সরকার প্রস্তাবিত বাজেটে অনুপস্থিত) বরাদ্দসহ

প্রস্তাব করেছি যার মধ্যে অন্যতম— কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার বিভাগ প্রতিষ্ঠা; শিল্পায়ন ত্বরান্বয়ন; অনু ও ক্ষুদ্র ব্যবসা-উদ্যোক্তা উন্নয়ন (বিভাগ প্রতিষ্ঠা); প্রবীণ হিতেষী (বিভাগ প্রতিষ্ঠা); দরিদ্র বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়ন (বিভাগ প্রতিষ্ঠা); বিধিবদ্ধ রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তন (বিভাগ প্রতিষ্ঠা); সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা প্রবর্তন (বিভাগ প্রতিষ্ঠা); দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জন্য আবাসন (বিভাগ প্রতিষ্ঠা); আদারওয়াইজ অ্যাবল বা প্রতিবন্ধী মানুষ; আদিবাসী মানুষের জীবনকুশলতা (বিভাগ প্রতিষ্ঠা); হাওর-বাঁওর-বিল-চর-উপকূল অঞ্চলের উন্নয়ন (বিভাগ প্রতিষ্ঠা); দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য স্বল্পমেয়াদি সুদবিহীন ঋণ; কৃষকদের কৃষিপণ্যের ন্যায্য বাজারমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ; নারীর বিজ্ঞান শিক্ষা (বিভাগ প্রতিষ্ঠা); নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধ; নারীর ক্ষমতায়ন (বিভাগ প্রতিষ্ঠা); জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা (বিভাগ প্রতিষ্ঠা); জেনোমিক মেডিসিন; নবজাতক শিশুর থাইরয়েড স্ক্রিনিং; সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কাঠামোতে ব্যয়বহুল অসংক্রামক (নন-কমিউনিকেবল) রোগের চিকিৎসা (যেমন ক্যানসার, হার্ট, কিডনি, ডায়াবেটিস ইত্যাদি); জাতীয় অনুবাদ প্রতিষ্ঠান; বাংলা উন্নয়ন বোর্ড; পাঠাগার; গবেষণা উদ্ভাবন বিচ্ছুরণ ও উন্নয়ন মন্ত্রণালয় (প্রতিষ্ঠা); গণপরিবহন মন্ত্রণালয় (প্রতিষ্ঠা)।

আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটটি যেহেতু ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতা-দারিদ্র্য হ্রাস উদ্দিষ্ট একটি জনগণতান্ত্রিক বাজেট, সেহেতু আমাদের বাজেটে শুধু ব্যয়-বরাদ্দ খাতসমূহেই নয় এসব প্রতিফলিত হয়েছে সরকারের রাজস্ব আয় প্রাপ্তির উৎসসমূহেও। আর এ কারণেই রাজস্ব আয় সংগ্রহের যেসব উৎসে আমরা জোর দিয়েছি, তার মধ্যে অন্যতম হলো—আয়, মুনাফা ও মূলধনের ওপর কর (থেকে ২ লক্ষ ৬০ হাজার ৭০০ কোটি টাকা), সম্পদ কর (২ লক্ষ ১২ হাজার কোটি টাকা), অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর (৭৫ হাজার ২০০ কোটি টাকা), বিলাসী দ্রব্য/পণ্যের ওপর আমদানি শুল্ক (৮৫ হাজার কোটি টাকা), মাদক শুল্ক (৫ হাজার ২০০ কোটি টাকা), কালোটাকা উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি (১০ হাজার কোটি টাকা), এবং অর্থ পাচার উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি (৫ কোটি টাকা)।

আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১১ লক্ষ ৯৫ হাজার ৪৮৬ কোটি টাকা; আর রাজস্ব প্রাপ্তি ধরা হয়েছে ১০ লক্ষ ২৪ হাজার ৭৬৭ কোটি টাকা। আমাদের প্রাক্-অভিজ্ঞতা বলে যে এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ হয়তো বলবেন, ১ লক্ষ ৭০ হাজার ৭১৯ কোটি টাকার বাজেট ঘাটতি অনেক বড় ঘাটতি (অবশ্য আমাদের প্রস্তাবিত বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ চলমান বাজেটের ঘাটতির তুলনায় ৩২% কম)। আমরা সম্পূর্ণ অবগত আছি যে এ প্রশ্নটা যারা করবেন, তাদের জন্য "১ লক্ষ ৭০ হাজার ৭১৯ কোটি টাকার ঘাটতি" আসলে মূল প্রশ্ন নয়। আসলে তাদের প্রশ্নটা অন্যত্র—যে প্রশ্ন তারা সম্ভবত উত্থাপন করবেন না। করতে পারবেন না। প্রশ্নটি হলো আয়ের বাজেটে আমরা যে ১০ লক্ষ ২৪ হাজার ৭৬৭ কোটি টাকার তুলনামূলক 'বড়' রাজস্ব আহরণ করার প্রস্তাব দিয়েছি, যা আহরণে ধনী-সম্পদশালীদের ওপর কর ও করবহির্ভূত চাপ বাড়ানোর কথা বলেছি এবং কালোটাকা ও অর্থ পাচার উদ্ধারের ওপর জোর দিয়েছি—এসবই তাদের আসল প্রশ্ন। ১৭ কোটি মানুষের দেশে ধনিক শ্রেণির আনুমানিক ১০-১৫ লক্ষ মানুষ এ প্রশ্ন করবেন সেটাই স্বাভাবিক। আর তাদের মধ্যে যারা রেন্টসিকিং-লুটেরা-পরজীবী পুঁজির বড় মালিক তারা তো তাদের মালিকানাধীন পত্রপত্রিকা-টেলিভিশন-সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আমাদের জনগণতান্ত্রিক প্রকৃতির বাজেটের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করবেন—এটাও অস্বাভাবিক নয়। আবার এদের মধ্যে যারা নব্য-উদারবাদী মুক্তবাজার মতাদর্শ ফেরি করেন, তারা এ প্রশ্নের পাশাপাশি তিরস্কার করে বলবেন—এত কিছু করা রাষ্ট্রের বা সরকারের কাজ নয়; বলবেন—শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সামাজিক নিরাপত্তা এসব তো বাজারের কাজ—বাজারের ওপর এসব ছেড়ে দিলে সরকারের

'অযথা' ব্যয়ও করা লাগবে না, বাজেটও বাড়ানো লাগবে না। আপাতত এই বিষয়ে অনর্থক কোনো তর্কে অবতীর্ণ না হয়ে আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে—যদি কোনো যুক্তিসংগত কারণে ঘাটতি বাজেটে অসুবিধা থাকে (জাপানে বাজেট ঘাটতি ২৮৬ শতাংশ) সেক্ষেত্রে বাজেটে ১ পয়সাও ঘাটতি না রেখে আমাদের প্রস্তাবিত রাজস্ব আয় অর্থাৎ ১০ লক্ষ ২৪ হাজার ৭৬৭ কোটি টাকা দিয়েও মোট বাজেট প্রস্তুত করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উন্নত সমাজ বিনির্মাণে অগ্রসর হতে পারেন। তবে সংশ্লিষ্ট সবার অবগতির জন্য উন্নয়ন ইতিহাস থেকে একটা কথা বলে রাখা জরুরি যে আজকের উন্নত/ ধনী দেশের প্রায় সবাই যখন উন্নতি করছিল—১৯৩০ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত সময়কালে—তখন তাদের সবারই সরকারি ব্যয় বরাদ্দ ছিল বেশ বেশি, তখন তাদের প্রবৃদ্ধির হারও ছিল বেশি, তখন গবেষণা ও উন্নয়ন (R & D বা Research and Development) খাতে সরকারি বরাদ্দ ছিল অত্যুচ্চ, এবং তাদের সবারই বাজেট ঘাটতিও ছিল বেশি, আর উচ্চমাত্রার সরকারি ব্যয় বরাদ্দ ব্যক্তি খাতের বিকাশে বাধাও ছিল না।

সারণি ৯: অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট ২০২৪-২৫ এবং তার সাথে সরকারের চলতি অর্থবছর ২০২৩-২৪ বাজেটের তুলনা

বিবরণ	সরকারের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট	২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট
মোট-বাজেট (কোটি টাকায়)	৭,৬১,৭৮৫	১১,৯৫,৪৮৬
পরিচালন ব্যয় (কোটি টাকায়)	৪,৮৪,২০৩	৫,৯৭,১৮৩
উন্নয়ন ব্যয় (কোটি টাকায়)	২,৭৭,৫৮২	৫,৯৮,৩০৩
উন্নয়ন- পরিচালন ব্যয় বাজেট অনুপাত	৩৬:৬৪	৫০:৫১
মোট রাজস্ব আয় (প্রাপ্তি) (কোটি টাকায়)	৫,০৩,৯০০	১০,২৪,৭৬৭
মোট রাজস্ব বোর্ডনিয়ন্ত্রিত কর (কোটি টাকায়)	৪,৩০,০০০	৮,৪৯,৫১৭
মোট রাজস্ব বোর্ডবহির্ভূত কর (কর ব্যতীত প্রাপ্তিসহ) (কোটি টাকায়)	২০,০০০	৩২,০০০
রাজস্ব আয়ে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কর অনুপাত (শতাংশ)	৪৬:৫৪	৭২:২৮

সারণি ৯ চলমান...

বিবরণ	সরকারের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট	২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট
রাজস্ব আয়ের প্রধান খাতসমূহ (বরাদ্দকৃত মোট অর্থের নিরিখে)	মূল্য সংযোজন কর; আয়, মুনাফা ও মুলধনের ওপর কর ; সম্পূরক কর, আমদানি শুল্ক (প্রচলিত) (যেসব খাতে বছরে ৩০ হাজার কোটি টাকা বা বেশি)	আয়, মুনাফা ও মূলধনের ওপর কর; সম্পদ কর; মূল্য সংযোজন কর; আমদানি শুল্ক (প্রচলিত; বিলাসী দ্রব্য/পণ্য;সংসদ সদ্যসসহ অন্যান্যদের উপর গাড়ীর শুল্ক মওকুফ বাতিল-উদ্ভূত আহরণ); অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর; সম্পূরক শুল্ক;
বরাদ্দের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহ (মোট বরাদ্দের পরিমাণের নিরিখে)	(১) জনপ্রশাসন, (২) শিক্ষা ও প্রযুক্তি, (৩) পরিবহণ ও যোগাযোগ, (৪) সুদ, (৫) স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, (৬) কৃষি, (৭) প্রতিরক্ষা, (৮) সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ, (৯) স্বাস্থ্য, (১০) জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা, (১১) বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, (১২) বিবিধ ব্যয়, (১৩) গৃহায়ন, (১৪) বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম (১৫) শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস,	(১) সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ, (২) শিক্ষা ও প্রযুক্তি, (৩) কৃষি, (৪) জনপ্রশাসন, (৫) স্বাস্থ্য, (৬) পরিবহণ ও যোগাযোগ, (৭) সুদ, (৮) স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, (৯) গণপরিবহন মন্ত্রণালয়, (১০) গৃহায়ন, (১১) বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, (১২) গবেষণা, উদ্ভাবন, বিচ্ছুরণ ও উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, (১৩) শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস, (১৪) জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা, (১৫) প্রতিরক্ষা, (১৬) বিবিধ ব্যয়, (১৭) বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম
মোট ঘাটতি অর্থায়ন (কোটি টাকায়) (মোট বাজেটের শতাংশ)	২,৫৭,৮৮৫ (৩৩.৮)	১,৬৫,০০০ (১৪.৩)
রাজস্ব আয়ে নতুন খাত/উৎসের সংখ্যা	প্রযোজ্য নয়	২৭টি

সারণি ৯ চলমান...

বিবরণ	সরকারের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট	২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট
বাজেটে নতুন মন্ত্রণালয়/বিভাগ (দপ্তর, অধিদপ্তর) সংশ্লিষ্ট খাত/উপখাত সংযোজন	**সরকারি বাজেটে অনুপস্থিত**	**মন্ত্রণালয় ২টি :** (১) গণপরিবহন মন্ত্রণালয় (২) গবেষণা, উদ্ভাবন, বিচ্ছুরণ ও উন্নয়ন মন্ত্রণালয়। **বিভাগ অধিদপ্তর/দপ্তর ১৬টি: (ক) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন–**(১) প্রবীণ হিতৈষী বিভাগ; (২) দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়ন বিভাগ (গ্রাম ও শহর; ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান-অনানুষ্ঠানিক, কৃষি, শিক্ষা, সেবা; (৩) নারীর ক্ষমতায়ন বিভাগ (গ্রাম ও শহরের দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত ও নারী প্রধান খানা); (৪) আদিবাসী মানুষের জীবনকুশলতা বিভাগ; (৫) শিশু-বিকাশ বিভাগ; (৬) বিধিবদ্ধ রেশনিং বিভাগ (দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জন্য;(৭) সার্বজনীন পেনশন বিভাগ; (৮) দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্তমানুষের আবাসন বিভাগ;**(খ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন–** (৯)জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা বিভাগ;**(গ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন —** (১০) নারীর বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগ; (১১) কারিগরি শিক্ষা বিভাগ; (১২) মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ;**(ঘ) কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন–** (১৩) কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার বিভাগ; (১৫) হাওর-বাওর-বিল-চর উন্নয়ন বিভাগ;**(ঙ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন–** (১৫)অর্থনৈতিক কূটনীতি বিভাগ; **(চ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন–** (১৬) অনু ও ক্ষুদ্র ব্যবসা-উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিভাগ।
বৈদেশিক ঋণনির্ভরতা	আছে	নেই
অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা	সীমিত	উল্লেখযোগ্য (সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ)
আর্থসামাজিক বৈষম্য-অসমতা নিরসন দর্শন	প্রান্তিকভাবে উপস্থিত	মূল লক্ষ্য
আর্থ-সামাজিক মন্দা থেকে উত্তরণে বাজেট	বাহ্যিকভাবে উপস্থিত	মূল লক্ষ্য

আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট ২০২৪-২৫ বাস্তবায়ন করলেই যে ভাইরাস বিপর্যয়সহ বৈশ্বিক আর্থ-সামাজিক মন্দা, ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন ও মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ-উদ্ভূত অনিশ্চয়তা থেকে শোভন বাংলাদেশ বিনির্মিত হয়ে যাবে—এমনটা মনে করার যুক্তিসংগত কোনো কারণ নেই। কারণ, আমাদের প্রস্তাবিত 'শোভন সমাজব্যবস্থার' ধারণাত্মক তত্ত্বকাঠামো হলো প্রকৃতির বিধি-বিধানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য-অধীনস্থতাভিত্তিক তিনটি বৃহৎ-বর্গীয় ভিত্তি-উপাদানের (broad foundational elements or components) দ্বান্দ্বিক সমাহার—সামাজিক ভিত্তি-উপাদান, অর্থনৈতিক ভিত্তি-উপাদান এবং রাজনৈতিক ভিত্তি-উপাদান। যে আর্থসামাজিক ব্যবস্থা আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির অধীন রেন্ট সিকার-পরজীবী-লুটেরানিয়ন্ত্রিত, যেখানে জনগণের গণতন্ত্র অনুপস্থিত, যেখানে প্রভুহীন শাসনব্যবস্থা অনুপস্থিত (অর্থাৎ শোভন সমাজব্যবস্থার রাজনৈতিক ভিত্তি-উপাদান অনুপস্থিত), যে আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদসহ উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিমালিকানা ব্যবস্থা নিয়ামক-নির্ধারক, যেখানে এসবে জনগণের মালিকানা অনুপস্থিত (অর্থাৎ শোভন সমাজব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভিত্তি-উপাদান অনুপস্থিত), যে আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় স্বস্বার্থ-ব্যক্তিস্বার্থ-স্বার্থপরতা প্রধান, যেখানে উচ্চসংহতি বোধসম্পন্ন, জ্ঞানসমৃদ্ধ, আলোকিত মানুষ সৃষ্টির প্রক্রিয়া অনুপস্থিত—তা শোভন সমাজব্যবস্থা, শোভন জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাসহায়ক নয়। এত কিছুর পরেও তাহলে বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা কেন?

বিপজ্জনক অর্থনৈতিক মন্দা, কভিড-১৯ মহামারি-উদ্ভূত মহাবিপর্যয় আর এখন ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের অনিবার্য মারাত্মক অভিঘাত—এসব থেকে মুক্ত হয়ে প্রস্তাবিত আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ বৈষম্যহীন 'শোভন বাংলাদেশ' বিনির্মাণ-উদ্দিষ্ট আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট ২০২৪-২৫ একটি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দলিল। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংবিধানের মৌল বিধানের ভিত্তিতে প্রণীত মৌলিক রূপান্তরমুখী এই দলিল বাস্তবায়নে প্রয়োজন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও দৃঢ় অঙ্গীকার। অন্তর্নিহিত মর্মবস্তুসহ এ দলিল আপাতত গৃহীত হবে কি হবে না, বাস্তবায়িত হবে কি হবে না—এসব প্রসঙ্গ ভবিষ্যতের। আমাদের লক্ষ্য ছিল বৈশ্বিক টালমাটাল-এর বিপর্যয়কালে মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছরপূর্তি পরবর্তীকালে সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করার প্রয়াস নেওয়া। আমাদের অভীষ্ট ছিল সুসংবদ্ধ যুক্তি-তথ্য দিয়ে এ কথা বলা যে—বৈষম্যহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও আলোকিত মানুষের সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব, বিনির্মাণ সম্ভব 'শোভন সমাজব্যবস্থা', 'শোভন জীবনব্যবস্থা'—এবং সেটাই প্রাকৃতিক বিধি। আমাদের প্রস্তাবিত বৈষম্য নিরসনমুখী জনকল্যাণকামী বিকল্প বাজেট ২০২৪-২৫ সেই প্রয়াসেরই একটি বস্তুনিষ্ঠ-সত্যনিষ্ঠ দর্পণ।

আমাদের প্রস্তাবিত জনকল্যাণকামী-উন্নয়নমুখী বাজেট এ জন্য প্রয়োজন যে কাঠামোগত বিচারে একমাত্র এ প্রকৃতির বাজেটই পারে বিপজ্জনক ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতা-বহুমুখী দারিদ্র্য থেকে জনগণের উত্তরণ ঘটাতে। অন্য কোনো ধরনের বাজেট দিয়ে এই কাঙ্ক্ষিত উত্তরণ-রূপান্তর (transition and transformation) সম্ভব নয়। আমাদের প্রস্তাবিত বাজেট বাস্তবায়ন করলে আগামী ১০ বছরের মধ্যেই একদিকে বিপজ্জনক বৈষম্যপূর্ণ অবস্থা থেকে স্বল্প-বৈষম্যপূর্ণ অবস্থায় পৌঁছানো সম্ভব, অন্যদিকে একইসাথে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে দারিদ্র্য-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি অবস্থান থেকে মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণি অবস্থানে উত্তরণ-রূপান্তর সম্ভব। এটাই প্রস্তাবিত উন্নত বাংলাদেশ অভিমুখী বিকল্প বাজেটের মূল উদ্দিষ্ট-অভীষ্ট ও অন্তর্নিহিত শক্তি।

পরিশিষ্ট-১

২০২৪-২৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট প্রণয়নের ভিত্তিনীতি: মাননীয় অর্থমন্ত্রী-এর সাথে প্রাক্-বাজেট মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবনা

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত
সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(barkatabul71@gmail.com)
ও
অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(aynulku@gmail.com)

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির পক্ষে

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
ঢাকা: ১০ মার্চ ২০২৪/ ২৬ ফাল্গুন ১৪৩০

ভূমিকা

দেশের জন্য বিকল্প বাজেট (Alternative Budget) প্রণয়ন ও তা জাতির সামনে উপস্থাপন—এটি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির জন্য এখন নিয়মিত বার্ষিক কর্মকান্ড। বিকল্প বাজেট উপস্থাপনের এ সংস্কৃতি আমরা শুরু করেছি ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে এবং এ পর্যন্ত পরপর মোট ৯টি অর্থবছরে আমরা তা সুসম্পন্ন করেছি।

আমাদের উত্থাপিত বিকল্প বাজেটের ভিত্তি হলো—মহান মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি-চেতনা; আর লক্ষ্য হলো—বৈষম্যহীন-শোষণমুক্ত সমাজ-শোভন অর্থনীতি-শোভন জীবনব্যবস্থা গড়ে তোলা।

কভিড-১৯ মহামারির অভিঘাত আর সেই সাথে যুদ্ধবিগ্রহ (ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যে প্যালেস্টাইনের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের যুদ্ধ, প্রতিবেশী মিয়ানমারে গৃহযুদ্ধ) ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা—এহেন অনিশ্চিত এক দুঃসময়ে এ বছরেও আমরা ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পক্ষে 'জাতীয় বিকল্প বাজেট' উত্থাপন করব। তবে আজ মাননীয় অর্থমন্ত্রীর আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণের ভিত্তিতে আমরা বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পক্ষে "আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নের নীতিগত বিষয়সমূহ" উত্থাপন করব। কভিড-১৯ অতিমারি, যুদ্ধবিগ্রহ ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দায় অভিঘাতগ্রস্ততার নিরিখে আমরা বাজেট প্রণয়নে ভিত্তি-নীতি প্রস্তাব করতে চাই (যাকে বলা যায় proposal on fundamental principles of the upcoming budget)।

কভিড-১৯-এর অপূরণীয় ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ আর একই সাথে বৈশ্বিক অর্থনৈতিতে মন্দা—অনিশ্চিত এ অবস্থায় আমাদের সমাজ-অর্থনীতিতে এখন সঠিক প্রশ্নটি হতে পারে এমন—মুক্তিযুদ্ধের চেতনার 'শোভন সমাজ' (Decent Society) নির্মাণে দেশের বার্ষিক বাজেট কাঠামো কেমন হবে? কেমন হওয়া উচিত? আমরা মনে করি—বার্ষিক বাজেট হতে হবে এমন, যা আমাদের দেশে 'শোভন সমাজব্যবস্থা' বা 'শোভন জীবনব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে এবং একই সাথে ওই বাজেট কাঠামো দিয়েই বিচার হবে যে দেশ শোভন সমাজমুখী কি না? আমাদের বাজেটকে কাঠামোগতভাবে এমন হতে হবে, যার মৌলিক নীতিগত বিষয়াদি আগামীতে এমন একশিলা-দৃঢ়বদ্ধ হবে (monolithic অর্থে)—যা প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ আনুগত্যভিত্তিক আমাদের জীবনব্যবস্থাকে নিরন্তর শোভনকরণ প্রক্রিয়াভুক্ত করবে। একই সাথে আসন্ন বাজেটটি কাঠামোগত বিন্যাসের নিরিখে নীতিগতভাবে হতে হবে সর্বজনীন (universal অর্থে), যার সর্বজনীন অভীষ্ট হবে—সবুজ বিশ্বে জ্ঞানসমৃদ্ধ আলোকিত মানুষের বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি।

বাজেট প্রণয়নে ভিত্তি-নীতির ভিত্তিকথা

বিশ্ব এখন একই সাথে তিনটি মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন। এসব মহাবিপর্যয় থেকে আমরাও মুক্ত নই। প্রথম মহাবিপর্যয় হলো—বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দা, যা মুক্তবাজার কাঠামোতে দীর্ঘমেয়াদি ব্যবসাচক্রের অবশ্যম্ভাবী প্রতিফল। দ্বিতীয় মহাবিপর্যয় হলো—কভিড-১৯ উদ্ভূত মহামারির অভিঘাত। আর তৃতীয় মহাবির্পযয় হলো—যুদ্ধবিগ্রহ ও সংশ্লিষ্ট অভিঘাত। এ ধরনের অবস্থায় স্বাভাবিক যৌক্তিক প্রশ্ন হলো, একই সাথে সংঘটিত **অর্থনীতির কাঠামোগত বিপর্যয়—মহামন্দা, কভিড-১৯ মহামারি এবং যুদ্ধবিগ্রহজনিত মহাবিপর্যয়** থেকে মুক্ত হয়ে আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ বৈষম্যহীন 'শোভন সমাজ-অর্থনীতি-

রাষ্ট্র' বিনির্মাণে একটি ধারণাত্মক তত্ত্বকাঠামো (conceptual theoretical construct) কেমন হবে এবং সেটির ভিত্তিতে তা বিনির্মাণে জাতীয় বাজেট কেমন হওয়া উচিত? উত্থাপিত এ প্রশ্নের উত্তরে যুক্তিক্রমানুসারে অপেক্ষাকৃত বড় মাপের যেসব সংশ্লিষ্ট বিষয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেই হবে, তা হলো: (১) পুঁজিবাদী শোষণভিত্তিক কাঠামোতে অনিবার্য বৈশ্বিক মহামন্দাসহ যুদ্ধ ও কভিড-১৯ মহামারি-উদ্ভূত পরিবর্তন বিশ্লেষণসহ উত্তরণের পথনির্দেশে প্রচলিত অর্থনীতিশাস্ত্রের পারগতা/অপারগতা এবং 'নতুন একীভূত অর্থনীতিশাস্ত্রের' যৌক্তিকতা; (২) ভাইরাস মহামারি প্রকৃতি-উদ্ভূত হলেও কি তা হতে পারে না প্রকৃতিকে অতিশোষণমূলক ব্যবস্থা পুঁজিবাদী সিস্টেম-উদ্ভূত; হতে কি পারে না যে, ভাইরাস-মহামারি আসলে প্রকৃতিকে নির্বিচার অত্যাচার-উদ্ভূত, পুঁজিবাদী অন্যায্য-অন্যায় বিশ্বায়ন-উদ্ভূত? (৩) ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্যে প্যালেস্টাইনের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের যুদ্ধ এবং প্রতিবেশী মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধ—এসব যুদ্ধের বহুমাত্রিক নেতিবাচক অভিঘাত আমাদের ওপর কী ধরনের এবং কত কালব্যাপী প্রভাব ফেলবে? এসব নিয়ে আমাদের মূল কথা চার-মাত্রিক (তবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত)।

আমাদের প্রথম কথা/প্রথম মাত্রা: সব দোষ কভিড-১৯ ভাইরাসের—এটাই বলা হচ্ছে। আসলে এটা সত্য নয়। এটা আসল কথাও নয়। মূল কথা হলো এ রকম: রেন্টসিকার-পরজীবী-লুটেরা-জোম্বি কর্পোরেশন-স্বজনতুষ্টিবাদী মুক্তবাজার পুঁজিবাদ এমনই এক সিস্টেম, যেখানে দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্যচক্রের (long-term business cycle) বিধান অনুযায়ী প্রতি ৩০-৪০ বছর পরপর পুঁজিবাদী অর্থনীতি সিস্টেমে **মহামন্দা** (great depression; great slowdown; crisis) অবশ্যম্ভাবী। আর এ সূত্রানুয়ায়ী সেটা ঘটার কথা ছিল ২০১৯-২০ সালের দিকে। এবং তাই-ই ঘটেছে—বিশ্বব্যপী। কিন্তু যে ঘটনা ইতিহাসে কখনও একই সাথে ঘটেনি—তা ঘটেছে এবার। আর তা হলো একদিকে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দা, অন্যদিকে একই সময়ে বিশ্বব্যাপী কভিড-১৯ সংক্রমণজনিত মহামারি (যার শেষ কোথায় তা এখনও অজ্ঞাত; অনিশ্চয়তাহেতু যার শেষ অভিঘাতও কারো জানা নেই)। আবার ইতিহাস সাক্ষী যে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দার সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহও সম্পর্কিত—কখনও কারণ হিসেবে, কখনও বা ফল হিসেবে। যুদ্ধটা এখন ইউরোপের রাশিয়া-ইউক্রেন হয়ে ছড়িয়েছে মধ্যপ্রাচ্য ও মিয়ানমারে। এসব যুদ্ধ কতকাল চলবে তা যেমন বড় প্রশ্ন, তেমনি বড় প্রশ্ন এসব যুদ্ধ আরো বড় যুদ্ধের কারণ হতে যাচ্ছে কি-না? ইউরোপে বড় ধরনের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন সম্ভাবনাও অসম্ভব নয়। যুদ্ধবিগ্রহ বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটাতে পারে মধ্যপ্রাচ্য এবং মিয়ানমারসহ প্রতিবেশীদেশসমূহে। এসব যুদ্ধের ফলে চলমান বৈশ্বিক ক্ষমতার ভারসাম্য পরিবর্তন হতে পারে।

বিশ্বের দেশনির্বিশেষে সব দেশই এখন 'অর্থনৈতিক-সামাজিক-শিক্ষাগত-স্বাস্থ্যগত-রাজনৈতিক'—এই বহুমুখী মহাবিপর্যয়কর অবস্থায়—"মহামন্দা রোগে" (disease of great depression/horror disease) আক্রান্ত, যা পৃথিবীর ইতিহাসে এই-ই প্রথম। রুগি এখন ICU-তে (যেখানে স্থান সংকুলান হচ্ছে না—কোথাও না, কোনো দেশেই না)। সুতরাং এই রুগিকে বাঁচাতে হলে প্রথমে তাকে সুস্থ করতে হবে। অর্থাৎ দেশের কথা বললে বলতে হয়—দেশের অর্থনীতি-সমাজ-সংস্কৃতি-রাষ্ট্র-সরকার সবকিছুকেই সর্বপ্রথম প্রাক্-অসুস্থ অবস্থায় অর্থাৎ অসুস্থ হবার আগের অবস্থায় নিতে হবে। এক্ষেত্রে বাজেটপ্রণেতাদের প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হবে যে ২০২৪ সালের এই মার্চ মাসে আমরা ২০২০ সালের মার্চ মাসের অবস্থায় নেই। যথেষ্ট মাত্রায় পরিবর্তন হয়েছে—অর্থনীতিতে, সমাজে, মানুষের সাহস-হতাশায়, রাষ্ট্রে, সরকারে—সর্বত্র। অবশ্য এ স্বীকৃতিতেও যে খুব বেশি কিছু যায়-আসে, তা নয়।

তবে এটা হবে নির্মোহ **সত্য অস্বীকার করা বা তা এড়িয়ে চলা**—'denial syndrome' থেকে মুক্তি। এ স্বীকৃতিতে খুব যায়-আসে না; কারণ, কভিড-১৯ এর পূর্বাবস্থাও সুখকর ছিল না—তা ছিল রেন্টসিকার-দুর্বৃত্ত-লুটেরা-পরজীবীনিয়ন্ত্রিত মুক্তবাজার পুঁজিবাদের অর্থনীতি—যা মুক্তও নয়, দরিদ্রবান্ধবও নয়; যেখানে আয় বৈষম্য-ধনসম্পদ বৈষম্য-শিক্ষা বৈষম্য ও স্বাস্থ্য বৈষম্য ছিল ক্রমবর্ধমান। **সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের ৫২ বছর পরের বাজেট আমরা বৈষম্যহীন আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে করব, নাকি মুক্তবাজার আর কর্পোরেট-স্বার্থীয় সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রকদের বিশ্বায়নের হাতে ছেড়ে দেব—এই সিদ্ধান্তটা নিতে হবে। অন্যথায় আমরা গতানুগতিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যাব—জিডিপি বাড়লেও বাড়তে পারে (টাকার অংকে বাড়তে পারে তবে ডলারের অংকে বাড়বে না); মাথাপিছু আয় বাড়লেও বাড়তে পারে—কিন্তু নিরসন হবে না বৈষম্য-অসমতা এবং বহুমাত্রিক দারিদ্র্য; হবে না মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বা অভীষ্ট বাস্তবায়ন।**

আমাদের দ্বিতীয় কথা/দ্বিতীয় মাত্রা: আমাদের দ্বিতীয় কথা এ দেশে বৈষম্যসহ ধনী-দরিদ্রের প্রবণতা নিয়ে—বিত্তের গতিপ্রকৃতির পরিবর্তন নিয়ে। আর একই সাথে এই প্রবণতায় করোনাকালীন এবং পরবর্তী মন্দাকালীন-যুদ্ধকালীন অভিঘাত এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ নিয়ে। সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এ রকম:

(১) দেশের অধিকাংশ মানুষই বহুমাত্রিক দরিদ্র। আর ধনী (অথবা সুপার ধনী) হলেন জনসংখ্যার সর্বোচ্চ ১ শতাংশ (হতে পারে ১ শতাংশেরও ভগ্নাংশ)। এ কথা অনস্বীকার্য এবং গবেষণায় প্রমাণিত যে, করোনার লকডাউনের প্রভাবে 'নিরঙ্কুশ দরিদ্র' (absolute poor) মানুষ 'হতদরিদ্র-চরম দরিদ্র' (ultra poor) হয়েছেন; আর নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের ব্যাপকাংশ দরিদ্র হয়েছেন এবং মধ্য-মধ্যবিত্তদের একাংশ বিত্তের মানদন্ডে নিম্নগামী হয়েছেন। ফলে এখন একদিকে দরিদ্র মানুষের মোট সংখ্যা করোনার সময়ের আগের তুলনায় কমপক্ষে দ্বিগুণ বেড়েছে, আর অন্যদিকে সৃষ্টি হয়েছে নতুন এক দরিদ্রগোষ্ঠী, যারা আগে দরিদ্র ছিলেন না—যাদের নাম 'নবদরিদ্র' (New Poor)। ব্যাপক জনগোষ্ঠীর বিত্তের এই অধোগতি—আগে কখনও হয়নি—এ এক নতুন প্রবণতা। দারিদ্র্যের আরো একটা বিষয় এর আগে কখনও ঘটেনি—আর তা হলো দরিদ্র, নিম্নবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের ব্যাপক হারে বাধ্য হয়ে শহর থেকে গ্রামমুখী হওয়া (urban to rural forced migration)। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, এসব মানুষের অনেকে গ্রামেই স্থায়ীভাবে থেকে যেতে বাধ্য হবেন।

(২) আর অন্যদিকে লকডাউনের কারণেই Off-line-এর ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকারখানা ও সেবাখাতে অধোগতি হয়েছে—হয়েছে তা নিম্নগামী। আর ফুলেফেঁপে উঠেছে On-line ব্যবসা-বাণিজ্য (এটা বিশ্বব্যাপী ঘটনা—তা না-হলে আমাজনের বোজোস কী করে মাত্র ১ দিনে তার সম্পদে ১২ বিলিয়ন ডলার নবসংযোজন করতে পারলেন?)। On-line-এর রেন্টসিকার-দুর্বৃত্ত-লুটেরা-পরজীবীরা মুক্তবাজারে মুক্তবিহঙ্গ হয়ে তাদের আয়-সম্পদ-সম্পত্তি বিপুল বাড়িয়েছে। এসবের ফলে সম্পদ বৈষম্য (wealth inequality), আয় বৈষম্য (income inequality), স্বাস্থ্য বৈষম্য (health inequality), শিক্ষা বৈষম্য (education inequality), আবাসন বৈষম্যসহ (housing inequality)—বৈষম্যের সব ধরনই বেড়েছে। আমাদের

হিসাবে আমাদের দেশে আয় বৈষম্যের মাপকাঠি **গিনি সহগ**-এর মান লকডাউনের আগে ছিল ০.৪৮২, যা লকডাউনের পরে মাত্র ৬৬ দিনের মধ্যেই (৩১ মে ২০২০ নাগাদ) বেড়ে দাঁড়িয়েছে ০.৬৩৫-এ; আর **পালমা অনুপাত** (যা দেখায় একটি দেশের সর্বোচ্চ আয়ের মালিক ১০ শতাংশ মানুষের মোট আয় সর্বনিম্ন আয়ের মালিক ৪০ শতাংশ মানুষের মোট আয়ের কতগুণ বেশি)—একই সময়ে ২.৯২ থেকে বেড়ে হয়েছে ৭.৫৩ (যা বিপৎসীমার দ্বিগুণেরও বেশি)। সুতরাং কভিড-১৯ বাংলাদেশকে উচ্চ আয় বৈষম্যের দেশ এবং 'বিপজ্জনক আয় বৈষম্যের' দেশ-এ রূপান্তরিত করে ছেড়েছে। আর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা ও যুদ্ধবিগ্রহ ক্রমবর্ধমান বৈষম্য বৃদ্ধিতে প্রভাবকের কাজ করছে। **এমতাবস্থায় বাজেটপ্রণেতাদের উদ্দেশ্যে সুস্পষ্ট প্রস্তাব হলো—সম্পদ-আয়-স্বাস্থ্য-শিক্ষা-আবাসন বৈষম্য হ্রাসের যত পথ-পদ্ধতি আছে, তার সবই যত দ্রুত সম্ভব প্রয়োগের চেষ্টা করা**। আমরা এসব কথা বলছি এ জন্য যে, আর্থিকীকরণকৃত-রেন্টসিকিং-পরজীবী-লুটেরা পুঁজির নিরঙ্কুশ আধিপত্যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দ্রুততর করলেও করতে পারে, তবে তা কখনো স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৈষম্য কমায় না, আর ক্রমবর্ধমান বৈষম্য সমাজকে করে অস্থির এবং তা টেকসই হয় না। সুতরাং বৈষম্য নিরসনে সম্পদের বণ্টন-পুনর্বণ্টনউদ্দিষ্ট সচেতন হস্তক্ষেপ প্রয়োজন—বাজেট হতে পারে এর অন্যতম মাধ্যম।

আমাদের তৃতীয় কথা/তৃতীয় মাত্রা: মানুষের ক্ষুধার দারিদ্র্যসহ বহুমাত্রিক দারিদ্র্য বেড়েছে। আরো বাড়ছে-বাড়বে। সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা—মানুষের কর্মসংস্থানের। দেশে মোট শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা ৬ কোটি ৮২ লক্ষ ৬ হাজার, যাদের ৮৫ শতাংশ অর্থাৎ ৫ কোটি শ্রমজীবী মানুষ অনানুষ্ঠানিক খাতে (informal sector) কর্মরত—যার মধ্যে আছে বিভিন্ন ধরনের অণু ও ক্ষুদ্র ব্যবসা ও শিল্প-কুটির শিল্প; কৃষি খাত-শস্য ও শাকসবজি-প্রাণিসম্পদ-মৎস্যসম্পদ-জলজসম্পদ। বাস্তবতা হলো, কভিড-১৯ উদ্ভূত লকডাউনে এসব মানুষের অধিকাংশই হয় কর্মহীন অথবা স্বল্প মজুরিতে স্বল্প সময়ের জন্য সাময়িককালীন কর্মজীবী। কারণ, কর্মবাজার সংকুচিত হয়েছে। অনিশ্চয়তাহেতু (uncertainty) সম্ভবত সামনে আরো হবে—যদি সময়মতো সঠিক পদক্ষেপ না নেওয়া হয়। পরিবার-পরিজনসহ এসব মানুষের পক্ষে জীবন পরিচালন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এসব মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য পরিভোগ, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যাবস্থায় অধোগতি হয়েছে। এসব মানুষের হাতে টাকা-পয়সা নেই; অনেকেই যা-কিছু ছিল তাও বেচে দিতে বাধ্য হয়েছেন ("দুর্দশাগ্রস্ততার কারণে বিক্রি"-distress sale)—এরা এখন নিঃস্ব, সর্বস্বহারা, হতাশাগ্রস্ত, ভাগ্যনির্ভর। এসবের সাথে এখন যোগ হয়েছে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি। ফলে সাধারণ মানুষের জীবন এখন অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি অনিশ্চিত। এসব মানুষের জন্য সরকারি উদ্যোগে **ব্যাপক ও শোভন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই। এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে যথেষ্ট ভালো ফল পাওয়া গিয়েছিল ১৯২৯-৩৩ এর মহামন্দার সময়ে নিউ ডিল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এসবের একটা অর্থ হলো, বাজেট হতে হবে সম্প্রসারণশীল—সংকোচনমূলক নয়**।

আমাদের চতুর্থ কথা/চতুর্থ মাত্রা: অর্থনীতিবিদদের প্রায় সবাই বলে থাকেন, জিনিসপত্তরের দাম বাড়া বা **মূল্যস্ফীতি** (inflation) হলো গরিবের শত্রু। এ কথা মিথ্যা নয়। কারণ উচ্চ মূল্যস্ফীতি গরিব

মানুষকে গরিবতর করছে; আর মধ্যবিত্ত মানুষের অধোগতি দৃশ্যমান বাস্তবতা—এসব নিয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। এসবই মানুষের জীবন-জীবিকায় অনিশ্চয়তা বাড়াচ্ছে।

মূল্যস্ফীতি নিয়ে অনেক কথা হলেও যে কথা তেমন বলা হয় না, তা হলো—**মূল্যহ্রাস বা মূল্যসংকোচন** (deflation) হলো গরিবের মহাশত্রু। উল্লেখ্য, ১৯২৯-৩৩-এর মহামন্দাকালে মূল্যস্ফীতি ঘটেনি, ঘটেছিল মূল্যহ্রাস/মূল্যসংকোচন; আর ওই মহামন্দার পরপরই 'মূল্যহ্রাস/মূল্যসংকোচনের' সুযোগে নির্বাচনের মাধ্যমেই ফ্যাসিস্ট হিটলার জার্মানিতে ক্ষমতায় বসে পড়েন। এসব গূঢ় বিষয় নিয়ে দূরদর্শী বাজেটপ্রণেতারা ভাববেন—এ প্রত্যাশা অমূলক হবে না।

আসন্ন বাজেটের ভিত্তি-নীতির ভিত্তিকথা নিয়ে যে চারটি বাস্তব বিষয়-প্রবণতা উল্লেখ করলাম, তা থেকে আমরা বিশ্বাস করতে চাই যে—মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আলোকিত মানুষের বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে এবং দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে বাঁচাবার লক্ষ্যে **বাজেটপ্রণেতারা এবারের বাজেটে নিদেনপক্ষে দু'টো বড় মাপের বিষয় নিয়ে ভাববেন:**

<u>প্রথম যা ভাবা প্রয়োজন</u>: আয়-ধন-সম্পদের বণ্টন হতে হবে ন্যায্য—তা ধনীদের কাছ থেকে প্রবাহিত হতে হবে দরিদ্র, বিত্তহীন, নিম্নবিত্ত মানুষের হাতে। এ লক্ষ্যে বাজেট যা পারে, তা হলো:

(১) ধনী-বিত্তশালীদের ওপর সম্পদ কর (wealth tax) আরোপ করা,

(২) সুপার-ডুপার ধনীদের ওপর কর হার বাড়ানো,

(৩) শেয়ারবাজার ও বন্ডবাজারে বড় বিনিয়োগের ওপর সম্পদ কর আরোপ করা (আসলে গুটিকয়েক ব্যক্তিই ৮০ শতাংশ শেয়ার-বন্ডের মালিক),

(৪) অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর আরোপ করা (tax on excess profit),

(৫) কালোটাকা উদ্ধার করা, এবং

(৬) পাচারকৃত অর্থ (money laundering) উদ্ধার করা।

এসবই আজকের আলোচ্য বিষয়—রাজস্ব বাজেটের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

কর-জিডিপি (tax-GDP) অনুপাত বাড়াতে হবে—এ কথা সবাই বলেন। যৌক্তিক বিধায় আমরাও তা মানি। তবে এক্ষেত্রে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো—কর-জিডিপি অনুপাতের বৃদ্ধিটা হতে হবে বৈষম্য হ্রাস-উদ্দিষ্ট, আর সে লক্ষ্যেই আমাদের উল্লিখিত ৬ সুস্পষ্ট নির্দেশনা।

এখানে বৈষম্য হ্রাসে কর-এর ভূমিকা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চারটি প্রমাণিত-পরীক্ষিত সত্য উল্লেখ জরুরি:

(১) **সম্পদ কর বৈষম্য কমায়,**

(২) কালোটাকা ও অর্থ পাচার বৈষম্য বাড়ায়,

(৩) সম্পদশালীদের ওপর ট্যাক্স কমালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ে না, এবং

(৪) সমাজের নিচতলার ৯০ শতাংশ মানুষের ওপর ট্যাক্স কমালে কর্মসংস্থান ও আয় বাড়ে।

আমাদের প্রায়ই শোনানো হয় যে বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন উত্তরণ-রূপান্তরকালীন অর্থনীতি (Economy in transition and transformation) এবং এ সময়ে বৈষম্য বাড়াটা স্বাভাবিক, তবে তা সাময়িক, কারণ "চুইয়ে পড়া প্রভাবের" (trickle down effect) ফলে দীর্ঘ মেয়াদে বৈষম্য কমে যাবে। যেহেতু এসব তত্ত্বকথা ভ্রান্ত এবং বাস্তবে কখনও প্রমাণ হয়নি, সেহেতু আমরা মনে করি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সব কর্মকান্ড হতে হবে বৈষম্য-অসমতা-দারিদ্র্য হ্রাস-উদ্দিষ্ট। রাজস্ব বাজেট ভাবনায় এসব অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন।

দ্বিতীয় যা ভাবা প্রয়োজন: সরকারিভাবেই শোভন মজুরির ব্যাপক কর্মসংস্থান-সুযোগ সৃষ্টি করা। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে অতিরিক্ত টাকা ছাপালেও কোনো অসুবিধা হবে না (তবে 'ভারসাম্য' বিষয়টি নজরে রাখতে হবে, যেন অপ্রয়োজনে টাকা ছাপানো না-হয়)। অবশ্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আর বিশ্বব্যাংকের নব্য-উদারবাদী অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতি-মতাদর্শে বিশ্বাস করলে এসব করা সম্ভব হবে না। কিন্তু ১৯২৯-৩৩ এর মহামন্দা থেকে উত্তরণে সরকারি উদ্যোগে 'New Deal' নীতির আওতায় ব্যাপক কর্মসংস্থান-এর যেমন কোনো বিকল্প ছিল না—এখনও তেমনি দ্বিতীয় কোনো বিকল্প নেই (এখনকারটা হতে পারে 'Green New Deal'; প্রকৃতির প্রতি সম্মান ও আনুগত্যভিত্তিক 'নিউ ডিল')।

কভিড-১৯-এর মহামারি, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, যুদ্ধবিগ্রহ—এসবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র বিশ্ব মহাবিপর্যস্ত। মানব ইতিহাসে এর আগে কখনও একই সাথে অর্থনৈতিক মহামন্দা, যুদ্ধ ও মহামারি ঘটেনি। বাংলাদেশে আমরাও এসব মহাবিপর্যয়ের নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্ত নই।

আমরা ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ, ২০২১ সালে '১৯৭১'-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণজয়ন্তী এবং ২০২৪ সালে মহান ভাষা আন্দোলনের ৭২ বছরপূর্তি উদ্‌যাপন করলাম। সমসাময়িক সময়েই কভিড-১৯ মহামারির লকডাউন, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দা, যুদ্ধবিগ্রহ—এসব কারণে আমাদের সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র—সবকিছুই বিপর্যস্ত। এহেন দুঃসময়-মহাবিপর্যয়ে নির্মোহ বিশ্লেষণভিত্তিক জন-আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি বাজেট দেশের আপামর মানুষ গ্রহণ করবেন—এ আশা অমূলক হবে না। বহুমাত্রিক বিপর্যয়ের সামগ্রিক ও গভীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণভিত্তিক বাজেটের প্রধান লক্ষ্য হতে হবে—আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ বৈষম্যহীন 'শোভন বাংলাদেশ' বিনির্মাণ—যা ছিল '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা। এ বিশ্বাসও অমূলক হবে না যে, করোনা-বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা-যুদ্ধ—বহুমাত্রিক এসব বিপর্যয় মানুষের (আমাদের) অন্তর্নিহিত শক্তিকে দুর্বল করবে না, উল্টো এ বিপর্যয় কাঙ্ক্ষিত মানবিক উন্নয়ন-প্রগতির গতি বাড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি করবে। আমাদের লক্ষ্য হতে হবে—সেই সুযোগ উদ্‌ঘাটন-অনুসন্ধান করা এবং তা দেশের মানুষের জন্য কাজে লাগানো। আমরা জানি, এসব এক বাজেটের কাজ নয়।

বাজেটসহ আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে ধার করা নয়; অথবা (আমাদের ওপর) বহিঃশক্তির চাপিয়ে দেয়া নয়—"প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ সম্মান ও আস্থাভিত্তিক বৈষম্য হ্রাস-উদ্দিষ্ট উন্নয়নদর্শন"ই সঠিক পথ বলে আমরা বিবেচনা করি। কারণ, তাই-ই ছিল ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-ভিত্তি। আমরা বিশ্বাস করি—মুক্তিযুদ্ধের শুভ চেতনায় সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব—যৌক্তিক, নৈতিক, মানবিক—সব বিচারেই তা সম্ভব। সম্ভব এ দেশের দ্রুত কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন; সম্ভব উন্নত বাংলাদেশ গড়া; সম্ভব বৈষম্যহীন সমাজ গড়া; সম্ভব অসাম্প্রদায়িক মানবসমাজ সৃষ্টি। আমরা এটিও বিশ্বাস করি—করোনা-১৯ এর মহামারি, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, যুদ্ধবিগ্রহ—এসব বহুমাত্রিক

বিপর্যয় সেই সুযোগ সৃষ্টি করেছে, যা 'শোভন সমাজব্যবস্থা' বিনির্মাণের শ্রেষ্ঠ সময়। এই সুযোগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সমগ্র দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার শ্রেষ্ঠ সুযোগ।

এতক্ষণ নীতি-দর্শনগত যে মৌলকথন হলো, সেসবের ভিত্তিতে আসন্ন বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগতভাবে যেসব বিষয় বা 'অনুসিদ্ধান্তের' ওপর জোর দেয়ার এবং অগ্রাধিকার প্রদানের কথা ভাবা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি, তা হলো নিম্নরূপ:

(১) ***সাংবিধানিক ভিত্তি:*** বাজেট প্রণয়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন—সংবিধানের বিধানসমূহকে ভিত্তি হিসেবে ধরে নিতে হবে। সংবিধানের সাথে সাযুজ্যহীন অথবা অসঙ্গতিপূর্ণ অথবা বিরোধাত্মক—এ ধরনের সবকিছু বাজেট প্রণয়নে বর্জন করতেই হবে। 'সচেতনবর্জিত' বিষয়াদি হতে হবে সংবিধানের ৭ (১) ও ৭ (২) অনুচ্ছেদে "সংবিধানের প্রাধান্য"র সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ, যা নিম্নরূপ:

"৭। (১) *প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীনে ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।*

(২) *জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।*" [গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭ (১), (২)]

(২) ***রাষ্ট্রের অধিকতর সক্রিয় ও ফলপ্রদ ভূমিকা:*** অর্থনৈতিক উন্নয়নে নয়া-উদারবাদী দর্শনের বিপরীতে রাষ্ট্রের অধিকতর সক্রিয় ও ফলপ্রদ ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ স্বীকার করে (যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ) রাষ্ট্রের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে ব্যয় বরাদ্দ নির্ণয় করা প্রয়োজন। আমরা মনে করি যে কভিড-১৯, বৈশ্বিক মন্দা ও যুদ্ধবিগ্রহের মহাবিপর্যয়কর আঘাতসহ অর্থনৈতিক-সামাজিক সংকট মোকাবিলা এবং একই সাথে প্রাকৃতিক যুক্তির বৈষম্যহীন সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র বিনির্মাণে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে বাজেট হতে হবে সম্প্রসারণমূলক।

আমরা সম্পূর্ণ অবগত যে নব্য-উদারবাদীরা মানুষের জীবন ও জীবিকার মৌল ক্ষেত্রসমূহে সরকারের নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে নেবার কথা এখন আরো জোর দিয়ে বলবেন। তাদের অনেকেই এখন বলছেন, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বেশি হওয়ার ফলেই বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ মহামন্দামুখী; বলছেন, বাজারকে তার কাজ করতে বাধা দেয়া হয়েছে বলেই মহাবিপর্যয় হচ্ছে এবং হবে; বলছেন, পুঁজিবাদ যথেষ্ট মাত্রায় নেই দেখেই যত সমস্যা; বলছেন, "সরকারই হলো সমস্যার মূলে"; বলছেন, সমাজ (society) বলে কিছু নেই; বলছেন, সরকারের এখন উচিত হবে যেখানে যত অর্থকড়ি আছে, তার সবই ব্যক্তিমালিকদের দিয়ে দেয়া—তাহলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ধনী দেশের যারা এসব প্রেসক্রিপশন দিচ্ছেন, তারা কিন্তু সম্ভাব্য সবধরনের সংরক্ষণবাদ নীতি (protectionist policy) অবলম্বন করেই ধনী হয়েছেন; তবে ধনী হওয়ার পরে "উপরে ওঠার মইটি লাথি মেরে সরিয়ে" (kicked away the ladder) মুক্তবাজারে আমাদের খেলতে বলছেন। এসবই হলো দ্বিচারিতা (hypocrisy)।

(৩) ***দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা দূরীকরণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন-সক্ষম খাত:*** বাজেট বরাদ্দে সেসব খাত-ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দেয়া জরুরি—যেসব খাত দ্রুতগতিতে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা দূরীকরণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে; যেসব খাতের বরাদ্দে দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক অভিঘাত হয় ধনাত্মক (long term social positive impact); যেসব খাতের বরাদ্দ কৃষির বিকাশ, দেশজ শিল্পায়ন, অভ্যন্তরীণ বাজার, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ মানবসম্পদের বিকাশকে ত্বরান্বিত করে; যেসব খাতের বরাদ্দ প্রকৃতি-পরিবেশ-প্রতিবেশের প্রতি সম্মানসহায়ক; যেসব খাতের বরাদ্দ মানবসত্তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠাসহায়ক।

(৪) ***কভিড-১৯, বৈশ্বিক মন্দা ও যুদ্ধবিগ্রহের অভিঘাত মোকাবিলায় উন্নয়ন-ভবিষ্যৎ নিয়ে সুনির্দিষ্ট ভাবনা:*** কভিড-১৯, বৈশ্বিক মন্দা ও যুদ্ধের সম্ভাব্য অভিঘাত নিয়ে গবেষণা-উদ্ভূত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব বাজেটে থাকতে হবে।

(৫) ***আয় ও ব্যয়ের কাঠামোগত রূপান্তর:*** সঙ্গত কারণেই বাজেটের আয় ও ব্যয় খাতে কাঠামোগত রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা জরুরি। এ বিবেচনার ভিত্তি হবে সংবিধানের ভিত্তিতে 'শোভন সমাজ-শোভন অর্থনীতি বিনির্মাণ'।

(৬) ***বৈদেশিক ঋণ নির্ভরতাবিহীন:*** কোনো ধরনের বৈদেশিক ঋণের প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই বাজেট প্রণয়ন সম্ভব। এ অনুসিদ্ধান্তের মূল কারণ দ্বিবিধ—আমরা অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক সার্বভৌমত্ব গুরুত্বপূর্ণ মনে করি এবং বৈদেশিক ঋণ নব্য-উদারবাদী মুক্তবাজার মতবাদতাড়িত, যা স্বাধীন বিকাশের প্রতিবন্ধক। তবে বিদ্যমান রেন্টসিকার-লুটেরা-দুর্বৃত্ত ডাকিনীবিদ্যক পুঁজি ও কর্পোরেশনবেষ্টিত (যাকে বলে Zombie corporation) রাজনীতি-অর্থনীতি ব্যবস্থায় রাষ্ট্র-সরকার তুলনামূলক কম বিষাক্ত (less toxic) বৈদেশিক ঋণ নিলেও নিতে পারেন (বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এটা হতে পারে প্রয়োজনীয় আপোসমূলক অবস্থান)।

(৭) ***রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে বিত্তবান-ধনীদের ওপর যুক্তিসঙ্গত চাপ প্রয়োগ:*** করোনা-উদ্ভূত বিপর্যয়কর পরিস্থিতিসহ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দা এবং যুদ্ধবিগ্রহের নেতিবাচক অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে বাজেটের জন্য সম্পদ আহরণ ও বৈষম্য হ্রাসের অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে সরকারের রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক জনগোষ্ঠী, যেমন দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত-মধ্যমধ্যবিত্তদের ওপর কোনো ধরনের চাপ প্রয়োগ আমরা সমীচীন মনে করি না। আমরা মনে করি, চাপ প্রয়োগ দরকার ধনিক শ্রেণি-সম্পদশালীদের ওপর। ধনী ও বিত্ত-সম্পদশালী ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান—যারা সম্পদ, আয় এবং মুনাফার অর্থমূল্য কম প্রদর্শনের মাধ্যমে সঠিক কর প্রদান করেন না—তারা যেন সঠিক পরিমাণ কর প্রদান করেন, তা নিশ্চিত করা জরুরি। একই সাথে প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর হার নির্ধারণ জরুরি। কর-রাজস্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমরা কয়েকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি—

ক) সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী, যেমন দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত-মধ্যমধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষেরা এখন প্রচন্ড অর্থনৈতিক সংকটে রয়েছেন। কর আহরণে নানা কৌশলে তাদের ওপর অতীতের মতো পুরোপুরি নির্ভর করা এ মুহূর্তে ঠিক হবে না।

খ) ব্যক্তি ও কর্পোরেট পর্যায়ে ব্যাপক কর-রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া হয়।

গ) বর্তমান পদ্ধতিতে 'কস্ট প্রাইস'-এর ভিত্তিতে সম্পত্তির যে কর নির্ধারণ করা হয়, তা নিতান্তই কম। প্রতি তিন বছর পরপর সম্পত্তির পুনর্মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। পুনর্মূল্যায়িত সম্পদের ওপর কর ধার্য করা উচিত। সঠিকভাবে পুনর্মূল্যায়িত সম্পত্তির ওপর সম্পদ কর হার প্রয়োগ করলে সরকারের আয় বৃদ্ধি পাবে।

ঘ) বর্তমানে আমাদের অর্থনীতিতে সংকট চলছে। এ অবস্থায় আগামী ২-৩ বছর আয়কর প্রযোজ্য হবে শুধু ধনী এবং উচ্চ-মধ্যবিত্তদের জন্য, যাদের সংখ্যা হবে ৯৬ লক্ষ খানায় ৩ কোটি ৯১ লক্ষ মানুষ (দেশের মোট জনসংখ্যার ২৩%), যাদের মধ্যে আয়কর প্রদানকারীর সম্ভাব্য সংখ্যা হবে ১ কোটি ১৫ লক্ষ মানুষ। এই ১ কোটি ১৫ লক্ষ সম্ভাব্য করদাতার মধ্যে ধনী শ্রেণিভুক্ত হবেন আনুমানিক ৫০ লক্ষ (৪৩.৫%), আর উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত হবেন ৬৫ লক্ষ (৫৬.৫%)। এদের মধ্যেই আছেন উচ্চহার করদাতা, বৃহদাঙ্ক করদাতা, ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের কর্পোরেট করদাতা। দেশে সম্ভবত ১০০ জন ব্যক্তি (অথবা তার চেয়ে কম) বছরে ১ কোটি টাকা বা তদূর্ধ্ব ব্যক্তিগত আয়কর (personal income tax) প্রদান করেন। আমাদের হিসাবে দেশে মোট **অতিধনী খানার** সদস্যসংখ্যা আনুমানিক **৮৫ লক্ষ** (খানার সদস্যসহ, গড় খানার আকার ৪.০৬ জন) আর তাদের **খানার** সংখ্যা **২০** লক্ষ ৯৪ হাজার। এসব **অতিধনী** খানার মধ্যে ২০% (প্রতি ৫টি অতিধনী খানার ১টি) খানা আছে, যেখানে কমপক্ষে ১ জন ব্যক্তি পাওয়া যাবে, যার বছরে ব্যক্তিগত আয়কর হওয়ার কথা কমপক্ষে ১ কোটি টাকা। সে হিসাবে দেশের অতিধনী শ্রেণিভুক্ত ২০ লক্ষ ৯৪ হাজার খানার মধ্যে (২০২০ সালের হিসাবে) কমপক্ষে ৪ লক্ষ ১৮ হাজার খানা পাওয়া যাবে, যে খানাতে কমপক্ষে ১ জন ব্যক্তি আছেন যার বছরে কমপক্ষে ১ কোটি টাকা আয়কর দেওয়ার কথা। এর অর্থ হচ্ছে, **দেশে অতিধনী খানা থেকেই বছরে আনুমানিক ৪ লক্ষ ১৮ হাজার কোটি (ব্যক্তিগত) টাকা আয়কর আসার কথা (এখন আসে বড়জোর ২০০ কোটি টাকা)**। এই অর্থ আহরণ প্রয়োজন এবং সম্ভব।

ঙ) অতিধনী (ধনীদের মধ্যে ধনী), ধনী (অতিধনী নয়), আর উচ্চ-মধ্যবিত্ত—এই তিন গ্রুপের জন্য আয়কর আরোপে তিন ধরনের স্লাব ব্যবহারের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

চ) এখন আয়কর রিটার্নধারী (TIN: Tax Identification Number) মানুষের মোট সংখ্যা ৪০ লক্ষ ৫৩ হাজার, যাদের মধ্যে আনুমানিক ১৮ লক্ষ মানুষ আয়কর প্রদান করেন (যাদের আবার ১০ লক্ষ সরকারি চাকরিজীবী এবং অন্যান্য বিভিন্ন চাকরিতে নিয়োজিত)। কিন্তু আমাদের হিসাবে দেশে ধনী ও উচ্চ-মধ্যবিত্তদের মধ্যে আয়কর প্রদানকারীর সংখ্যা হবে বড়জোর ৯-১০ লক্ষ; অথচ এ সংখ্যা হওয়ার কথা ৭৮ লক্ষ ৩২ হাজার। এর অর্থ ধনী **ও উচ্চ-মধ্যবিত্তদের ৮৭% কোনো ধরনের আয়কর প্রদান করেন না, যা খুবই অগ্রহণযোগ্য**। এই অবস্থা নিরসন করতে হবে।

৮) ***পরোক্ষ করের তুলনায় প্রত্যক্ষ করের অনুপাত:*** পরোক্ষ করের বোঝা মূলত দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যমধ্যবিত্তদের ওপর তাদের আয়ের তুলনায় অধিক হারে চাপ

প্রয়োগ করে; ফলে তা দারিদ্র্য-বৈষম্য হ্রাস করে না—উল্টো তা বৈষম্য বাড়ায়। সে কারণে আমরা মনে করি, পরোক্ষ করের তুলনায় প্রত্যক্ষ করের অনুপাত বেশি নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

৯) ***কোনো আয়ই আসে না, অথচ সম্ভাবনা অনেক:*** কর-রাজস্ব ও করবহির্ভূত রাজস্ব আয়ের সেসব খাত অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, যেসব খাত থেকে আয়করের কথা কখনও ভাবা হয় না (যেমন সম্পদ কর, অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর, কালোটাকা উদ্ধার, পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার ইত্যাদি) এবং যেসব খাত থেকে কোনো আয়ই আসে না অথচ সম্ভাবনা অনেক। একই সাথে সেসব খাত চিহ্নিত করা প্রয়োজন, যেসব খাত থেকে স্বল্প আয় আসে—অথচ প্রাপ্তির সম্ভাবনা অনেক, যদি একটু সাহসী ও উদ্যমী হওয়া যায় এবং কর-রাজস্ব ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা যায়।

১০) ***উন্নয়নদর্শন ও কভিড-১৯-বৈশ্বিক মন্দা—যুদ্ধবিগ্রহের অভিঘাত মোকাবিলার কারণে বাজেট বরাদ্দে অগ্রাধিকার:*** 'শোভন জীবনব্যবস্থা' নিশ্চিতকরণে যে উন্নয়নদর্শন সঠিক বলে আমরা মনে করি, সে কারণেই বাজেট বরাদ্দে আমাদের অগ্রাধিকারক্রম হওয়া উচিত হবে নিম্নরূপ: শিক্ষা ও প্রযুক্তি (সর্বোচ্চ বরাদ্দ), সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ, পরিবহন ও যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, জনপ্রশাসন, কৃষি, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা, গৃহায়ণ (জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার সমান গুরুত্ব), সুদ, প্রতিরক্ষা, বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম (সংস্কৃতি ও ধর্মকে আমরা একবন্ধনী খাত থেকে দুটি ভিন্ন খাত হিসেবে প্রস্তাব করছি), শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস, বিবিধ ব্যয় (খাদ্য হিসাবসহ)।

১১) ***দুটি নতুন মন্ত্রণালয় ও ১৬টি নতুন বিভাগ সংযোজন:*** জাতীয় স্বার্থে বাজেটের সম্পদ ব্যবহারে গত বছরের বিকল্প বাজেটে আমরা দুটি নতুন মন্ত্রণালয় ও ১৬টি নতুন বিভাগ প্রস্তাব করেছিলাম। আমাদের প্রস্তাবিত নতুন মন্ত্রণালয়দ্বয় হলো: (১) গণপরিবহন মন্ত্রণালয় (Ministry of Public Transport) এবং (২) গবেষণা, উদ্ভাবন, বিচ্ছুরণ, ও উন্নয়ন মন্ত্রণালয় (Research, Innovation, Diffusion, and Development Ministry)। আর বিদ্যমান বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রস্তাবিত ১৬টি নতুন বিভাগ (New Division/Directorate) হলো নিম্নরূপ: **সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন** (১) প্রবীণ হিতৈষী বিভাগ, (২) দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়ন বিভাগ, (৩) নারীর ক্ষমতায়ন বিভাগ (গ্রাম ও শহরের দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত ও নারীপ্রধান খানা), (৪) আদিবাসী মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়ন বিভাগ, (৫) শিশুবিকাশ বিভাগ, (৬) বিধিবদ্ধ রেশনিং বিভাগ (দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জন্য), (৭) সার্বজনীন পেনশন বিভাগ, (৮) দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের আবাসন বিভাগ; **স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন** (৯) জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা বিভাগ; **শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন** (১০) নারীর বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগ, (১১) কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, (১২) মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ; **কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন** (১৩) কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার বিভাগ, (১৪) হাওর-বাঁওর-বিল-চর উন্নয়ন বিভাগ; **পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন** (১৫) অর্থনৈতিক কূটনীতি বিভাগ; **বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন** (১৬) অণু ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিভাগ।

এ ছাড়া যদিও আমরা গত বছরের বিকল্প বাজেটে প্রস্তাব করিনি, তথাপি মনে করি দেশে অনানুষ্ঠানিক খাত মন্ত্রণালয় (Ministry of Informamal Sector) গঠন করা উচিত।

কারণ, দেশের মোট শ্রমশক্তির ৮০-৮৫ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। একইসাথে শক্তিশালী **কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার বিভাগ** গঠনের পাশাপাশি গত বছরের বিকল্প বাজেটে আমরা প্রস্তাব করেছি যে বর্তমান **ভূমি মন্ত্রণালয়ের** নাম বঙ্গবন্ধু প্রদেয় **ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়**-এ পরিবর্তন করা; পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয় বিলুপ্ত করে **আদিবাসী উন্নয়নবিষয়ক মন্ত্রণালয়** গঠন করা, যার দু'টো বিভাগ হবে পার্বত্য আদিবাসী বিভাগ এবং সমতলের আদিবাসী বিভাগ; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে কার্যকর পল্লী উন্নয়ন এবং গণমুখী-বহুমুখী সমবায় বিভাগ গড়ে তোলা (যার প্রতিটিতেই একজন করে ভিন্ন মন্ত্রী নিযুক্ত হবেন); শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন **শিল্প সুরক্ষা/সংরক্ষণ বিভাগ** (Industry Protection Division) গড়ে তোলা; বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে **বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগ** গঠন করা; পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে শক্তিশালী কার্যকর **নদী খনন বিভাগ** প্রতিষ্ঠা করা।

১২) ***মানব উন্নয়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন:*** মানব উন্নয়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়নসহ উৎপাদনশীল বিনিয়োগে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা দূরসহ সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী (কৃষকের শস্যবীমা ও ভূমি সংস্কারসংশ্লিষ্ট কার্যক্রম), কৃষি, স্বাস্থ্য, খাদ্য মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগ, গৃহায়ণ, সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ-এর বরাদ্দে আমরা যুক্তিসঙ্গত অগ্রাধিকার দেবার প্রস্তাব করছি।

১৩) ***আমদানি শুল্ক হার নির্ধারণে দেশজ শিল্পায়ন ও দেশজ কৃষি:*** আমদানি শুল্ক হার নির্ধারণে দেশজ শিল্পায়ন ও দেশজ কৃষির স্বার্থ বিবেচনায় কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ খাত-উপখাতসমূহের ক্ষেত্রে আমরা মুক্তবাজার দর্শনের বিপরীতে সংরক্ষণবাদ নীতি-দর্শন প্রয়োগের সুপারিশ করছি।

১৪) ***প্রকৃত মানবিক উন্নয়নের অন্যতম পথনির্দেশক দলিল:*** আসন্ন বাজেটে আয়-ব্যয় বিন্যাসসহ বিভিন্ন নীতি-কৌশলসংশ্লিষ্ট নিদের্শনা মেনে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির সম্ভাব্য অর্জনমাত্রা নিরূপণ করা প্রয়োজন: (ক) প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ আস্থা ও সম্মান বজায় রেখে প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয় যেন বৈষম্য হ্রাসকারী মানবিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে, (খ) সমাজের সকল দরিদ্র-প্রান্তিক পিছিয়ে পড়া মানুষের সম্ভাব্য দ্রুতগতিতে জীবনমান বৃদ্ধির নিশ্চয়তা, (গ) বণ্টন ন্যায্যতা নিশ্চিতসহ উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, (ঘ) অধিকতর কার্যকরী, বৈচিত্র্যপূর্ণ উৎপাদনশীল কৃষি, (ঙ) অধিক হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ ন্যায্য মজুরির নিশ্চয়তা, (চ) শিল্পায়ন: অণু, ক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ (আত্মকর্মসংস্থানসহ) এবং শিল্পে শ্রমিকের মালিকানাভিত্তিক অংশীদারিত্ব, (ছ) অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে শ্রমজীবী মানুষের উন্নত জীবনমান এবং শোভন কাজ, (জ) কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার, (ঝ) নারীর অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়ন, (ঞ) বাণিজ্য ও পণ্য বাজারজাতকরণে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস এবং কৃষকের পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, (ট) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বোত্তম জনকল্যাণকর ব্যবহার, (ঠ) সরকারি খাতে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ইত্যাদির মাধ্যমে জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর, (ড) প্রাথমিক ও উচ্চতর স্বাস্থ্যসেবা (জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা সেবাসহ) নিশ্চিতকরণে শক্তিশালী সরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাত, এবং (ঢ) সবধরনের সামাজিক সুরক্ষার বিস্তৃতিসহ সুসংগঠিত সামাজিক বীমা পদ্ধতি। উল্লেখ্য, সামাজিক সুরক্ষার

ভিত সুপ্রশস্ত ও যুক্তিসঙ্গত করার লক্ষ্যে আমরা অর্থনীতি সমিতির গত বিকল্প বাজেটে **"সার্বজনীন পেনশন"** ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। সরকার ইতিমধ্যে "সার্বজনীন পেনশন" চালু করেছেন—এ জন্য সরকারকে ধন্যবাদ।

কভিড-১৯-এর মহামারি, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দা এবং যুদ্ধবিগ্রহ—বহুমাত্রিক এসব মহাবিপর্যয় থেকে মুক্তি এবং একই সাথে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে উল্লিখিত পদ্ধতিগত ভিত্তি-ভাবনা প্রয়োগে আমরা মনে করি—আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট হওয়া উচিত সম্প্রসারণশীল, কোনোভাবেই সংকোচনমূলক নয়। আমাদের প্রস্তাব বৈষম্য হ্রাসকারী বৃহদাকার-সম্প্রসারণশীল বাজেট। আমরা মনে করি, বৈষম্য হ্রাস-উদ্দিষ্ট সম্প্রসারণশীল বাজেটই হতে পারে সুসংহত মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ বিনির্মাণের যুক্তিসিদ্ধ পথ। আমরা আশা করি, যুক্তি থাকলে সরকার আমাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন। কারণ, অর্থনৈতিক মহামন্দা, কভিড-১৯ মহামারি এবং যুদ্ধবিগ্রহের মিথস্ক্রিয়ায় সৃষ্ট বিপর্যয়কর অভিঘাত মোকাবিলা করে আমরা আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ বৈষম্যহীন 'শোভন সমাজব্যবস্থা' বিনির্মাণের পক্ষে।

আমাদের শেষ কথা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্য গত বছর আমরা যে বিকল্প বাজেট প্রস্তাব করেছিলাম, তার শিরোনাম ছিল **"বৈষম্য নিরসনে জনগণতান্ত্রিক বাজেট"**।[১] কারণ মর্মগতভাবে তা ছিল ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংবিধানের মৌল বিধানের ভিত্তিতে প্রণীত মৌলিক রূপান্তরমুখী অর্থনৈতিক দলিল। আমরা মনে করি, আমাদের প্রস্তাবিত বৈষম্য নিরসনে জনগণতান্ত্রিক বাজেট এ জন্য প্রয়োজন যে কাঠামোগত বিচারে একমাত্র এ প্রকৃতির বাজেটই পারে বিপজ্জনক ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতা-বহুমুখী দারিদ্র্য থেকে জনগণের উত্তরণ ঘটাতে। অন্য কোনো ধরনের বাজেট দিয়ে এই কাঙ্ক্ষিত উত্তরণ-রূপান্তর (transition and transformation) সম্ভব নয়। আমরা এও মনে করি যে—আমাদের প্রস্তাবিত বৈষম্য নিরসনে জনগণতান্ত্রিক বাজেট ধারণা বাস্তবায়ন করলে আগামী ১০ বছরের মধ্যেই একদিকে একইসাথে অতিবিপজ্জনক বৈষম্যপূর্ণ অবস্থা থেকে স্বল্প-বৈষম্যপূর্ণ অবস্থায় পৌঁছানো সম্ভব, অন্যদিকে একইসাথে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি অবস্থান থেকে মধ্যমধ্যবিত্ত শ্রেণি অবস্থানে উত্তরণ-রূপান্তর সম্ভব। এটাই হতে পারে ২০৩১ সাল নাগাদ স্বল্প বৈষম্যপূর্ণ মধ্য আয়ের বাংলাদেশে উত্তরণ-রূপান্তরের কাঙ্ক্ষিত বাজেটীয় পথ। আর এটাই বৈষম্য নিরসন-উদ্দিষ্ট জনগণতান্ত্রিক বাজেটের মূল অভীষ্ট ও অন্তর্নিহিত শক্তি।

---

* *বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক প্রস্তাবিত এই দলিল প্রণয়নে যেসব সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম: বিভিন্ন সময়ের সংশ্লিষ্ট সরকারি পরিসংখ্যান; বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট (২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত); বারকাত, আবুল (২০২০), "বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে" (ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা)।*

---

১ দেখুন, আবুল বারকাত (১০ মে ২০২৩), বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা ২০২৩-২৪: বৈষম্য নিরসনে জনগণতান্ত্রিক বাজেট। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।

পরিশিষ্ট-২

২০২৪-২৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট প্রণয়নের ভিত্তিনীতি: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান-এর সাথে প্রাক্-বাজেট আলোচনা সভায় বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবনা

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত
সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(barkatabul71@gmail.com)

ও

অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(aynulku@gmail.com)

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির পক্ষে

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

ঢাকা: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪/ ৫ ফাল্গুন ১৪৩০

ভূমিকা

দেশের জন্য বিকল্প বাজেট (Alternative Budget) প্রণয়ন ও তা জাতির সামনে উপস্থাপন—এটি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির জন্য এখন নিয়মিত বার্ষিক কর্মকাণ্ড। বিকল্প বাজেট উপস্থাপনের এ সংস্কৃতি আমরা শুরু করেছি ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে এবং এ পর্যন্ত পরপর মোট ৯টি অর্থবছরে আমরা তা সুসম্পন্ন করেছি।

আমাদের উত্থাপিত বিকল্প বাজেটের ভিত্তি হলো—মহান মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি-চেতনা; আর লক্ষ্য হলো—বৈষম্যহীন-শোষণমুক্ত সমাজ-শোভন অর্থনীতি-শোভন জীবনব্যবস্থা গড়ে তোলা।

কভিড-১৯ মহামারির অভিঘাত আর সেই সাথে যুদ্ধবিগ্রহ (ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যে প্যালেস্টাইনের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের যুদ্ধ, প্রতিবেশী মিয়ানমারে গৃহযুদ্ধ) ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা—এহেন অনিশ্চিত এক দুঃসময়ে এ বছরেও আমরা ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পক্ষে 'জাতীয় বিকল্প বাজেট' উত্থাপন করব। তবে আজ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণের ভিত্তিতে আমরা বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নের নীতিগত বিষয়সমূহ" উত্থাপন করব, যার মধ্যে বাজেটের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে থাকবে **আমন্ত্রণের মুখ্য বিষয় "জাতীয় রাজস্ব বাজেট"**। কভিড-১৯ অতিমারি, যুদ্ধবিগ্রহ ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দায় অভিঘাতগ্রস্ততার নিরিখে আমরা বাজেট প্রণয়নে ভিত্তি-নীতি প্রস্তাব করতে চাই (যাকে বলা যায় proposal on fundamental principles of the upcoming budget)।

কভিড-১৯-এর অপূরণীয় ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ আর একই সাথে বৈশ্বিক অর্থনৈতিতে মন্দা—অনিশ্চিত এ অবস্থায় আমাদের সমাজ-অর্থনীতিতে এখন সঠিক প্রশ্নটি হতে পারে এমন—মুক্তিযুদ্ধের চেতনার 'শোভন সমাজ' (Decent Society) নির্মাণে দেশের বার্ষিক বাজেট কাঠামো কেমন হবে? কেমন হওয়া উচিত? আমরা মনে করি—বার্ষিক বাজেট হতে হবে এমন, যা আমাদের দেশে 'শোভন সমাজব্যবস্থা' বা 'শোভন জীবনব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে এবং একই সাথে ওই বাজেট কাঠামো দিয়েই বিচার হবে যে দেশ শোভন সমাজমুখী কি না? আমাদের বাজেটকে কাঠামোগতভাবে এমন হতে হবে, যার মৌলিক নীতিগত বিষয়াদি আগামীতে এমন একশিলা-দৃঢ়বদ্ধ হবে (monolithic অর্থে)—যা প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ আনুগত্যভিত্তিক আমাদের জীবনব্যবস্থাকে নিরন্তর শোভনকরণ প্রক্রিয়াভুক্ত করবে। একই সাথে সামনের বাজেটটি কাঠামোগত বিন্যাসের নিরিখে নীতিগতভাবে হতে হবে সর্বজনীন (universal অর্থে), যার সর্বজনীন অভীষ্ট হবে—সবুজ বিশ্বে জ্ঞানসমৃদ্ধ আলোকিত মানুষের বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি।

বাজেট প্রণয়নে ভিত্তি-নীতির ভিত্তিকথা

বিশ্ব এখন একই সাথে তিনটি মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন। এসব মহাবিপর্যয় থেকে আমরাও মুক্ত নই। প্রথম মহাবিপর্যয় হলো—বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দা, যা মুক্তবাজার কাঠামোতে দীর্ঘমেয়াদি ব্যবসাচক্রের অবশ্যম্ভাবী প্রতিফল। দ্বিতীয় মহাবিপর্যয় হলো—কভিড-১৯ উদ্ভূত মহামারির অভিঘাত। আর তৃতীয় মহাবির্পযয় হলো—যুদ্ধবিগ্রহ ও সংশ্লিষ্ট অভিঘাত। এ ধরনের অবস্থায় স্বাভাবিক যৌক্তিক প্রশ্ন হলো,

একই সাথে সংঘটিত **অর্থনীতির কাঠামোগত বিপর্যয়—মহামন্দা, কভিড-১৯ মহামারি এবং যুদ্ধবিগ্রহজনিত মহাবিপর্যয়** থেকে মুক্ত হয়ে আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ বৈষম্যহীন 'শোভন সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র' বিনির্মাণে একটি ধারণাত্মক তত্ত্বকাঠামো (conceptual theoretical construct) কেমন হবে এবং সেটির ভিত্তিতে তা বিনির্মাণে জাতীয় বাজেট কেমন হওয়া উচিত? উত্থাপিত এ প্রশ্নের উত্তরে যুক্তিক্রমানুসারে অপেক্ষাকৃত বড় মাপের যেসব সংশ্লিষ্ট বিষয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেই হবে, তা হলো: (১) পুঁজিবাদী শোষণভিত্তিক কাঠামোতে অনিবার্য বৈশ্বিক মহামন্দাসহ যুদ্ধ ও কভিড-১৯ মহামারি-উদ্ভূত পরিবর্তন বিশ্লেষণসহ উত্তরণের পথনির্দেশে প্রচলিত অর্থনীতিশাস্ত্রের পারগতা/অপারগতা এবং 'নতুন একীভূত অর্থনীতিশাস্ত্রের' যৌক্তিকতা; (২) ভাইরাস মহামারি প্রকৃতি-উদ্ভূত হলেও কি তা হতে পারে না প্রকৃতিকে অতিশোষণমূলক ব্যবস্থা পুঁজিবাদী সিস্টেম-উদ্ভূত; হতে কি পারে না যে, ভাইরাস-মহামারি আসলে প্রকৃতিকে নির্বিচার অত্যাচার-উদ্ভূত, পুঁজিবাদী অন্যায্য-অন্যায় বিশ্বায়ন-উদ্ভূত? (৩) ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্যে প্যালেস্টাইনের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের যুদ্ধ এবং প্রতিবেশী মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধ—এসব যুদ্ধের বহুমাত্রিক নেতিবাচক অভিঘাত আমাদের ওপর কী ধরনের এবং কত কালব্যাপী প্রভাব ফেলবে? এসব নিয়ে আমাদের মূল কথা চার-মাত্রিক (তবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত)।

আমাদের প্রথম কথা/প্রথম মাত্রা: সব দোষ কভিড-১৯ ভাইরাসের—এটাই বলা হচ্ছে। আসলে এটা সত্য নয়। এটা আসল কথাও নয়। মূল কথা হলো এ রকম: রেন্টসিকার-পরজীবী-লুটেরা-জোম্বি কর্পোরেশন-স্বজনতুষ্টিবাদী মুক্তবাজার পুঁজিবাদ এমনই এক সিস্টেম, যেখানে দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্যচক্রের (long-term business cycle) বিধান অনুযায়ী প্রতি ৩০-৪০ বছর পরপর পুঁজিবাদী অর্থনীতি সিস্টেমে **মহামন্দা** (great depression; great slowdown; crisis) অবশ্যম্ভাবী। আর এ সূত্রানুয়ায়ী সেটা ঘটার কথা ছিল ২০১৯-২০ সালের দিকে। এবং তাই-ই ঘটেছে—বিশ্বব্যপী। কিন্তু যে ঘটনা ইতিহাসে কখনও একই সাথে ঘটেনি—তা ঘটেছে এবার। আর তা হলো একদিকে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দা, অন্যদিকে একই সময়ে বিশ্বব্যাপী কভিড-১৯ সংক্রমণজনিত মহামারি (যার শেষ কোথায় তা এখনও অজ্ঞাত; অনিশ্চয়তাহেতু যার শেষ অভিঘাতও কারো জানা নেই)। আবার ইতিহাস সাক্ষী যে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দার সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহও সম্পর্কিত—কখনও কারণ হিসেবে, কখনও বা ফল হিসেবে। যুদ্ধটা এখন ইউরোপের রাশিয়া-ইউক্রেন হয়ে ছড়িয়েছে মধ্যপ্রাচ্য ও মিয়ানমারে। এসব যুদ্ধ কতকাল চলবে তা যেমন বড় প্রশ্ন, তেমনি বড় প্রশ্ন এসব যুদ্ধ আরো বড় যুদ্ধের কারণ হতে যাচ্ছে কি-না? ইউরোপে বড় ধরনের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন সম্ভাবনাও অসম্ভব নয়। যুদ্ধবিগ্রহ বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটাতে পারে মধ্যপ্রাচ্য এবং মিয়ানমারসহ প্রতিবেশীদেশসমূহে। এসব যুদ্ধের ফলে চলমান বৈশ্বিক ক্ষমতার ভারসাম্য পরিবর্তন হতে পারে।

বিশ্বের দেশনির্বিশেষে সব দেশই এখন 'অর্থনৈতিক-সামাজিক-শিক্ষাগত-স্বাস্থ্যগত-রাজনৈতিক'—এই বহুমুখী মহাবিপর্যয়কর অবস্থায়—"মহামন্দা রোগে" (disease of great depression/horror disease) আক্রান্ত, যা পৃথিবীর ইতিহাসে এই-ই প্রথম। রুগি এখন ICU-তে (যেখানে স্থান সংকুলান হচ্ছে না—কোথাও না, কোনো দেশেই না)। সুতরাং এই রুগিকে বাঁচাতে হলে প্রথমে তাকে সুস্থ করতে হবে। অর্থাৎ দেশের কথা বললে বলতে হয়—দেশের অর্থনীতি-সমাজ-সংস্কৃতি-রাষ্ট্র-সরকার সবকিছুকেই সর্বপ্রথম প্রাক্-অসুস্থ অবস্থায় অর্থাৎ অসুস্থ হবার আগের অবস্থায় নিতে হবে। এক্ষেত্রে বাজেটপ্রণেতাদের প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হবে যে ২০২৪ সালের এই ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা

২০২০ সালের মার্চ মাসের অবস্থায় নেই। যথেষ্ট মাত্রায় পরিবর্তন হয়েছে—অর্থনীতিতে, সমাজে, মানুষের সাহস-হতাশায়, রাষ্ট্রে, সরকারে—সর্বত্র। অবশ্য এ স্বীকৃতিতেও যে খুব বেশি কিছু যায়-আসে, তা নয়। তবে এটা হবে নির্মোহ **সত্য অস্বীকার করা বা তা এড়িয়ে চলা**—'denial syndrome' থেকে মুক্তি। এ স্বীকৃতিতে খুব যায়-আসে না; কারণ, কভিড-১৯ এর পূর্বাবস্থাও সুখকর ছিল না—তা ছিল রেন্টসিকার-দুর্বৃত্ত-লুটেরা-পরজীবীনিয়ন্ত্রিত মুক্তবাজার পুঁজিবাদের অর্থনীতি—যা মুক্তও নয়, দরিদ্রবান্ধবও নয়; যেখানে আয় বৈষম্য-ধনসম্পদ বৈষম্য-শিক্ষা বৈষম্য ও স্বাস্থ্য বৈষম্য ছিল ক্রমবর্ধমান। **সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের ৫২ বছর পরের বাজেট আমরা বৈষম্যহীন আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে করব, নাকি মুক্তবাজার আর কর্পোরেট-স্বার্থীয় সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রকদের বিশ্বায়নের হাতে ছেড়ে দেব—এই সিদ্ধান্তটা নিতে হবে। অন্যথায় আমরা গতানুগতিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যাব—জিডিপি বাড়লেও বাড়তে পারে (টাকার অংকে বাড়তে পারে তবে ডলারের অংকে বাড়বে না); মাথাপিছু আয় বাড়লেও বাড়তে পারে—কিন্তু নিরসন হবে না বৈষম্য-অসমতা এবং বহুমাত্রিক দারিদ্র্য; হবে না মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বা অভীষ্ট বাস্তবায়ন।**

আমাদের দ্বিতীয় কথা/দ্বিতীয় মাত্রা: আমাদের দ্বিতীয় কথা এ দেশে বৈষম্যসহ ধনী-দরিদ্রের প্রবণতা নিয়ে—বিত্তের গতিপ্রকৃতির পরিবর্তন নিয়ে। আর একই সাথে এই প্রবণতায় করোনাকালীন এবং পরবর্তী মন্দাকালীন-যুদ্ধকালীন অভিঘাত এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ নিয়ে। সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এ রকম:

(১) দেশের অধিকাংশ মানুষই বহুমাত্রিক দরিদ্র। আর ধনী (অথবা সুপার ধনী) হলেন জনসংখ্যার সর্বোচ্চ ১ শতাংশ (হতে পারে ১ শতাংশেরও ভগ্নাংশ)। এ কথা অনস্বীকার্য এবং গবেষণায় প্রমাণিত যে, করোনার লকডাউনের প্রভাবে 'নিরঙ্কুশ দরিদ্র' (absolute poor) মানুষ 'হতদরিদ্র-চরম দরিদ্র' (ultra poor) হয়েছেন; আর নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের ব্যাপকাংশ দরিদ্র হয়েছেন এবং মধ্য-মধ্যবিত্তদের একাংশ বিত্তের মানদণ্ডে নিম্নগামী হয়েছেন। ফলে এখন একদিকে দরিদ্র মানুষের মোট সংখ্যা করোনার সময়ের আগের তুলনায় কমপক্ষে দ্বিগুণ বেড়েছে, আর অন্যদিকে সৃষ্টি হয়েছে নতুন এক দরিদ্রগোষ্ঠী, যারা আগে দরিদ্র ছিলেন না—যাদের নাম 'নবদরিদ্র' (New Poor)। ব্যাপক জনগোষ্ঠীর বিত্তের এই অধোগতি—আগে কখনও হয়নি—এ এক নতুন প্রবণতা। দারিদ্র্যের আরো একটা বিষয় এর আগে কখনও ঘটেনি—আর তা হলো দরিদ্র, নিম্নবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের ব্যাপক হারে বাধ্য হয়ে শহর থেকে গ্রামমুখী হওয়া (urban to rural forced migration)। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, এসব মানুষের অনেকে গ্রামেই স্থায়ীভাবে থেকে যেতে বাধ্য হবেন।

(২) আর অন্যদিকে লকডাউনের কারণেই Off-line-এর ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকারখানা ও সেবাখাতে অধোগতি হয়েছে—হয়েছে তা নিম্নগামী। আর ফুলেফেঁপে উঠেছে On-line ব্যবসা-বাণিজ্য (এটা বিশ্বব্যাপী ঘটনা—তা না-হলে আমাজনের বোজোস কী করে মাত্র ১ দিনে তার সম্পদে ১২ বিলিয়ন ডলার নবসংযোজন করতে পারলেন?)। On-line-এর রেন্টসিকার-দুর্বৃত্ত-লুটেরা-পরজীবীরা মুক্তবাজারে মুক্তবিহঙ্গ হয়ে তাদের আয়-সম্পদ-সম্পত্তি বিপুল বাড়িয়েছে। এসবের ফলে সম্পদ বৈষম্য (wealth inequality), আয় বৈষম্য (income inequality), স্বাস্থ্য বৈষম্য (health inequality), শিক্ষা বৈষম্য (education inequality), আবাসন বৈষম্যসহ (housing inequality)—বৈষম্যের সব

ধরনই বেড়েছে। আমাদের হিসাবে আমাদের দেশে আয় বৈষম্যের মাপকাঠি **গিনি সহগ**-এর মান লকডাউনের আগে ছিল ০.৪৮২, যা লকডাউনের পরে মাত্র ৬৬ দিনের মধ্যেই (৩১ মে ২০২০ নাগাদ) বেড়ে দাঁড়িয়েছে ০.৬৩৫-এ; আর **পালমা অনুপাত** (যা দেখায় একটি দেশের সর্বোচ্চ আয়ের মালিক ১০ শতাংশ মানুষের মোট আয় সর্বনিম্ন আয়ের মালিক ৪০ শতাংশ মানুষের মোট আয়ের কতগুণ বেশি)—একই সময়ে ২.৯২ থেকে বেড়ে হয়েছে ৭.৫৩ (যা বিপৎসীমার দ্বিগুণেরও বেশি)। সুতরাং কভিড-১৯ বাংলাদেশকে উচ্চ আয় বৈষম্যের দেশ এবং 'বিপজ্জনক আয় বৈষম্যের' দেশ-এ রূপান্তরিত করে ছেড়েছে। আর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা ও যুদ্ধবিগ্রহ ক্রমবর্ধমান বৈষম্য বৃদ্ধিতে প্রভাবকের কাজ করছে। **এমতাবস্থায় বাজেটপ্রণেতাদের উদ্দেশ্যে সুস্পষ্ট প্রস্তাব হলো—সম্পদ-আয়-স্বাস্থ্য-শিক্ষা-আবাসন বৈষম্য হ্রাসের যত পথ-পদ্ধতি আছে, তার সবই যত দ্রুত সম্ভব প্রয়োগের চেষ্টা করা**। আমরা এসব কথা বলছি এ জন্য যে, আর্থিকীকরণকৃত-রেন্টসিকিং-পরজীবী-লুটেরা পুঁজির নিরঙ্কুশ আধিপত্যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দ্রুততর করলেও করতে পারে, তবে তা কখনো স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৈষম্য কমায় না, আর ক্রমবর্ধমান বৈষম্য সমাজকে করে অস্থির এবং তা টেকসই হয় না। সুতরাং বৈষম্য নিরসনে সম্পদের বণ্টন-পূনর্বণ্টনউদ্দিষ্ট সচেতন হস্তক্ষেপ প্রয়োজন—বাজেট হতে পারে এর অন্যতম মাধ্যম।

আমাদের তৃতীয় কথা/তৃতীয় মাত্রা: মানুষের ক্ষুধার দারিদ্র্যসহ বহুমাত্রিক দারিদ্র্য বেড়েছে। আরো বাড়ছে-বাড়বে। সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা—মানুষের কর্মসংস্থানের। দেশে মোট শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা ৬ কোটি ৮২ লক্ষ ৬ হাজার, যাদের ৮৫ শতাংশ অর্থাৎ ৫ কোটি শ্রমজীবী মানুষ অনানুষ্ঠানিক খাতে (informal sector) কর্মরত—যার মধ্যে আছে বিভিন্ন ধরনের অণু ও ক্ষুদ্র ব্যবসা ও শিল্প-কুটির শিল্প; কৃষি খাত-শস্য ও শাকসবজি-প্রাণিসম্পদ-মৎস্যসম্পদ-জলজসম্পদ। বাস্তবতা হলো, কভিড-১৯ উদ্ভূত লকডাউনে এসব মানুষের অধিকাংশই হয় কর্মহীন অথবা স্বল্প মজুরিতে স্বল্প সময়ের জন্য সাময়িককালীন কর্মজীবী। কারণ, কর্মবাজার সংকুচিত হয়েছে। অনিশ্চয়তাহেতু (uncertainty) সম্ভবত সামনে আরো হবে—যদি সময়মতো সঠিক পদক্ষেপ না নেওয়া হয়। পরিবার-পরিজনসহ এসব মানুষের পক্ষে জীবন পরিচালন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এসব মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য পরিভোগ, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যাবস্থায় অধোগতি হয়েছে। এসব মানুষের হাতে টাকা-পয়সা নেই; অনেকেই যা-কিছু ছিল তাও বেচে দিতে বাধ্য হয়েছেন ("দুর্দশাগ্রস্ততার কারণে বিক্রি"-distress sale)—এরা এখন নিঃস্ব, সর্বস্বহারা, হতাশাগ্রস্ত, ভাগ্যনির্ভর। এসবের সাথে এখন যোগ হয়েছে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি। ফলে সাধারণ মানুষের জীবন এখন অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি অনিশ্চিত। এসব মানুষের জন্য সরকারি উদ্যোগে **ব্যাপক ও শোভন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই। এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে যথেষ্ট ভালো ফল পাওয়া গিয়েছিল ১৯২৯-৩৩ এর মহামন্দার সময়ে নিউ ডিল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এসবের একটা অর্থ হলো, বাজেট হতে হবে সম্প্রসারণশীল—সংকোচনমূলক নয়**।

আমাদের চতুর্থ কথা/চতুর্থ মাত্রা: অর্থনীতিবিদদের প্রায় সবাই বলে থাকেন, জিনিসপত্তরের দাম বাড়া বা **মূল্যস্ফীতি** (inflation) হলো গরিবের শত্রু। এ কথা মিথ্যা নয়। কারণ উচ্চ মূল্যস্ফীতি গরিব মানুষকে গরিবতর করছে; আর মধ্যবিত্ত মানুষের অধোগতি দৃশ্যমান বাস্তবতা—এসব নিয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। এসবই মানুষের জীবন-জীবিকায় অনিশ্চয়তা বাড়াচ্ছে।

মূল্যস্ফীতি নিয়ে অনেক কথা হলেও যে কথা তেমন বলা হয় না, তা হলো—**মূল্যহ্রাস বা মূল্যসংকোচন** (deflation) হলো গরিবের মহাশত্রু। উল্লেখ্য, ১৯২৯-৩৩-এর মহামন্দাকালে মূল্যস্ফীতি ঘটেনি, ঘটেছিল মূল্যহ্রাস/মূল্যসংকোচন; আর ওই মহামন্দার পরপরই 'মূল্যহ্রাস/মূল্যসংকোচনের' সুযোগে নির্বাচনের মাধ্যমেই ফ্যাসিস্ট হিটলার জার্মানিতে ক্ষমতায় বসে পড়েন। এসব গূঢ় বিষয় নিয়ে দূরদর্শী বাজেটপ্রণেতারা ভাববেন—এ প্রত্যাশা অমূলক হবে না।

আসন্ন বাজেটের ভিত্তি-নীতির ভিত্তিকথা নিয়ে যে চারটি বাস্তব বিষয়-প্রবণতা উল্লেখ করলাম, তা থেকে আমরা বিশ্বাস করতে চাই যে—মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আলোকিত মানুষের বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে এবং দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে বাঁচাবার লক্ষ্যে **বাজেটপ্রণেতারা এবারের বাজেটে নিদেনপক্ষে দু'টো বড় মাপের বিষয় নিয়ে ভাববেন:**

<u>প্রথম যা ভাবা প্রয়োজন</u>: আয়-ধন-সম্পদের বণ্টন হতে হবে ন্যায্য—তা ধনীদের কাছ থেকে প্রবাহিত হতে হবে দরিদ্র, বিত্তহীন, নিম্নবিত্ত মানুষের হাতে। এ লক্ষ্যে বাজেট যা পারে, তা হলো:

(১) ধনী-বিত্তশালীদের ওপর সম্পদ কর (wealth tax) আরোপ করা,

(২) সুপার-ডুপার ধনীদের ওপর কর হার বাড়ানো,

(৩) শেয়ারবাজার ও বন্ডবাজারে বড় বিনিয়োগের ওপর সম্পদ কর আরোপ করা (আসলে গুটিকয়েক ব্যক্তিই ৮০ শতাংশ শেয়ার-বন্ডের মালিক),

(৪) অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর আরোপ করা (tax on excess profit),

(৫) কালোটাকা উদ্ধার করা, এবং

(৬) পাচারকৃত অর্থ (money laundering) উদ্ধার করা।

এসবই আজকের আলোচ্য বিষয়—রাজস্ব বাজেটের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

কর-জিডিপি (tax-GDP) অনুপাত বাড়াতে হবে—এ কথা সবাই বলেন। যৌক্তিক বিধায় আমরাও তা মানি। তবে এক্ষেত্রে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো—কর-জিডিপি অনুপাতের বৃদ্ধিটা হতে হবে বৈষম্য হ্রাস-উদ্দিষ্ট, আর সে লক্ষ্যেই আমাদের উল্লিখিত ৬ সুস্পষ্ট নির্দেশনা।

এখানে বৈষম্য হ্রাসে কর-এর ভূমিকা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চারটি প্রমাণিত-পরীক্ষিত সত্য উল্লেখ জরুরি:

(১) সম্পদ কর বৈষম্য কমায়,

(২) কালোটাকা ও অর্থ পাচার বৈষম্য বাড়ায়,

(৩) সম্পদশালীদের ওপর ট্যাক্স কমালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ে না, এবং

(৪) সমাজের নিচতলার ৯০ শতাংশ মানুষের ওপর ট্যাক্স কমালে কর্মসংস্থান ও আয় বাড়ে।

আমাদের প্রায়ই শোনানো হয় যে বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন উত্তরণ-রূপান্তরকালীন অর্থনীতি (Economy in transition and transformation) এবং এ সময়ে বৈষম্য বাড়াটা স্বাভাবিক, তবে

তা সাময়িক, কারণ "চুইয়ে পড়া প্রভাবের" (trickle down effect) ফলে দীর্ঘ মেয়াদে বৈষম্য কমে যাবে। যেহেতু এসব তত্ত্বকথা ভ্রান্ত এবং বাস্তবে কখনও প্রমাণ হয়নি, সেহেতু আমরা মনে করি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সব কর্মকাণ্ড হতে হবে বৈষম্য-অসমতা-দারিদ্র্য হ্রাস-উদ্দিষ্ট। রাজস্ব বাজেট ভাবনায় এসব অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন।

দ্বিতীয় যা ভাবা প্রয়োজন: সরকারিভাবেই শোভন মজুরির ব্যাপক কর্মসংস্থান-সুযোগ সৃষ্টি করা। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে অতিরিক্ত টাকা ছাপালেও কোনো অসুবিধা হবে না (তবে 'ভারসাম্য' বিষয়টি নজরে রাখতে হবে, যেন অপ্রয়োজনে টাকা ছাপানো না-হয়)। অবশ্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আর বিশ্বব্যাংকের নব্য-উদারবাদী অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতি-মতাদর্শে বিশ্বাস করলে এসব করা সম্ভব হবে না। কিন্তু ১৯২৯-৩৩ এর মহামন্দা থেকে উত্তরণে সরকারি উদ্যোগে 'New Deal' নীতির আওতায় ব্যাপক কর্মসংস্থান-এর যেমন কোনো বিকল্প ছিল না—এখনও তেমনি দ্বিতীয় কোনো বিকল্প নেই (এখনকারটা হতে পারে 'Green New Deal'; প্রকৃতির প্রতি সম্মান ও আনুগত্যভিত্তিক 'নিউ ডিল')।

কভিড-১৯-এর মহামারি, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, যুদ্ধবিগ্রহ—এসবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র বিশ্ব মহাবিপর্যস্ত। মানব ইতিহাসে এর আগে কখনও একই সাথে অর্থনৈতিক মহামন্দা, যুদ্ধ ও মহামারি ঘটেনি। বাংলাদেশে আমরাও এসব মহাবিপর্যয়ের নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্ত নই।

আমরা ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ, ২০২১ সালে '১৯৭১'-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণজয়ন্তী এবং ২০২৩ সালে মহান ভাষা আন্দোলনের ৭১ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করলাম। সমসাময়িক সময়েই কভিড-১৯ মহামারির লকডাউন, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দা, যুদ্ধবিগ্রহ—এসব কারণে আমাদের সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র—সবকিছুই বিপর্যস্ত। এহেন দুঃসময়-মহাবিপর্যয়ে নির্মোহ বিশ্লেষণভিত্তিক জন-আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি বাজেট দেশের আপামর মানুষ গ্রহণ করবেন—এ আশা অমূলক হবে না। বহুমাত্রিক বিপর্যয়ের সামগ্রিক ও গভীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণভিত্তিক বাজেটের প্রধান লক্ষ্য হতে হবে—আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ বৈষম্যহীন 'শোভন বাংলাদেশ' বিনির্মাণ—যা ছিল '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা। এ বিশ্বাসও অমূলক হবে না যে, করোনা-বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা-যুদ্ধ—বহুমাত্রিক এসব বিপর্যয় মানুষের (আমাদের) অন্তর্নিহিত শক্তিকে দুর্বল করবে না, উল্টো এ বিপর্যয় কাঙ্ক্ষিত মানবিক উন্নয়ন-প্রগতির গতি বাড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি করবে। আমাদের লক্ষ্য হতে হবে—সেই সুযোগ উদ্‌ঘাটন-অনুসন্ধান করা এবং তা দেশের মানুষের জন্য কাজে লাগানো। আমরা জানি, এসব এক বাজেটের কাজ নয়।

বাজেটসহ আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে ধার করা নয়; অথবা (আমাদের ওপর) বহিঃশক্তির চাপিয়ে দেয়া নয়—"প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ সম্মান ও আস্থাভিত্তিক বৈষম্য হ্রাস-উদ্দিষ্ট উন্নয়নদর্শন"ই সঠিক পথ বলে আমরা বিবেচনা করি। কারণ, তাই-ই ছিল ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-ভিত্তি। আমরা বিশ্বাস করি—মুক্তিযুদ্ধের শুভ চেতনায় সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব—যৌক্তিক, নৈতিক, মানবিক—সব বিচারেই তা সম্ভব। সম্ভব এ দেশের দ্রুত কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন; সম্ভব উন্নত বাংলাদেশ গড়া; সম্ভব বৈষম্যহীন সমাজ গড়া; সম্ভব অসাম্প্রদায়িক মানবসমাজ সৃষ্টি। আমরা এটিও বিশ্বাস করি—করোনা-১৯ এর মহামারি, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, যুদ্ধবিগ্রহ—এসব বহুমাত্রিক বিপর্যয় সেই সুযোগ সৃষ্টি করেছে, যা 'শোভন সমাজব্যবস্থা' বিনির্মাণের শ্রেষ্ঠ সময়। এই সুযোগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সমগ্র দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার শ্রেষ্ঠ সুযোগ।

এতক্ষণ নীতি-দর্শনগত যে মৌলকথন হলো, সেসবের ভিত্তিতে আসন্ন বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগতভাবে যেসব বিষয় বা 'অনুসিদ্ধান্তের' ওপর জোর দেয়ার এবং অগ্রাধিকার প্রদানের কথা ভাবা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি, তা হলো নিম্নরূপ:

(১) ***সাংবিধানিক ভিত্তি:*** বাজেট প্রণয়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন—সংবিধানের বিধানসমূহকে ভিত্তি হিসেবে ধরে নিতে হবে। সংবিধানের সাথে সাযুজ্যহীন অথবা অসঙ্গতিপূর্ণ অথবা বিরোধাত্মক—এ ধরনের সবকিছু বাজেট প্রণয়নে বর্জন করতেই হবে। 'সচেতনবর্জিত' বিষয়াদি হতে হবে সংবিধানের ৭ (১) ও ৭ (২) অনুচ্ছেদে "সংবিধানের প্রাধান্য"র সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ, যা নিম্নরূপ:

"৭। (১) *প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীনে ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।*

(২)*জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।*" [গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭ (১), (২)]

(২) ***রাষ্ট্রের অধিকতর সক্রিয় ও ফলপ্রদ ভূমিকা:*** অর্থনৈতিক উন্নয়নে নয়া-উদারবাদী দর্শনের বিপরীতে রাষ্ট্রের অধিকতর সক্রিয় ও ফলপ্রদ ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ স্বীকার করে (যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ) রাষ্ট্রের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে ব্যয় বরাদ্দ নির্ণয় করা প্রয়োজন। আমরা মনে করি যে কভিড-১৯, বৈশ্বিক মন্দা ও যুদ্ধবিগ্রহের মহাবিপর্যয়কর আঘাতসহ অর্থনৈতিক-সামাজিক সংকট মোকাবিলা এবং একই সাথে প্রাকৃতিক যুক্তির বৈষম্যহীন সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র বিনির্মাণে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে বাজেট হতে হবে সম্প্রসারণমূলক।

আমরা সম্পূর্ণ অবগত যে নব্য-উদারবাদীরা মানুষের জীবন ও জীবিকার মৌল ক্ষেত্রসমূহে সরকারের নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে নেবার কথা এখন আরো জোর দিয়ে বলবেন। তাদের অনেকেই এখন বলছেন, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বেশি হওয়ার ফলেই বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ মহামন্দামুখী; বলছেন, বাজারকে তার কাজ করতে বাধা দেয়া হয়েছে বলেই মহাবিপর্যয় হচ্ছে এবং হবে; বলছেন, পুঁজিবাদ যথেষ্ট মাত্রায় নেই দেখেই যত সমস্যা; বলছেন, "সরকারই হলো সমস্যার মূলে"; বলছেন, সমাজ (society) বলে কিছু নেই; বলছেন, সরকারের এখন উচিত হবে যেখানে যত অর্থকড়ি আছে, তার সবই ব্যক্তিমালিকদের দিয়ে দেয়া—তাহলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ধনী দেশের যারা এসব প্রেসক্রিপশন দিচ্ছেন, তারা কিন্তু সম্ভাব্য সবধরনের সংরক্ষণবাদ নীতি (protectionist policy) অবলম্বন করেই ধনী হয়েছেন; তবে ধনী হওয়ার পরে "উপরে ওঠার মইটি লাথি মেরে সরিয়ে" (kicked away the ladder) মুক্তবাজারে আমাদের খেলতে বলছেন। এসবই হলো দ্বিচারিতা (hypocrisy)।

(৩) ***দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা দূরীকরণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন-সক্ষম খাত:*** বাজেট বরাদ্দে সেসব খাত-ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দেয়া জরুরি—যেসব খাত দ্রুতগতিতে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা দূরীকরণে

প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে; যেসব খাতের বরাদ্দে দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক অভিঘাত হয় ধনাত্মক (long term social positive impact); যেসব খাতের বরাদ্দ কৃষির বিকাশ, দেশজ শিল্পায়ন, অভ্যন্তরীণ বাজার, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ মানবসম্পদের বিকাশকে ত্বরান্বিত করে; যেসব খাতের বরাদ্দ প্রকৃতি-পরিবেশ-প্রতিবেশের প্রতি সম্মানসহায়ক; যেসব খাতের বরাদ্দ মানবসত্তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠাসহায়ক।

(৪) ***কভিড-১৯, বৈশ্বিক মন্দা ও যুদ্ধবিগ্রহের অভিঘাত মোকাবিলায় উন্নয়ন-ভবিষ্যৎ নিয়ে সুনির্দিষ্ট ভাবনা:*** কভিড-১৯, বৈশ্বিক মন্দা ও যুদ্ধের সম্ভাব্য অভিঘাত নিয়ে গবেষণা-উদ্ভূত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব বাজেটে থাকতে হবে।

(৫) ***আয় ও ব্যয়ের কাঠামোগত রূপান্তর:*** সঙ্গত কারণেই বাজেটের আয় ও ব্যয় খাতে কাঠামোগত রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা জরুরি। এ বিবেচনার ভিত্তি হবে সংবিধানের ভিত্তিতে 'শোভন সমাজ-শোভন অর্থনীতি বিনির্মাণ'।

(৬) ***বৈদেশিক ঋণ নির্ভরতাবিহীন:*** কোনো ধরনের বৈদেশিক ঋণের প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই বাজেট প্রণয়ন সম্ভব। এ অনুসিদ্ধান্তের মূল কারণ দ্বিবিধ—আমরা অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক সার্বভৌমত্ব গুরুত্বপূর্ণ মনে করি এবং বৈদেশিক ঋণ নব্য-উদারবাদী মুক্তবাজার মতবাদতাড়িত, যা স্বাধীন বিকাশের প্রতিবন্ধক। তবে বিদ্যমান রেন্টসিকার-লুটেরা-দুর্বৃত্ত ডাকিনীবিদ্যক পুঁজি ও কর্পোরেশনবেষ্টিত (যাকে বলে Zombie corporation) রাজনীতি-অর্থনীতি ব্যবস্থায় রাষ্ট্র-সরকার তুলনামূলক কম বিষাক্ত (less toxic) বৈদেশিক ঋণ নিলেও নিতে পারেন (বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এটা হতে পারে প্রয়োজনীয় আপোসমূলক অবস্থান)।

(৭) ***রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে বিত্তবান-ধনীদের ওপর যুক্তিসঙ্গত চাপ প্রয়োগ:*** করোনা-উদ্ভূত বিপর্যয়কর পরিস্থিতিসহ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দা এবং যুদ্ধবিগ্রহের নেতিবাচক অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে বাজেটের জন্য সম্পদ আহরণ ও বৈষম্য হ্রাসের অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে সরকারের রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক জনগোষ্ঠী, যেমন দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত-মধ্যমধ্যবিত্তদের ওপর কোনো ধরনের চাপ প্রয়োগ আমরা সমীচীন মনে করি না। আমরা মনে করি, চাপ প্রয়োগ দরকার ধনিক শ্রেণি-সম্পদশালীদের ওপর। ধনী ও বিত্ত-সম্পদশালী ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান—যারা সম্পদ, আয় এবং মুনাফার অর্থমূল্য কম প্রদর্শনের মাধ্যমে সঠিক কর প্রদান করেন না—তারা যেন সঠিক পরিমাণ কর প্রদান করেন, তা নিশ্চিত করা জরুরি। একই সাথে প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর হার নির্ধারণ জরুরি।

(৮) ***পরোক্ষ করের তুলনায় প্রত্যক্ষ করের অনুপাত:*** পরোক্ষ করের বোঝা মূলত দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যমধ্যবিত্তদের ওপর তাদের আয়ের তুলনায় অধিক হারে চাপ প্রয়োগ করে; ফলে তা দারিদ্র্য-বৈষম্য হ্রাস করে না—উল্টো তা বৈষম্য বাড়ায়। সে কারণে আমরা মনে করি, পরোক্ষ করের তুলনায় প্রত্যক্ষ করের অনুপাত বেশি নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

(৯) ***কোনো আয়ই আসে না, অথচ সম্ভাবনা অনেক:*** কর-রাজস্ব ও করবহির্ভূত রাজস্ব আয়ের সেসব খাত অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, যেসব খাত থেকে আয়করের কথা কখনও ভাবা হয় না (যেমন সম্পদ কর, অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর, কালোটাকা উদ্ধার, পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার ইত্যাদি) এবং যেসব খাত থেকে কোনো আয়ই আসে না অথচ সম্ভাবনা অনেক। একই সাথে সেসব খাত

চিহ্নিত করা প্রয়োজন, যেসব খাত থেকে স্বল্প আয় আসে—অথচ প্রাপ্তির সম্ভাবনা অনেক, যদি একটু সাহসী ও উদ্যমী হওয়া যায় এবং কর-রাজস্ব ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা যায়।

(১০) ***উন্নয়নদর্শন ও কভিড-১৯-বৈশ্বিক মন্দা—যুদ্ধবিগ্রহের অভিঘাত মোকাবিলার কারণে বাজেট বরাদ্দে অগ্রাধিকার:*** 'শোভন জীবনব্যবস্থা' নিশ্চিতকরণে যে উন্নয়নদর্শন সঠিক বলে আমরা মনে করি, সে কারণেই বাজেট বরাদ্দে আমাদের অগ্রাধিকারক্রম হওয়া উচিত হবে নিম্নরূপ: শিক্ষা ও প্রযুক্তি (সর্বোচ্চ বরাদ্দ), সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ, পরিবহন ও যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, জনপ্রশাসন, কৃষি, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা, গৃহায়ণ (জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার সমান গুরুত্ব), সুদ, প্রতিরক্ষা, বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম (সংস্কৃতি ও ধর্মকে আমরা একবন্ধনী খাত থেকে দুটি ভিন্ন খাত হিসেবে প্রস্তাব করছি), শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস, বিবিধ ব্যয় (খাদ্য হিসাবসহ)।

(১১) ***দুটি নতুন মন্ত্রণালয় ও ১৬টি নতুন বিভাগ সংযোজন:*** জাতীয় স্বার্থে বাজেটের সম্পদ ব্যবহারে গত বছরের বিকল্প বাজেটে আমরা দুটি নতুন মন্ত্রণালয় ও ১৬টি নতুন বিভাগ প্রস্তাব করেছিলাম। আমাদের প্রস্তাবিত নতুন মন্ত্রণালয়দ্বয় হলো: (১) গণপরিবহন মন্ত্রণালয় (Ministry of Public Transport) এবং (২) গবেষণা, উদ্ভাবন, বিচ্ছুরণ, ও উন্নয়ন মন্ত্রণালয় (Research, Innovation, Diffusion, and Development Ministry)। আর বিদ্যমান বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রস্তাবিত ১৬টি নতুন বিভাগ (New Division/Directorate) হলো নিম্নরূপ: **সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন** (১) প্রবীণ হিতৈষী বিভাগ, (২) দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়ন বিভাগ, (৩) নারীর ক্ষমতায়ন বিভাগ (গ্রাম ও শহরের দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত ও নারীপ্রধান খানা), (৪) আদিবাসী মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়ন বিভাগ, (৫) শিশুবিকাশ বিভাগ, (৬) বিধিবদ্ধ রেশনিং বিভাগ (দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জন্য), (৭) সার্বজনীন পেনশন বিভাগ, (৮) দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের আবাসন বিভাগ; **স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন** (৯) জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা বিভাগ; **শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন** (১০) নারীর বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগ, (১১) কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, (১২) মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ; **কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন** (১৩) কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার বিভাগ, (১৪) হাওর-বাঁওর-বিল-চর উন্নয়ন বিভাগ; **পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন** (১৫) অর্থনৈতিক কূটনীতি বিভাগ; **বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন** (১৬) অণু ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিভাগ।

এ ছাড়া যদিও আমরা গত বছরের বিকল্প বাজেটে প্রস্তাব করিনি, তথাপি মনে করি দেশে অনানুষ্ঠানিক খাত মন্ত্রণালয় (Ministry of Informamal Sector) গঠন করা উচিত। কারণ, দেশের মোট শ্রমশক্তির ৮০-৮৫ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। একইসাথে শক্তিশালী **কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার বিভাগ** গঠনের পাশাপাশি গত বছরের বিকল্প বাজেটে আমরা প্রস্তাব করেছি যে বর্তমান **ভূমি মন্ত্রণালয়ের** নাম বঙ্গবন্ধু প্রদেয় **ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়**-এ পরিবর্তন করা; পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয় বিলুপ্ত করে **আদিবাসী উন্নয়নবিষয়ক মন্ত্রণালয়** গঠন করা, যার দু'টো বিভাগ হবে পার্বত্য আদিবাসী বিভাগ এবং সমতলের আদিবাসী বিভাগ; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে কার্যকর পল্লী উন্নয়ন এবং গণমুখী-বহুমুখী সমবায় বিভাগ গড়ে তোলা (যার প্রতিটিতেই একজন করে ভিন্ন মন্ত্রী নিযুক্ত হবেন); শিল্প

মন্ত্রণালয়ের অধীন **শিল্প সুরক্ষা/সংরক্ষণ বিভাগ** (Industry Protection Division) গড়ে তোলা; বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে **বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগ** গঠন করা; পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে শক্তিশালী কার্যকর **নদী খনন বিভাগ** প্রতিষ্ঠা করা।

(১২) ***মানব উন্নয়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন:*** মানব উন্নয়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়নসহ উৎপাদনশীল বিনিয়োগে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা দূরসহ সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী (কৃষকের শস্যবীমা ও ভূমি সংস্কারসংশ্লিষ্ট কার্যক্রম), কৃষি, স্বাস্থ্য, খাদ্য মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগ, গৃহায়ণ, সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ-এর বরাদ্দে আমরা যুক্তিসঙ্গত অগ্রাধিকার দেবার প্রস্তাব করছি।

(১৩) ***আমদানি শুল্ক হার নির্ধারণে দেশজ শিল্পায়ন ও দেশজ কৃষি:*** আমদানি শুল্ক হার নির্ধারণে দেশজ শিল্পায়ন ও দেশজ কৃষির স্বার্থ বিবেচনায় কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ খাত-উপখাতসমূহের ক্ষেত্রে আমরা মুক্তবাজার দর্শনের বিপরীতে সংরক্ষণবাদ নীতি-দর্শন প্রয়োগের সুপারিশ করছি।

(১৪) ***প্রকৃত মানবিক উন্নয়নের অন্যতম পথনির্দেশক দলিল:*** আসন্ন বাজেটে আয়-ব্যয় বিন্যাসসহ বিভিন্ন নীতি-কৌশলসংশ্লিষ্ট নিদের্শনা মেনে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির সম্ভাব্য অর্জনমাত্রা নিরূপণ করা প্রয়োজন: (ক) প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ আস্থা ও সম্মান বজায় রেখে প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয় যেন বৈষম্য হ্রাসকারী মানবিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে, (খ) সমাজের সকল দরিদ্র-প্রান্তিক পিছিয়ে পড়া মানুষের সম্ভাব্য দ্রুতগতিতে জীবনমান বৃদ্ধির নিশ্চয়তা, (গ) বণ্টন ন্যায্যতা নিশ্চিতসহ উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, (ঘ) অধিকতর কার্যকরী, বৈচিত্র্যপূর্ণ উৎপাদনশীল কৃষি, (ঙ) অধিক হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ ন্যায্য মজুরির নিশ্চয়তা, (চ) শিল্পায়ন: অণু, ক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ (আত্মকর্মসংস্থানসহ) এবং শিল্পে শ্রমিকের মালিকানাভিত্তিক অংশীদারিত্ব, (ছ) অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে শ্রমজীবী মানুষের উন্নত জীবনমান এবং শোভন কাজ, (জ) কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার, (ঝ) নারীর অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়ন, (ঞ) বাণিজ্য ও পণ্য বাজারজাতকরণে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস এবং কৃষকের পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, (ট) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বোত্তম জনকল্যাণকর ব্যবহার, (ঠ) সরকারি খাতে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদির মাধ্যমে জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর, (ড) প্রাথমিক ও উচ্চতর স্বাস্থ্যসেবা (জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা সেবাসহ) নিশ্চিতকরণে শক্তিশালী সরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাত, এবং (ঢ) সবধরনের সামাজিক সুরক্ষার বিস্তৃতিসহ সুসংগঠিত সামাজিক বীমা পদ্ধতি। উল্লেখ্য, সামাজিক সুরক্ষার ভিত সুপ্রশস্ত ও যুক্তিসঙ্গত করার লক্ষ্যে আমরা অর্থনীতি সমিতির গত বিকল্প বাজেটে **"সার্বজনীন পেনশন"** ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। সরকার ইতিমধ্যে "সার্বজনীন পেনশন" চালু করেছেন—এ জন্য সরকারকে ধন্যবাদ।

কভিড-১৯-এর মহামারি, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দা এবং যুদ্ধবিগ্রহ—বহুমাত্রিক এসব মহাবিপর্যয় থেকে মুক্তি এবং একই সাথে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে উল্লিখিত পদ্ধতিগত ভিত্তি-ভাবনা প্রয়োগে আমরা মনে করি—আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট হওয়া উচিত সম্প্রসারণশীল, কোনোভাবেই সংকোচনমূলক নয়। আমাদের প্রস্তাব বৈষম্য হ্রাসকারী বৃহদাকার-সম্প্রসারণশীল বাজেট। আমরা মনে করি, বৈষম্য হ্রাস-উদ্দিষ্ট সম্প্রসারণশীল বাজেটই হতে পারে সুসংহত মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ বিনির্মাণের যুক্তিসিদ্ধ পথ। আমরা আশা করি, যুক্তি থাকলে সরকার

আমাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন। কারণ, অর্থনৈতিক মহামন্দা, কভিড-১৯ মহামারি এবং যুদ্ধবিগ্রহের মিথস্ক্রিয়ায় সৃষ্ট বিপর্যয়কর অভিঘাত মোকাবিলা করে আমরা আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ বৈষম্যহীন 'শোভন সমাজব্যবস্থা' বিনির্মাণের পক্ষে।

আমাদের শেষ কথা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্য গত বছর আমরা যে বিকল্প বাজেট প্রস্তাব করেছিলাম, তার শিরোনাম ছিল **"বৈষম্য নিরসনে জনগণতান্ত্রিক বাজেট"**।[২] কারণ মর্মগতভাবে তা ছিল ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংবিধানের মৌল বিধানের ভিত্তিতে প্রণীত মৌলিক রূপান্তরমুখী অর্থনৈতিক দলিল। আমরা মনে করি, আমাদের প্রস্তাবিত বৈষম্য নিরসনে জনগণতান্ত্রিক বাজেট এ জন্য প্রয়োজন যে কাঠামোগত বিচারে একমাত্র এ প্রকৃতির বাজেটই পারে বিপজ্জনক ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতা-বহুমুখী দারিদ্র্য থেকে জনগণের উত্তরণ ঘটাতে। অন্য কোনো ধরনের বাজেট দিয়ে এই কাঙ্ক্ষিত উত্তরণ-রূপান্তর (transition and transformation) সম্ভব নয়। আমরা এও মনে করি যে— আমাদের প্রস্তাবিত বৈষম্য নিরসনে জনগণতান্ত্রিক বাজেট ধারণা বাস্তবায়ন করলে আগামী ১০ বছরের মধ্যেই একদিকে একইসাথে অতিবিপজ্জনক বৈষম্যপূর্ণ অবস্থা থেকে স্বল্প-বৈষম্যপূর্ণ অবস্থায় পৌঁছানো সম্ভব, অন্যদিকে একইসাথে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি অবস্থান থেকে মধ্যমধ্যবিত্ত শ্রেণি অবস্থানে উত্তরণ-রূপান্তর সম্ভব। এটাই হতে পারে ২০৩১ সাল নাগাদ স্বল্প বৈষম্যপূর্ণ মধ্য আয়ের বাংলাদেশে উত্তরণ-রূপান্তরের কাঙ্ক্ষিত বাজেটীয় পথ। আর এটাই বৈষম্য নিরসন-উদ্দিষ্ট জনগণতান্ত্রিক বাজেটের মূল অভীষ্ট ও অন্তর্নিহিত শক্তি।

---

* *বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক প্রস্তাবিত এই দলিল প্রণয়নে যেসব সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম: বিভিন্ন সময়ের সংশ্লিষ্ট সরকারি পরিসংখ্যান; বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট (২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত); বারকাত, আবুল (২০২০), "বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে" (ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা)।*

---

২ দেখুন, আবুল বারকাত (১০ মে ২০২৩), বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা ২০২৩-২৪: বৈষম্য নিরসনে জনগণতান্ত্রিক বাজেট। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

কার্যনির্বাহক কমিটি ২০২৪-২০২৬

সভাপতি	:	ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
সহ-সভাপতি	:	ড. জামালউদ্দিন আহমেদ এফসিএ এ জেড এম সালেহ্ ড. মোঃ লিয়াকত হোসেন মোড়ল সৈয়দা নাজমা পারভীন পাপড়ি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সরদার
সাধারণ সম্পাদক	:	অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম
কোষাধ্যক্ষ	:	বদরুল মুনির
যুগ্ম-সম্পাদক	:	শেখ আলী আহমেদ টুটুল মোহাম্মদ আকবর কবীর
সহ-সম্পাদক	:	নেছার আহমেদ মনছুর এম. ওয়াই. চৌধুরী মোঃ জাহাঙ্গীর আলম পার্থ সারথী ঘোষ সৈয়দ এসরারুল হক সোপেন
সদস্য	:	অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত অধ্যাপক হান্নানা বেগম অধ্যাপক ড. মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান অধ্যাপক ড. মোঃ জহিরুল ইসলাম সিকদার অধ্যাপক শাহানারা বেগম ড. নাজমুল ইসলাম ড. শাহেদ আহমেদ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাদিকুন্নবী চৌধুরী অধ্যাপক ড. মোঃ আলমগীর হোসেন ভূঁইয়া মেহেরুননেছা মোঃ মোজাম্মেল হক অধ্যাপক ড. মোঃ মোরশেদ হোসেন অধ্যাপক মোঃ আখতারুজ্জামান খান খোরশেদুল আলম কাদেরী

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪/সি ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা
ফোন: ৮৮০-০২-২২২২২৫৯৯৬, ০১৭১৬৪১৮৫০০
E-mail: bea.dhaka@gmail.com, Web: www.bea-bd.org

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

৪/সি ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।

ফোন : ৮৮০-০২-২২২২২৫৯৯৬

ই-মেইল : bea.dhaka@gmail.com

Website: www.bea-bd.org

ISBN 978-984-97735-1-1